কথামৃত - দশম পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ও বলরাম-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে মধ্যাহ্ন সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ** (পৃঃ ১৪০)। সেখানে রাখাল, হরিশ, লাটু, হাজরা অনেকেই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তগণের প্রতি) –রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্য সিদ্ধ –জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীরধারণ।

বেদান্তে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটে অবস্থার কথা বলা হয়। বাস্তবেও তাই, শুদ্ধ আত্মার উপর একটা অবিদ্যার আবরণ, যেখানে আমিত্ব এসে যায় –এখান থেকে কারণ শরীর হয়। কারণ থেকে শুদ্ধ আত্মার উপর মনের আবরণ এসে যায়, যেটাকে সূক্ষ্ম বলছি; এই সূক্ষ্ম থেকে পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত দেহের আবরণ আসে, সেটাকে আমরা বলছি স্থূল। যেমন আমাদের কর্ম, যেমন আমাদের জ্ঞান, মৃত্যুর পর সেই অনুসারে আমরা স্থূলের পর সূক্ষ্মে যাব, কিন্তু সেখান থেকে আবার দেহ ধারণ করতে হবে।

বেশিক্ষণ সূক্ষ্মে থাকা যায় না, মানুষ যেমন বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। যাঁরা অনেক দিন ধ্যান-ধারণাদি করে ধ্যানের গভীরে যেতে সক্ষম, তাঁরা ধ্যানের অবস্থাতে সূক্ষ্ম শরীরে আনন্দ যে কি রকম, কিংবা বিভিন্ন অনুভূতি, সেটা তাঁরা নিতে পারেন। মৃত্যু যা, ওনাদের জন্য ধ্যানের অবস্থাটাও তাই, আর তার সাথে সূক্ষ্ম জগতের শক্তিগুলো ওনারা পেয়ে যান। এই শক্তি দিয়ে বোঝা যায় তিনি ধ্যানের কত গভীরে বিচরণ করেন। ধ্যান করার সময় আপনার হয়ত মনে হতে পারে যে, আপনি সূক্ষ্ম জগতে বাস করছেন; কিন্তু না, মনে করলেই হবে না, তার সঙ্গে দেখতে হবে আপনার সূক্ষ্ম জগতের সেই শক্তিগুলো এসেছে কিনা। যাঁদের ঠাকুরের দর্শন হয়, এনাদের এই সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন হয়। মৃত্যুর পর এনারা সবাই সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা হবেন।

যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক, এনারা সাধনা করে করে সূক্ষ্ম শরীরকে ভেদ করে ওই যে কারণ জগতের কথা বলা হল, সেখানে পৌঁছে যান। এই ধরণের উচ্চমানের সাধক খুব কম হন। তার মানে, উনি যখন ধ্যান করবেন, তখন ওনার মন স্থূলে থাকবে না, সূক্ষ্মেও থাকবে না, কারণে চলে যাবে। সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ এদের বিশাল ব্যপ্তি। যাঁর মন যত হাল্কা, যাঁর মন যত পবিত্র, তিনি তত উঁচুতে থাকেন। এই দেহে থাকতেই ওনাদের এই শক্তি এসে যায়, আর মৃত্যুর পর তাঁরা সেখানে চলে যান।

কারণ জগতের যে উচ্চতম অবস্থা, ওই উচ্চ অবস্থা শুধু যাঁরা নিত্য সিদ্ধ, যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গী, তাঁদের জন্য। ঈশ্বরের রূপ তিন ভাবে পাওয়া যায় –কারণ শরীরে এক রকম রূপে থাকেন, সূক্ষ্ম শরীরে আর-এক রূপে থাকেন আর স্থূল শরীরে অন্য রূপে থাকেন। যখন তিনি অবতার হয়ে আসেন, তখন তিনি স্থূল রূপে থাকেন। তিনি যখন অবতার রূপে থাকেন না, তখন তিনি সূক্ষ্ম শরীরে থাকেন, কারণ শরীরে থাকেন। বৈকুণ্ঠধাম, বিষ্ণুলোক, এগুলো ঈশ্বরের কারণ শরীর। সূক্ষ্ম শরীর হল দেবতাদের। ইন্দ্রাদি দেবতারা হলেন সূক্ষ্ম জগতের লোক। কিন্তু যাঁরা সপ্তর্ষিমণ্ডলাদিতে থাকেন, এনারা কারণ জগতের লোক।

কারণ জগতের পর আসে মহাকারণ। মহাকারণে আর কিছু নেই, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সেখানে সব মিলে গেল। নরেন, রাখাল এনারা সবাই কারণ জগতের লোক। ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, এইসব ছোকড়ারা সব নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্ম থেকেই চৈতন্য, লোকশিক্ষার জন্য শরীরধারণ। গানে খুব সুন্দর বলছেন, বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মী এলেন এই পৃথিবীর মাটিতে, জয়রামবাটিতে। শ্রীশ্রীমা সেই বৈকুণ্ঠধামের। তফাৎ হল মা ঈশ্বরী, নরেন রাখাল এনার হলেন লীলাসহচর। কিন্তু দুজনেরই বাস কারণ জগতে। যাঁরা সাধন-ভজন করেছেন, শুভকর্ম করেছেন, যজ্ঞাদি কর্ম করেছেন, মৃত্যুর পর এনারা সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা হবেন। যারা এমনি সাধারণ মানুষ, মৃত্যুর পর এরা সবাই প্রেতলোকের বাসিন্দা হবে। প্রেতলোকটাও সূক্ষ্ম জগতের। কলকাতায় যেমন বড়লোক আছে আবার সাধারণ লোকও আছে, দরিদ্র লোকও আছে। তেমন সূক্ষ্ম জগতে দেবতারাও আছেন আবার প্রেতরাও আছে। কারণ জগতে এ-জিনিস হবে না, কারণ জগতে যাঁরাই যান তাঁরা সবাই আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ। কারণ জগৎ থেকে অনেকে আবার নেমে আসেন। কারণ জগতের সবাই যে নিত্যসিদ্ধ হবেন তা না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দারিদ্রতা সেখানে কারুরই নেই।

আর-একথাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হল –অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর –আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়। –একটু একটু করে হয় না। ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎ সিদ্ধ এগুলো নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কথা বলেছেন। বিভিন্ন পরম্পরার সাধু-মহাত্মাদের কাছে হয়ত শুনে থাকবেন, সেখান থেকে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন।

যাঁরা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। যাঁরা সংসারী, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকে সাধন-ভজন করতে হয়। সন্ন্যাসীরা, ত্যাগীরা চব্বিশ ঘণ্টা এতেই ডুবে আছেন। পুকুরের মাছের মত, সব সময় জলেই আছেন। কিন্তু যারা পুকুরের বাইরে থাকে, তাদের মাঝে মাঝে পুকুরে নেমে শরীরকে, মনকে শীতল করে নিতে হয়। জপধ্যান করা মানে মনকে শীতল করা, এর বেশি কিছু না।

আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, উনি একটা সেন্টারের অধ্যাক্ষ ছিলেন। অনেক আগেকার কথা, ওই সেন্টারের এক সন্ন্যাসীর ইচ্ছা হল উনি নর্মদা দর্শনে যাবেন। অধ্যাক্ষ মহারাজের ইচ্ছা ছিল না যে উনি নর্মদায় যান, উনি চলে গেলে আশ্রমের কাজের অসুবিধা হবে। যাই হোক, অনুমতি চেয়েছেন, কি আর করা যাবে, অনুমতি দিলেন। এক মাস নর্মদা ঘুরে এসে অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, 'মহারাজ নর্মদা ঘুরে এলাম'। অধ্যক্ষ মহারাজ একেই রেগে ছিলেন, এক মাস কাজের অসুবিধা হয়েছে। রেগেমেগে বলছেন, 'কৃতার্থ করেছ'।

এটা সবাইকে মনে রাখতে হয়। জপধ্যান যখন করছেন তখন মনে রাখবেন, আপনি কাউকে কৃতার্থ করছেন না। বাচ্চা বয়সে আমরা কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে বলতাম, মা এতক্ষণ পড়ে দিয়েছি। ভাবটা হল –এতক্ষণ পড়লাম, তোমাকে কৃতার্থ করে দিলাম। জপধ্যান করে আপনি ঈশ্বরকে কৃতার্থ করছেন না, আপনার গুরুকে কৃতার্থ করছেন না, কাউকে কৃতার্থ করছেন, মন, প্রাণ, জীবন এটাকে শীতল করছেন।

(চৌধুরীর প্রতি) – পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে? তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য –কি বুঝবে? তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে?

এই একটা জিনিস কথামৃতে বারবার আসে –তাঁর কার্য বোঝা যায় না। ঠাকুর কেন এই কথা বারবার বলছেন –এটাকে আমাদের খুব ভাল করে বোঝা দরকার। ঠাকুরই যে এই কথা বলছেন, তা না, আমাদের শাস্ত্রও একই কথা বলছেন। আমাদের সমস্যা হল, অল্প বয়স থেকে পপুলার ধর্মের কথা শুনে শুনে আমাদের মনে কিছু ধারণা বসে গেছে। ঠাকুরই আবার বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে। চিনিতে বালিতে কেন মিশে আছে? কারণ শাস্ত্রে তত্ত্ব কথাগুলো রয়েছে, তত্ত্ব কথাগুলিকে বোঝানর জন্য আরও কিছু কথা রয়েছে। পুরাণে সেই কথাগুলো রয়েছে, এমনকি কথামৃতেও সেই কথাগুলো রয়েছে যেটা আমাদের ধারণা করানোর জন্য বলা হয়েছে। উদাহরণগুলিকে নিয়ে যদি সত্যের সন্ধান করতে যান, তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। তত্ত্ব যদি জানতে হয়, তাহলে অনেকগুলো শাস্ত্র জানতে হয়। ছোটবেলা আমরা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলো শুনেছি, সেখান থেকে আমরা ধর্মের অনেক কিছু ধারণা করে বসে আছি। কিন্তু অনেকগুলো শাস্ত্র পড়া হলে কি হয়, শাস্ত্রগুলির কমন পয়েন্টস্‌গুলোকে আলাদা করে যদি আপনার নজরে আসে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে, যেখানে একই কথা বলে যাচ্ছে, ওগুলো তত্ত্ব কথা আর এর ভিতরে অনেক কিছু কথা যেগুলো এমনি বলা হয়েছে, সেগুলো বোঝানর জন্য বলা হয়েছে।

একটু শাস্ত্র যদি জানা না থাকে, ধর্মপথে এগোন খুব কঠিন। লোকেরা মনে করে, ঠাকুরের নাম করলে, শরণাগতি নিলেই হবে। কিন্তু সে-রকম একটা লোক দেখান তো। আপনি আপনার দিদিমার কথা বলবেন, ঠাকুরমার কথা বলবেন, যাঁদের আপনি ছাড়া আর কেউ চেনে না। যতক্ষণ তত্ত্ব না ধারণা হয় ততক্ষণ সাধনা হয় না। ঠাকুর খুব কঠোর ভাষায় বলছেন –কলকাতার অমুক মহিলারা এত এত জপ করে কিন্তু কই কিছুই তো হয় না। কিছু হওয়ার তো কথা নয়। কারণ তত্ত্ব যতক্ষণ না বোঝা হয়, আপনার মন তত্ত্ব যদি না মেনে থাকে, মন কামিনী-কাঞ্চনে ডুবে যাবে, মন ডানদিক বামদিক চলে যাবে। বুঝতেও দেবে না, মনকে কখন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এই যে ঠাকুর বলছেন, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য –কি বুঝবে? তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে? এখানে কয়েকটা কারণ আছে। প্রথম কথা হল, আমরা অনেকবার একটা জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করেছি –ঈশ্বর অনন্ত, সেই তুলনায় আমরা অত্যন্ত সীমিত। সীমিতকে দিয়ে অসীমকে মাপা যায় না। এক লিটার বোতল দিয়ে তিন লিটার জল বা দুধ মাপতে পারবেন না। মানুষ সীমিত, মানুষের মন সীমিত; এই সীমিত মন শুধু মাত্র বলতে পারে –তিনি বিরাট। তিনি বিরাট ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। ওখানে কি লজিক ফেইল করে যায়? না, কেন লজিক ফেইল করবে? কারণ ওখানকার যুক্তি পুরো অন্য ধরণের আর তিনি আমাদের থেকে যে অনেক উঁচু, এটা কেবল তিনিই জানেন। তাহলে এই কথাগুলো আমরা বলছি কি করে? কারণ ঋষিরা সবাই এই একই কথা বলে গেছেন। অন্যান্য ধর্মের যাঁরা ঋষি, তাঁরাও এই একই কথা বলেছেন।

ঈশ্বর অনন্ত –এটা হল মূল কথা। ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের যে আলো, সেটা যখন আমাদের মন দিয়ে বিকৃত হয়ে আসে; ওই বিকৃত আলো দিয়ে আমরা অন্তর্জগত ও বহির্জগতের সব কিছু বোঝার চেষ্টা করি, ফলে আমরা জিনিসটাকে ঠিক ভাবে জানতে পারি না। আমাদের যে এই আলো আঁধারের দৃষ্টি, এই দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে জানা যায় না।

নাসদীয় সুক্তে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন, সৃষ্টি কিভাবে হল কেউ জানে না। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম জিনিসকে বুঝতে পারে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনকে তো বোঝাতে হবে। সেইজন্য সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য বলা হয় –ভগবানের শরীর থেকে এই এই তৈরী হল, বিষ্ণু এই এই করলেন, ব্রহ্মা সেখান থেকে সৃষ্টি করলেন। আসলে কিন্তু সৃষ্টির কথা কেউ জানে না। যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি তাঁরা এই জিনিসটা জানেন যে, এগুলো বোঝানর জন্য বলা হয়েছে; সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য যখন বলা হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা, তখন এটাই

হল সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, যার অর্থ হল –আমার জানা নেই। তবে স্পষ্ট ভাবে আপনি যদি বলেন –আমার জানা নেই সৃষ্টি কিভাবে হল, আপনি অন্তত একজন সৎ ব্যক্তি। সৃষ্টি কিভাবে হল, এটাই যদি জানা না থাকে, তাহলে সৃষ্টিতে কোনটা থেকে কি হয়, কি করে বলবে!

আমাদের এখানে অক্সফোর্ডের পোস্ট ডক্টরেট করা একজন ব্রহ্মচারী আছেন, উনি একদিন কথায় কথা বলছিলেন, 'ধর্মের বেশির ভাগ জিনিসই হল এক-একটা মডেল, ব্যাখ্যা করার বিধি'। আমি বললাম, 'না না মডেল কেন হবে, এগুলো ওয়ার্কিং মডেল, এগুলো সবই সত্য কিন্তু রিলেটিভ সত্য'। 'কি রকম রিলেটিভে সত্য এগুলো'? 'আপনি যদি নিউটোনিয়ান ফিজিক্স দেখেন, সেখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে; এতটা জোর লাগালে জিনিসটা এত দূর যাবে। এই জিনিস সবাই জানে। আমরাও জগতে দেখি, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এটাকে বলে কার্য-কারণ সম্পর্ক। কিন্তু বেদান্ত হাজার হাজার বছর ধরে বলে যাচ্ছে –যখন তুমি আরও সূক্ষ্ম স্তরে যাবে তখন কিসে থেকে কি হয়, কার কার্য, কি কারণ, কিছুই বুঝতে পারবে না। জিনিসটা সমান সমান না, কিন্তু নিজেকে বোঝানর জন্য ঠিক আছে'।

যখন কোয়াণ্টাম ফিজিক্স এলো, তখন ওনারা বললেন যে, একটা এ্যটমের ভিতর যে ইলেক্ট্রন ঘুরছে, সেই ইলেক্ট্রনের পজিশান যদি জানতে পারেন, তাহলে ইলেক্ট্রন কত স্পীডে ঘুরছে জানা যাবে না। জিনিসটাকে যে পুরোপুরি জানা সম্ভব না, আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের এই সত্যগুলিকে মানতে চাইলেন না। অথচ এখন সবাই ওটাকে নিয়েই চলছে, আর এর প্র্যাক্টিক্যাল ইউটিলিটিও দেখা যাচ্ছে। আপনি ইলেক্ট্রনের পজিশান, ওর গতি না জানতে পারেন। কিন্তু গাড়ি যদি বেশি স্পীডে চালান, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে –অমুক রাস্তায় আপনি এই স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আইন লঙ্ঘন করেছেন। তাহলে কে ভুল, কে ঠিক? যে যার নিজের জায়গায় ঠিক। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটাও সত্য; কিন্তু আপনি যদি নির্দিষ্ট করে বলে দেন, এটা থেকে এটাই হবে; না, এটা মানা যাবে না। আমি একজন জ্যোতিষীকে জানতাম, পণ্ডিত লোক ছিলেন, উনি খুব সুন্দর বলেছিলেন –'এই যে গ্রহগুলো আছে, এগুলো ইম্পেল করে, ওই দিকে নিয়ে যায় কিন্তু কম্পেল করে না'। আমি বললাম, 'আমি প্রথম একজন জ্যোতিষী দেখলাম, যাঁর ঠিক ঠিক চেতনা আছে'।

আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু আপনি ওটা নাও করতে পারেন। কারণ মানুষের যে ইচ্ছাশক্তি, তা অনেক বলবতী। গ্রহ সাধারণ জিনিস, গ্রহ আপনার কি করবে! গ্রহের কি করার ক্ষমতা আছে! আপনি হলেন সেই শুদ্ধ আত্মা, আপনি সেই ঈশ্বর, যিনি সাক্ষাৎ আপনার অন্তর্যামী হয়ে আপনার ভিতর বসে আছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির এলাকা। প্রকৃতি আপনার কি করবে, প্রকৃতির কি দম আছে! তাই বলে কি গ্রহ-নক্ষত্রের কোন দাম নেই? পুরো দাম আছে। কোথায় দাম আছে? এরা আপনাকে একটা দিকে নিয়ে যাবে, কারণ আপনি তার সঙ্গে যেতে চাইছেন। আপনি যদি বলেন, আমি যাব না; গ্রহ-নক্ষত্রের কিচ্ছু করার থাকবে না। সেই কারণে কোন জ্যোতিষীদের গণনা একশ ভাগ ঠিক হতে পারে না। তিনি যেটা বলেন তা হল, গ্রহের ফের ওকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা পুরোপুরি কক্ষণ না। বিশেষ করে যাদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, আর যাঁরা ঈশ্বরের উপর শরণাগত, তাঁদের উপর তো খাটবে না। যদি বলেন, আপনার উপর খাটবে? অবশ্যই খাটবে, কারণ আমি তো ঈশ্বরের চেতনার সঙ্গে এক নই। হলেও কিছু কিছু জিনিস তো লাগবেই।

কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে কিছু বলা যায় না যে, এটা থেকে ওটা হবে, ওটা থেকে সেটা হবে। একশ বছর আগে আমি যদি এই কথাগুলো বলতাম, লোকেরা আমার উপর হাসত। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোনটা থেকে কি হয়, এটা পুরোপুরি বলা যায় না। গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান একটা শ্লোকে বলছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্,* ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ চৈতন্য আর প্রকৃতি হল জড়; এই দুটোর কখনই মিলন হয় না। সমাজে আপনি ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ করতে পারেন, ইন্টার রিলিজিয়াস ম্যারেজ করতে পারেন, কিন্তু এখানে দুটো যে বিপরীত স্বভাব আসছে, এদের কখন মিলন হয় না। চৈতন্য আর

জড় এরা দুজন বিপরীত স্বভাবের, দুজনের কোন দিন মিলন হবে না। মিলন হওয়ার জন্য যদি একটা কমন প্ল্যাটফরম হয়, তাহলে সেখানে তখন ওই একই সমস্যা হয়ে যাবে। অথচ আমরা দিনরাত দেখছি চৈতন্য আর জড় এক সঙ্গে আছে।

গীতার আলোচনায় আমরা এটাকে ট্রান্সফরমারের উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। ট্রান্সফরমারে দু-রকমের কারেন্ট হয় –প্রাইমারি কারেন্ট আর ইনডিউসড্ কারেন্ট –প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েল। ট্রান্সফরমারে এই দুটো কারেন্টের সাথে কোন সংযোগ নেই, কিন্তু ফিল্ড তৈরী কর, এর ফিল্ড ও করে, ওর ফিল্ড সে করে। আপনার এখানে কারেন্ট যেমনই থাকুক, উপরে যদি বন্ধ হয়ে যায় আপনার কিছু করার নেই। ডিভিসি যদি কারেন্ট বন্ধ করে দেয় আপনার কিছু করার নেই।

রিচার্ড ফাইনম্যান একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান মিলিটারি থেকে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটা দ্বীপে অস্থায়ী একটা এয়ারবেস নির্মাণ করেছিল। ওখানকার লোকাল ট্রাইবালদের সাথে আমেরিকার সৈন্যদের ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ট্রাইবালরা দেখত মিলিটারিদের যে এয়ার কন্ট্রোল রুম ছিল, সেখানে একজন মিলিটারি একটা টুপি পরে থাকে, সেই টুপির একটা এরিয়াল বেরিয়ে আছে আর হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পরেই দেখছে এ্যারোপ্ল্যান এসে নামল, আর প্লেন থেকে প্রচুর খাবার-দাবার নামিয়ে আনছে। সেখান থেকে ওরা ট্রাইবালদেরও দিত। ট্রাইবালরা দেখছে, এখান থেকে মিলিটারিদের একজন এরিয়াল লাগানো একটা কিছুতে মুখ লাগিয়ে হ্যালো হ্যালো করছে আর প্লেন এসে খাবার-দাবার দিয়ে যাচ্ছে।

একদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমেরিকা ওখান থেকে এয়ারবেস বন্ধ করে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে গেছে। ট্রাইবালরা কিছু জানে না, নিরক্ষর মানুষ। ওরা তখন বাটির মত একটা জিনিস এয়ারবেসে পড়েছিল, সেটা মাথায় লাগিয়ে আর তার মধ্যে একটা কাঠি গুজে দিয়ে সারাদিন বসে হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে, এই আশায় যে, আবার প্লেন আসবে, প্লেন থেকে খাবার-দাবার নামিয়ে আনা হবে। কিন্তু আশা নিরাশায় চলে গেল, কিছুই আসে না। কারণ, আসল যে জিনিসটা সেটাই বন্ধ হয়ে গেছে। এই আসল কি করতে চাইছে আমাদের কোন ধারণা নেই। আমরা সবাই নকলে বাস করছি, আর নকল থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি, ঈশ্বর এ-ভাবে আমাদের জন্য করবেন। কিন্তু তাঁর মনটাই আলাদা, পুরো অন্য ধরণের।

কথামৃতের এই সেকশানটা খুব মূল্যবান। মাত্র তিনটে চারটে বাক্য, যদি আপনার মন দিয়ে বুঝে নিতে পারেন, জীবনে আপনাদের অনেক সমস্যা কমে যাবে।

ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবসুর একজন বসু। স্বর্গে ইন্দ্র, বরুণাদি যে দেবতারা আছেন, এনার হলেন শ্রেষ্ঠ। সেই স্বর্গলোকের রাজা হলেন ইন্দ্র। তারও উপরে বলা হয়, কিছু কিছু ঋষিরা আছেন; ঠাকুরও এর বর্ণনা করছেন। কিন্তু দেবতা আর মানুষের মাঝখানে অনেকে আছেন, তার মধ্যে একট নাম বসু –এনারা খুব উচ্চমানের প্রানী, কিন্তু দেবতাদের থেকে নিচে। বসু হলেন আটজন, আটজনের মধ্যে ভীষ্মদেব একজন। কোন একটা অভিশাপে অষ্টবসু থেকে পতন হয়ে তাঁর মনুষ্য শরীরে জন্ম হয়েছিল। অষ্টবসুর একজন, তার মানে তাঁর জ্ঞান সব সময় রয়েছে।

তিনিই শরশয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন – কি আশ্চর্য! পাণ্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্বদাই আছেন, তবু তাদের দুঃখ-বিপদের শেষ নাই! ভগবানের কার্য কে বুঝবে!

কেউ মনে করে আমি একটু সাধন-ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিন্তু হার-জিত তাঁর হাতে। এখানে একজন মাগী (বেশ্যা) মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করলে।

এই পুরো জিনিসটাকে যদি একটু চিন্তা করেন। ঠাকুর নিজে থেকে এমন সব মেয়েদের নিয়ে একটা উপমা দিচ্ছেন, যে মেয়েদের সমাজ ভাল চোখে দেখে না। ইদানিং অন্য ধরণের শব্দ ব্যবহার করে তাদের ইঙ্গিত করা হয়। অনেক প্রাচীন কালে গেলে দেখা যাবে, তখনও এ-রকম শব্দের প্রচলন ছিল না। যাঁরা নাচগান করতেন, তখনকার দিনে ওনাদের নামই ছিল নগরবধূ। সেখান থেকে অন্যান্য শব্দগুলো এসেছে। খ্রীশ্চান মর্যালিটি আসার পর শব্দগুলোকে আরও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে শব্দগুলো নারী বা মায়েদের জন্য একেবারেই ভাল না। ঠাকুর বলছেন, এখানে একজন মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করলে।

সজ্ঞানে এইজন্য বলছেন, গীতায় ভগবান বলছেন, মৃত্যুর সময় যে চিন্তা-ভাবনা থাকে, সেই চিন্তা ও ভাবনা অনুযায়ী তার পুনর্জন্ম হয়। সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করা মানে, মৃত্যুর সময় তাঁর মনে এই চেতনা আছে যে, আমার মৃত্যু আসন্ন, আমাকে গঙ্গার তীরে আনা হয়েছে, আমি ঈশ্বরের চিন্তন করছি; তাঁর পরের জন্মটা স্বাভাবিক ভাবেই ভাল হবে। তার মানে, সমাজ যাকে খারাপ মনে করছে, শেষ সময়ে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। এই ধরণের অনেক ঘটনা আমরা জানি, যেখানে মৃত্যুর সময় সজ্ঞানে তিনি দেহ ছাড়ছেন। সজ্ঞানে মৃত্যু হলেই যে সব সময় ভাল হবে তা না। ঠাকুর একটা জায়গায় বলছেন, মৃত্যুর সময় বলছে, পিদ্দিমের সলতেটা কম করে দে, তেল পুড়ে যাচ্ছে। সজ্ঞানে আছে ঠিকই, কিন্তু চেতনাটা কোথায় দেখতে হবে। এখানে যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তাঁর চেতনা পরিষ্কার –আমি শুভ জন্ম চাই। মরার আগে তাই গঙ্গায় চলে এসেছেন। হিন্দুদের এই ধারণা চিরদিনই ছিল; গঙ্গাকে এত পবিত্র ভাবতেন যে, মৃত্যুর সময় গঙ্গালাভ হলে মনে করতেন আমি বৈতরণী পার করে যাব, আমার শুভ জন্ম হবে।

W. Somerset Maugham খুব নামকরা লেখক, ওনার অনেক নামকরা সব উপন্যাস আছে। তার মধ্যে Cakes and Ale বলে একটা বই আছে, অত জনপ্রিয় নয়। সেখানে তিনি মর্যালিটি জিনিসটাকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। এর মূল কথা হল, মর্যালিটিকে নিয়ে আমাদের যে চিরপরিচিত ধারণাগুলি রয়েছে, সেটা দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না। এটা অবশ্য উপন্যাস, উপন্যাসে আপনি যেমন খুশি কথা বলে দিতে পারেন, কিন্তু সেখানে তিনি বলছেন –এই ধরণের একজন মহিলাকে তিনি দেখেছিলেন, যাঁকে দেখে তিনি বুঝলেন যে সমাজ এই মহিলাকে নিয়ে যাই ভাবুক না কেন, ইনি কিন্তু স্পিরিচুয়াল। কারণ মানুষ অনেক সময় অভাবে, পেটের দায়ে পড়ে অনেক কিছু করে। কোন সমস্যায় পড়ে গিয়ে অনেক কিছু হয়ে যায়, তাই বলে তার প্রতি তাচ্ছিল্য দৃষ্টি দেওয়া যায় না। কিন্তু নিয়ম হল সেই –প্রাইমারি কারেন্ট আর সেকেণ্ডারি কারেন্ট। আমাদের সবারই মন যেন একটা ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমারের যে প্রাইমারি কারেন্ট, এটা ভগবান আর সেকেণ্ডারি কারেন্ট এটা আমার। এই সাপ্লাইটা কার, কেমন করে হয়েছে, আপনি কি করে জানবেন, এটাকে দেখে তো বোঝা যাবে না। ওই সাপ্লাইটা কখন কেমন হবে, আপনি জানতে পারবেন না।

ভীষ্মদেব, যিনি অষ্টবসুদের মধ্যে একজন, যিনি জ্ঞানী তিনি কাঁদছেন। তাঁর কান্না দেখে অর্জুন মনে করছেন, পিতামহের মত জ্ঞানীও মৃত্যু ভয়ে কাঁদছেন? জিজ্ঞাসা করা যাক। জিজ্ঞাসা করাতে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন –ঈশ্বরের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না; স্বয়ং ঈশ্বর সর্বদা পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, তাও এদের দুঃখ-বিপদের শেষ নেই। ঠাকুরও অনেক গল্প বলছেন, একজন ভক্তকে ভগবতী দর্শন দিলেন, কথা বললেন, সবই করলেন, কিন্তু ভক্তের দারিদ্রতাটা ঘুচল না। আবার একটা বলছেন, গঙ্গায় স্নান করলে পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু চোখের কানাটা যায় না।

এই যে বলছেন –হার-জিত তাঁর হাতে; আমরা নিজেরাই আগে থেকে কিছু কিছু জিনিস ধারণা করে নিয়ে থাকি –যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে। যেমন –মানুষ যদি ভাল হয়, তার কেন কষ্ট হবে? এটাকে যদি আরেকটু টানা হয়, তখন বলবে –মানুষ যদি ভাল হয়, তাহলে সে মরবে কেন? প্রথমে

বলবে, তার অকালমৃত্যু কেন হবে? তারপরেই বলবেন, ভাল মানুষ মরবে কেন? ভাল মানুষ গরীব হবে কেন? ভাল মানুষের এত কষ্ট হবে কেন? কিন্তু আপনাকে কে বলেছে যে, ভাল মানুষ হলে তার কষ্ট হবে না, গরীব হবে না, মরবে না, ইত্যাদি? ভগবান কি এ-রকম কথা কোথাও বলেছেন? ভগবান কোথায় বলেছেন যে, মুর্খ হলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যাবে না। আমাদের সংবিধানে কোথাও কি লেখা আছে, কি মনুসংহিতায় কোথাও কি বলা আছে যে, পড়াশোনা যার নেই সে রাজা হতে পারবে না। দুষ্ট বদমাইশ হলে মন্ত্রী হওয়া যাবে না, কোথাও কি আছে? আমাদের সমস্যা হল, আমরা নিজেরা একটা ধারণা করে নিয়েছি।

আর আমরা মনে করি, আমার যেটা আছে, ধরুণ আপনার পড়াশোনা আছে, কি আপনি দেখতে সুন্দর, কি আপনার অনেক টাকা আছে, এরপর আপনি মনে করছেন –ভগবান আমাকে এটা দিয়েছেন বা আমি এটা পেয়েছি বা জন্ম থেকে আমার ভিতরে এগুলো আছে বলে জগতের সব কিছু আমারই হবে। এই ধরণের ধারণা যে কি সর্বনাশের কারণ, আমরা কল্পনা করতে পারব না। এই ধারণা প্রথম শুরু করে জুহুদিরা। তারা নিজদেরকে নিয়ে সবাইকে বলতে শুরু করল, আমরা হলাম ভগবানের বিশেষ। জুহুদিদের ধর্ম শুরুই হয় বিভিন্ন ট্রাইব গোষ্ঠি থেকে আসা লোকজনদের দিয়ে। একদিন হঠাৎ ওদের ভগবান ওদের লীডারের সঙ্গে contract করলেন, তোমরা যদি আমাকে ভগবান মনে করো, তাহলে আমি তোমাদের এই এই করে দেব। সেখান থেকে শুরু হল, chosen people of God। সেই যে শুরু হল, তারপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। এখন তো বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও একটা কিছু যদি তাদের থাকে, সেটাকে জাহির করতে নেমে যাবে। যেমন আমরা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়েছেন সেটা আপনার ব্যাপার। আমি ঘরবাড়ি ছাড়লাম, সন্ন্যাস নিলাম, সেটা আমার ব্যাপার; কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাব নিয়ে নিই –আমি ত্যাগী, সমাজ আমাকে যেন সম্মান দেয়। আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন তার জন্য সমাজ কেন আপনাকে সম্মান দেবে?

আমাদের স্কুলে এক ছাত্র ছিল, খুব ভাল ছেলে ছিল। ওর মা কলকাতার এক নামকরা স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। আগেকার দিন শিক্ষকদের মাইনে খুব কম ছিল, টাকা-পয়সার অভাব ছিল। তিনি বড়লোকদের বাড়িতে টিউশান পড়াতেন। বড়লোক হওয়াতে যা হয়, তারা সেইভাবে তাঁকে সম্মান দিত না। সেই কথা বলতে গিয়ে ছেলেটি কাঁদতে শুরু করল। 'দেখুন, আমার মা একজন টিচার, কিন্তু অর্থাভাব লেগেই আছে, আর সেই সম্মানটুকুও নেই'। আমি ওকে শান্ত করার জন্য বললাম, 'তুমি এটা কেন ধরে নিয়েছ যে টিচার বলেই তাঁকে সম্মান করবে? টিচার হওয়ার জন্য তিনি একটা মাইনে নিচ্ছেন, মাইনে যদি না নিতেন তাহলে হয়ত সম্মান দেওয়া হত'। কিন্তু এই ধারণা যে শুধু একটা ডিগ্রি আছে, টিচার বলে তাঁকে সবাই সম্মান দেবে, টিচার বলে তাঁর টাকা হবে, যুক্তিতে তো দাঁড়ায় না। উল্টোটাও হতে পারে, যার টাকা আছে সে বলতে পারে, আমার বিদ্যা নেই কেন?

আজকে আমাদের দেশে এটা এত বড় সমস্যা হয়ে গেছে যে, লোকেরা হয় বুঝছে না, হয়ত বা বুঝেও বুঝতে চাইছে না। আমার একটা ডিগ্রি আছে, আইটিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট, তাহলে সরকার আমাকে চাকরি দিচ্ছে না কেন? ডিগ্রি আছে বলে চাকরি দিতে হবে, যুক্তিতে কিন্তু দাঁড়ায় না, যুক্তিটা অন্য রকম। এই চাকরি পেতে গেলে এই রকম ডিগ্রি দরকার, কিন্তু ডিগ্রি থাকলেই যে তুমি চাকরি পাবে তা না।

এই যে ঠাকুর থেকে থেকে বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্যটা হল তাঁকে ভালবাসা। যখনই কোন কাজ করা হয় সব সময় মনে রাখতে হয় –এই কাজটা আমি করছি কারণ, এটা আমি করতে ভালবাসি। এই ভাব যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে বিজনেস করছেন, বিনিময় করছেন। লাভ বা লোকসান হল এর পরিণাম, সেখানে আপনার লোকসানও হতে পারে। আমাদের জীবনে অনেক কষ্ট শুধু এই কারণে হয়। একজন বিয়ে করল। বিয়ে করার পর ছেলে হোক, মেয়ে হোক, ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

ও আমাকে স্পেস দেয় না। কে বলেছে বিয়ে করলে স্পেস দিতে হবে? একটা কিছু দিলাম, দেওয়ার পর ওকে আমি আমার মত ধরে নিলাম। দু-দিন যেতে না যেতে বলতে শুরু করলাম –ও কেন ওর ওটা দেবে না। বাচ্চারা যেমন করে –আমি তোকে খেলনা দিলাম, তুই আমাকে চকলেট দে। সে নাও দিতে পারে। আমাদের জীবনে এটাই বিরাট বড় সমস্যা। কারণ আমরা সব সময় মনে করি, আমি এটা করেছি, আমার এই এই কোয়ালিটি আছে; এগুলোর বদলে আমার এটা চাই। সমাজ এভাবে চলে না, সমাজ থেকে কিছু আপনি পেতেও পারেন, কিছু নাও পেতে পারেন।

এই ব্যাপারটাকে যেমনি আমরা মূল্যবোধে নিয়ে যাব, আর ভক্তিতে নিয়ে যাব; তখন এটাই আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা মনে করি, সে ঈশ্বরের ভক্ত তার এত কষ্ট কেন? ঈশ্বরের ভক্তের কষ্ট হবে না; এ-কথা কে কোথায় বলছেন? ভাল মানুষ, তার কেন টাকা হবে না? তাহলে ভাল মানুষ হয়ে কি লাভ? কে বলেছে আপনাকে ভাল হতে, আপনি বদমাইশ হয়ে যান। আগামীকাল বা দুদিন পর যখন মার খাবেন তখন শিক্ষা পাবেন যে, ভাল মানুষ হওয়াটা আপনার দরকার। আপনি ভাল হবেন এইজন্যই, কারণ আপনার স্বভাব ভাল হওয়া। আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসবেন, কারণ ঈশ্বরকে ভালবাসাটাই আপনার স্বভাব। আমাদের সমস্যা হল, জগতে external result আর inner transformation আলাদা। আপনি যখন কাউকে ভালবাসেন –এটা external, পরিবর্তনটা হয় ভিতরে। আমরা ভিতরটা ছেড়ে দিয়ে বাইরে মাপতে যাই বলে এত সমস্যা। আপনারা দেখবেন আমার আপনার জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট সব এই কারণে। ঠাকুর তোমাকে এত ভালবাসলাম, এত জপধ্যান করলাম, তাও এ-রকম কেন হল?

একজন মহারাজ কোন একজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে বলছিলেন, 'উনি এত জপধ্যান নিয়ে ছিলেন, ওনাকে ওখানে কেন পোস্টিং করা হল'? আমি বললাম, 'দুটোকে আপনি মেলাচ্ছেন কেন? তিনি যদি কোন মন্দিরের পূজারী হন, তাঁকে তো একটা সুযোগ দেওয়া হল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর অন্তর্জগতে আরও বড় হবেন। ঠাকুর যেমন বলছেন –ব্যবসা একটু একটু করে বাড়াতে হয়'। অন্তর্জগতেও আপনার সাম্রাজ্য বাড়াতে হবে, যদি না বাড়ান আপনি বড় হতে পারবেন না। বাহ্য জগৎ বাহ্য জগতের নিয়মে চলে, অন্তর্জগৎ অন্তর্জগতের নিয়মে চলে। মানুষের ভাল হওয়া অন্তর্জগৎএর ব্যাপার, ঈশ্বরকে ভালবাসা এটা অন্তর্জগতের ব্যাপার; বাহ্য জগতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এই যে বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে চলছেন, এটাও অন্তর্জগতের ব্যাপার, বাহ্য জগতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি সাধন-ভজন করা, বাহ্য জগৎ ছেড়ে দিন, এতে ঈশ্বরদর্শনও হবে না। লোকেরা এটা বুঝতেই পারে না। শ্রীশ্রীমা খুব সহজ করে বলছেন, ঈশ্বরদর্শন আলু-পটল কেনার মত নাকি? এত জপধ্যান করলাম, তাও ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে না কেন? কঠোপনিষদে বলছে –*নাশান্তমনসো বাহপি,* আচার্য শঙ্কর সেখানে বলছেন, ঈশ্বরদর্শন হবে কি হবে না, কবে হবে; এই চিন্তাও যদি থাকে তাহলেও হবে না। যারা সাধারণ মনের, তাদের এটা বুঝতে হয় –কিসে থেকে কি হয় বলা যায় না। যাঁরা একটু উচ্চমানের, যাঁরা নিয়মিত এই ক্লাশগুলো শুনছেন, আমি ধরেই নিচ্ছি তাঁরা উচ্চমানের, তা নাহলে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কি করে শুনবেন। আপনাদের বিশেষ করে এটা খুব ভাল করে বুঝতে হবে।

একটা সাধারণ কথা বলি, যদিও এই প্রসঙ্গের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ক্রিশ্ হ্যাটফিল্ড, একজন নভোশ্চর, ওনার একটা খুব সুন্দর বই আছে। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, ওনার একজন সহ-নভোশ্চরের সাথে তাঁর এই জীবনের শিক্ষার কি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি একটা ঘটনা বলছেন –ওনার যিনি সিনিয়র মহাকাশচারী ছিলেন, তাঁর ব্যবহারটা অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। কথায় কথায় রেগে যেতেন, যাকে তাকে গালাগাল দিতেন। তিনি ভাবছেন, আমার সিনিয়র যাই হন, এনার কাছেও আমার অবশ্যই কিছু শেখার আছে। কি শিক্ষা? আমি যদি ওর প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া না করি তাহলে আমার শক্তি বাড়বে।

এই ভদ্রলোক একবার নাসার প্লেন নিয়ে একটা জায়গায় নেমেছেন। সেখানকার একজন প্লেনে তেল ভরতে এসেছে, ভদ্রলোককে দেখে বলছে, 'আরে আপনি নাসা সেন্টারের, তাই না? আপনি ওখানে ওই লোকটাকে চেনেন, যার ব্যবহার অত্যন্ত বাজে'। ইনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আরে, তুমি ওকে চেন'? বলেই তিনি থেমে গেলেন। তিনি লিখছেন –পরে আতঙ্কিত হয়ে ভাবছিলাম, হে ভগবান, আমি যেন ও-রকম না হয়ে যাই যে, আমার কোন পরিচিতর সঙ্গে একজন অপরিচিতের দেখা হবে, আর প্রথম কথা এটাই বলবে –ওই লোকটাকে চেন, খুব বাজে লোক একটা।

এই ধরণের ঘটনাগুলো যখন আমরা মনের ভিতর চিন্তন করে ধারণা করি, ভিতরে তখন চেতনা আনতে হয় –আমাকে এগোতে হবে। কে কি বলছে, কে কি না বলছে, সবটাই আমাকে কাজে লাগাতে হবে; যাতে আমি ভিতরে ভিতরে এগোতে পারি। লোকে কেন আপনার নামে কথা বলছে, একবার ভেবে দেখুন। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আর ভাল মানুষ হয়েও বা ঈশ্বরের নাম করেও যদি কষ্ট আসে, তখন ভাল ভাবে বুঝতে হয় যে, এই কষ্টটা বহির্জগতের।

একজনকে ঠাকুর হাড়ি কিনতে পাঠিয়েছেন। সে একটা ফুটো হাড়ি নিয়ে হাজির। ঠাকুর তাকে বলছেন, আরে দোকানদার তো ধর্ম করবার জন্য বসেনি। বাহ্য জগৎ বাহ্য জগতের মত চলে। সেখানে কি নিয়ম আছে, কি আইন আছে, কেউ জানে না। ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা যদি এতই সফল হত তাহলে আমেরিকাতে থেকে থেকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হত না। এত ম্যানেজমেন্ট করেও তোমার কেন এই অবস্থা? আমেরিকাতে বিশ্বের এত নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ওদের গুগুল আদি বড় বড় কোম্পানির মাথায় গিয়ে বসে আছে ভারতের লোকেরা। তাই এটা থেকে ওটা হয় –কক্ষণ বলা যায় না; নিজের জীবন থেকে এই ধারণাটাকে সরিয়ে দিতে হয়। আপনি জীবনে কি চান, পরিষ্কার করে বুঝে নিন। টাকা-পয়সা চান? তাহলে আপনি ভগবানের ভক্তির দিকে না গিয়ে, যে বিদ্যা দিয়ে টাকা-পয়সা হয়, সেই বিদ্যার দিকে যান। ঠাকুরের বক্তব্য –সব সময় তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি যাতে হয়, সকলের তাই করা উচিত। এই হল ঠাকুর এখানে মূল যে জিনিসটা বলছেন, তার ব্যাখ্যা। ওখানে চৌধুরী বলে একজন ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করছেন।

চৌধুরী –তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়? ঠাকুর এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিয়েছেন। এখানে ঠাকুর যেটা বলছেন, তা হল –

শ্রীরামকৃষ্ণ –এ-চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন, তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ-দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিছলেন।

এই জিনিসটাকেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। মানুষ যে লোকে থাকে, যেমন আমরা ভ্যুলোকে থাকি, ভ্যুলোকে যে পঞ্চ তত্ত্ব আছে, এই পঞ্চ তত্ত্বকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই অনুসারে তৈরী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ভ্যুলোকে যা কিছু আছে, যেমন এ্যাটমসকে যদি আপনি দেখেন, দেখবেন প্রত্যেকটি এ্যাটমসের কিছু গুণ আছে। তার একটা কাঠিন্যতা আছে, তার একটা ওজন আছে, তার একটা রং আছে ইত্যাদি, এই জিনিসগুলিকে আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারি। রসায়নবিদ্যার বিজ্ঞানীরা পিরিয়ডিক টেবিলে ফেলে দিয়ে বলেন নিরানব্বইটা এলিমেন্ট খুব সহজে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে ক্লাশিফাই করেছেন। আমরা যখন ক্লাশিফাই করি তখন আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা ক্লাশিফাই করি।

কিন্তু এমন কিছু জিনিস আসছে যেটা, এই ভ্যুলোকের না, সেটাকে জানার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় নেই। ঈশ্বর এই জগতের নন, সেইজন্য এই চোখ দিয়ে কখনই তাঁকে দেখা যাবে না। সেইজন্য সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হয় বলে যারা সবাইকে বলে বেড়ায়, বুঝবেন হয় সে সবাইকে ধাপ্পা দিচ্ছে, নয়তো

তার ভ্রান্তদর্শন হচ্ছে। যোগে পরিষ্কার বলে ভ্রান্তদর্শন। যাদেরই এই দিব্যদর্শনগুলি হয়, বুঝবেন মাথায় ছিট আছে। ঈশ্বর এই জগতের নন, দেবতারাও এই জগতের নন, সেইজন্য এই চর্মচক্ষু দিয়ে কোন দিন দেখা যাবে না। ঠাকুর যখন ব্যাকুল হয়ে মা কালীর দর্শন পাওয়ার জন্য ক্রন্দন করছেন, মা কালীর দর্শন তিনি পাচ্ছেন না, বলছেন আমি গলা কেটে দেব, তখন তিন সেই দিব্যচক্ষু পেলেন। সেই দিব্যচক্ষু পেলেন বলে তিনি মা কালীর স্বরূপ দর্শন করতে পারলেন। দিব্যচক্ষু পাওয়ার পর তিনি যখন খুশি মা কালীকে দেখতে পারতেন। মা যখন চাইতেন তখনই তিনি ঠাকুরকে দর্শন দিতেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করছেন, তখন অর্জুনকে সাময়িক একটা দিব্যচক্ষু দেওয়া হয়েছিল। যে কেউ যদি বিরাট সাধনা করেন, সাধনা করে করে একটা সময় আসবে যখন স্থূল জগৎ থেকে মন উঠে তন্মাত্রার জগতে চলে আসবে। যোগশাস্ত্রে যেখানে বিভিন্ন সমাধির কথা আলোচনা করা হয়েছে; যেখানে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ, অস্মিতা প্রভৃতি সমাধির যে বর্ণনা আছে, সেখানে বলছেন মন সুক্ষ্ম হয়ে হয়ে যখন শেষ অবস্থায় যাবে, তখন এই দিব্যচক্ষু আসে। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অন্য রকম হয়ে যায়।

তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে। কেবল বিচারে করে! ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর পাশ্চাত্য দর্শন জানতেন না, এখানে যে বিচারের কথা বলছেন, এই বিচার হল ষড়দর্শনে যে বিচারাদি হয় সেটাকে নিয়ে বলছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন পুরোটাই বিচারের উপর চলে, শুধু যুক্তিতর্ক করে যাচ্ছে; যুক্তি কিভাবে করব সেটাকে নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছে। এরও দরকার আছে, দরকার যে নেই তা না। কিন্তু ঠাকুর বলছেন –ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে জানতে গেলে সাধন-ভজন চাই। সাধন-ভজন করতে করতে তিনি কৃপা করে যদি দিব্যচক্ষু দেন, তবে তাঁর রূপদর্শন হয়, সেই রূপদর্শন হলে ঈশ্বরের উপর আস্থা বাড়ে। ঈশ্বরের উপর আস্থা বাড়লে, অনুরাগ এলে তখন আরও সাধন-ভজন করার উৎসাহ হয়। স্বামীজী এক জায়গায় বেলুড় মঠে নবাগত সন্ন্যাসীদের বলছেন, ঈশ্বরদর্শন করতে এসেছিস, একটা ভূত যদি অন্তত দেখিস তাহলে বিশ্বাস হবে এই জগতের পারেও কিছু আছে। এই বিশ্বাস যখন হয় তখন আরও সাধনার দিকে মন যায়।

আপনি বাড়িতে বসে আছেন, ঠাকুর এসে আপনাকে দেখা দিলেন, আপনাকে বললেন –কি গো কেমন আছ, আজ কি রান্না করলে? আপনি বললেন, ভাত, ডাল, মাছের ঝোল। এতে আপনার কি হবে? জগৎ থেকে আপনার মন সরবে? জগতে যা কিছু সুখ আছে, সেখান থেকে আপনার মন কি সরবে? না, সরবে না। তাতে কি লাভ হল? ঈশ্বরদর্শন হলেও যা, ঈশ্বরদর্শন না হলেও তাই। ঠাকুরের কি তাই হয়েছিল, কখনই না, complete change। পরিবর্তন যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কোন কিছুই কিছু না। দর্শন পড়লে কি আপনার জীবন পরিবর্তন হবে? গণিতে বড় ডিগ্রি থাকলে আপনার জীবনের কি পরিবর্তন আসবে? কখনই আসবে না। শাস্ত্র পড়লে কি জীবনের পরিবর্তন হবে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। শাস্ত্র পড়ে যদি জীবন পরিবর্তন হয়, তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়ন সার্থক। যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে নাটক নভেল পড়লেও যা, শাস্ত্র পড়লেও তাই।

যদি রাগভক্তি হয় –অনুরাগের সহিত ভক্তি –তাহলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। ঈশ্বরকে আপনি যেভাবেই নিন, সেই ঈশ্বর যিনি অনন্ত, সেই ঈশ্বর অন্তর্যামী রূপে সবার ভিতরে আছেন। সেই ঈশ্বরের প্রতি যদি সত্যিকারের ভালবাসা, সত্যিকারের প্রেম হয়, নিজেই হবে।

ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয় –খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয় –গবগব করে খায়। ঠাকুর গ্রামদেশে ছিলেন, এগুলো তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। খোল জিনিসটা সবাই জানেন। সরষে পিষাই করে তেল হয়। তেল বেরিয়ে যাওয়ার পর, সরষের যে বার্জ্য পদার্থ থাকে সেটাকে খোল রূপে ব্যবহার করা হয়। খোলের মধ্যে সামান্য তেল থাকে, প্রোটিন থাকে। শুকনো খড়ের সাথে যদি খোল মিশিয়ে দেওয়া হয়, গরু গবগব করে খেয়ে নেবে।

ইমোশান সবারই থাকে, বাচ্চা থেকে শুরু করে একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একজন মৃত্যুপথযাত্রী সবারই ইমোশান থাকে। ইমোশানসকে তখনই ইমোশান বলা হয়, যখন তা জগতের দিকে যায়। এই ইমোশানই যখন, কাম-ক্রোধ-লোভাদি যখন ঈশ্বরের দিকে যায়, এটাই তখন ভক্তি হয়ে যায়। ইমোশানও যা, ভক্তিও তাই –জগতের দিকে গেলে ইমোশান, ঈশ্বরের দিকে গেলে ভক্তি। ঈশ্বরের দিকে মানে ঈশ্বরের দিকে, অর্থাৎ জগৎকে সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়তে হয়, এখানে পার্ট-টাইম বলে কিছু হয় না। পার্টটাইম ভক্তি ভক্তি না, পুরো ইমোশানালিজম্।

রাগভক্তি –শুদ্ধাভক্তি –অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের। শুদ্ধাভক্তি জিনিসটা হল একেবারে খাঁটি, একেবারে শুদ্ধ। কোথাও কোন কিছুর চাহিদা নেই। শুদ্ধাভক্তির আর-একটা নাম রাগাত্মিকা ভক্তি; রাগাত্মিকা ভক্তিও যা শুদ্ধাভক্তিও তাই। ঠাকুর প্রহ্লাদের উদাহরণ দিচ্ছেন, প্রহ্লাদের মধ্যে শুধু ভক্তি, ভক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। ঠাকুর কথায় কথায় উদাহরণ নিয়ে আসেন। যাঁরা শুনছেন, তাঁরা হয়ত মূল বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন না, সেইজন্য উদাহরণ আনতে হয়; ঠাকুর তাই এবার অন্য একটা উদাহরণ নিয়ে আসছেন।

তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না –কিন্তু রোজ আস –তাকে দেখতে ভালবাস। জিজ্ঞাস করলে বল, 'আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই –আপনাকে দেখতে এসেছি'। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না –কেবল ভালবাস।

এটাই আসল কথা। ভালবাসা আপনার ব্যাপার, জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, আপনার কাছে যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারবেন না, কোন মতেই সম্ভব না। তাহলে গীতায় যে বলছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন*, চার ধরণের লোক আমায় ভালবাসে। চারজনের মধ্যে অর্থার্থীর কথাও বলছেন ঠিকই, কিন্তু অর্থের জন্য, জাগতিক বিষয়ের জন্য যে ভক্তি, এটা নিম্নমানের ভক্তি। সেইজন্য ভগবান বলছেন –*তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে*, যিনি ঈশ্বরের সাথে নিত্যযুক্ত, ভগবান নিজে বলছে, *অহং স চ মম প্রিয়ঃ*, সে হল আমার প্রিয়। আমি তাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে। আবার অন্য জায়গায় বলছেন, *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি*, সেও কখন আমাকে ভোলে না, আমিও তাকে কখন ভুলি না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের মধ্যে পড়ে, কিন্তু চারটের সাথেই চেষ্টা ব্যাপারটা জুড়ে আছে। ভালবাসাতে চেষ্টার কিছু নেই। প্রথমের দিকে যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভালবাসা এসে গেলে আর কিসের চেষ্টা। এখন তো আমি তোমাকেই ভালবাসি, তোমাকে নিয়েই আছি, চেষ্টা যা করার ছিল তা আগে আগে হয়ে গেছে।

চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে যদি একটু কল্পনা করেন, একটু ধারণা করার চেষ্টা যদি করেন, খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। খুব নামকরা শ্যামাসঙ্গীতে বলছেন –মজল আমার মন ভ্রমরা। কল্পনা করুন একটা বাগান, বসন্ত ঋতু, চারিদিকে নানা রঙের বাহারী ফুল ফুটে আছে। সামনে একটা ছোট্ট জলাশয়ে পদ্ম ফুটে আছে, পদ্মের গন্ধ নাকে ভেসে আসছে। একটা ভ্রমর উড়ে এসে পদ্মের উপর বসল। আনন্দে মধুপান করছে, কোথাও কোন গোলমাল নেই, চারিদিকে একটা নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। ভ্রমন গুনগুন করে মধুপান করতে করতে কখনো উড়ছে, কখনো ফুলে এসে বসছে। ঈশ্বর যেন সেই বাগান, আপনি সেই ভ্রমর –কখন উড়ছেন, কখন বসছেন, কখন মধুপান করছেন, কখন আবার গুনগুন করে গান করছেন –এটাই ভক্তি। এখানে সংসার বলে কিছু নেই, মন এমন এতে রোমে যায় যে, এটাই সমাধিতে নিয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনার কোন প্রবাহ নেই, মন এক রসে ডুবে গেছে।

কথা বলতে বলতেই ঠাকুর গান শুরু করলেন, খুব নামকরা গান –আমি মুক্তি দিতে কাতর নই শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই। গান সমাপ্ত হলে ঠাকুর আবার কথা বলছেন –**মূলকথা ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি। আর বিবেক–বৈরাগ্য**। কারণ বিবেক-বৈরাগ্য না হলে কোন দিন এই ভক্তি হবে না। এবার কল্পনা করুন –ভ্রমর একটা সংসার পেতে আছে, তার গিন্নি আছে, বাচ্চারা আছে। বাচ্চাগুলো বলছে,

'বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ, আমাদের কাছে থাক না'! গিন্নিও বলছে, 'তোমাকে তো ঘর পরিষ্কার করতে হবে, ঘর ছেড়ে যাচ্ছ কোথায়'? এবার আপনারাই বলুন, এরপর এই ভ্রমর কি আর বাগানে গিয়ে ফুলে বসে মধুপান করতে পারবে? কণ্ঠ দিয়ে গুনগুন করে গান বেরোবে? উদাহরণের জন্য বলা হল। সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ওখানে গিয়ে ডুবে যাওয়া, মত্ত হয়ে যাওয়া; ঠাকুর এই ভক্তির কথা বলছেন।

এখানে কোন ইমোশানালিজম্ নেই; দেখবেন ভক্তিমূলক গান হলে কিছুক্ষণের জন্য মন ঈশ্বরের ভাবে ডুবে যায় –কারণ ওটা ইমোশানালিজম্। কারণ আপনি গানের সুর ও বাণীর সাহায্যে মত্ত হয়ে যাচ্ছেন। আত্মারাম হতে হবে, নারদ ভক্তিসূত্রে বলছেন, *আত্মারামো ভবতি*, নিজের ভিতরে বুঁদ হয়ে যাওয়া, নিজের যে অন্তর্জগৎ, সেটাই ঈশ্বরীয় জগৎ, সেটাই সেই বিরাট ফুলবাগান, যেখানে আপনি ভ্রমর হয়ে গুনগুন করছেন, মধুপান করছেন আর ডুবে যাচ্ছেন।

পাড়াপ্রতিবেশীরা ওখানে বসে আছেন, সেই চৌধুরী মহাশয়ও আছেন, আগে মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন, 'সম্প্রতি তাঁর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে'। পত্নীর শোক আছে, মনটা ছটফট করছে। ঠাকুরের কথাগুলো শুনে যে তিনি ডুবে যাবেন, তা হচ্ছে না; না হওয়ারই কথা। তিনিই প্রশ্ন করছেন।

চৌধুরী – মহাশয়, গুরু না হলে কি হবে না? ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – সচ্চিদানন্দই গুরু।

প্রায়ই আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার গুরু কে ছিলেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ঠাকুর আমার গুরু ছিলেন। ঠাকুর ছাড়া আর কে গুরু হবেন! আমি তখন দেওঘরে ছিলাম। সেই সময় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ সবে জেনারেল সেক্রেটারি থেকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। আমাকে উনি খুব স্নেহ করতেন। অনেকদিন থেকে মহারাজকে জানতাম, উনিও আমাকে জানতেন। বিভিন্ন কারণে আমারও মহারাজকে খুব ভাল লাগত। ওনার সাথে আমার অনেক ঘটনা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল হয়ে আছে। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমার অদ্বৈত আশ্রমে পোস্টিং হয়। মহারাজই তখন সবাইকে পোস্টিং দিতেন। উনি আমাকে ডেকে বললেন, 'ওহে তোমার অদ্বৈত আশ্রম'। বলেই বলছেন, 'আমি এখন অদ্বৈত আশ্রম যাচ্ছি, চল আমার গাড়িতে যাবে'। আমি তখন নূতন ব্রহ্মচারী, মহারাজ তখন একজন সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেনারেল সেক্রেটারি, ওনার গাড়িতে আমি যাব, আমি কল্পনাই করতে পারি না। আমি বললাম, 'মহারাজ, আমি কি করে যাব, এতদিন মঠে ছিলাম সবাইকে প্রণাম করতে হবে, একটু সময় লাগবে'। আমার এখন ভাবলেই অবাক লাগছে, উনি বললেন, 'তুমি তোমার জিনিসপত্র আমার গাড়িতে দিয়ে দাও, পরে তুমি চলে আসবে'। একি কখন কল্পনা করা যায়? কদিন পরেই যিনি জেনারেল সেক্রেটারি হতে যাচ্ছেন, একজন ব্রহ্মচারীকে বলছেন, 'তোমার জিনিসপত্র আমার গাড়িতে দিয়ে দাও, তুমি পরে আসবে'। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনার পা ধরে বললাম, 'মহারাজ, এ-রকম কথা বলবেন না, আমার পাপ লাগবে'।

যাই হোক, আমি দেওঘরে ছিলাম, মহারাজ দেওঘর এসেছেন। বছর দুয়েক আগে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং দীক্ষা দিতে শুরু করেছেন। আশ্রমে বেশ কিছু ভক্তরা এসেছিলেন। আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম –'মহারাজ ইনি আপনার আশ্রিত'। দু-তিনবার এভাবে বলার পর, উনি আমাকে ডেকে কানে ফিসফিস করে বলছেন –'ও-রকমটি বোল না, বলবে ঠাকুরের আশ্রিত'। এনারা যে এত বড় মহাপুরুষ, স্বামী গহনানন্দজী বলুন, স্বামী আত্মস্থানন্দজী বলুন; এই যে চেতনা, সচ্চিদানন্দই গুরু, এটাতে সদা জাগ্রত থাকতেন। বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী স্মরাণানন্দজী, ওনার প্রচুর দীক্ষিত শিষ্য, কিন্তু যদি ওনার পায়ে মাথা রেখে কেউ প্রণাম করেন খুব বিরক্ত হয়ে যান। কারণ মাথা হল গুরুর স্থান, সাক্ষাৎ শিবের স্থান। এই চেতনা এনাদের সব সময় জাগ্রত। সাধারণ কথাবার্তা চলছে, তখনও জাগ্রত, কি জাগ্রত? –সচ্চিদানন্দই গুরু।

শবসাধন করে ইষ্টদর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন –আর বলেন, 'ওই দেখ্ তোর ইষ্ট'। - তারপর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যায়। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন। কবীর দাস, খুব সুন্দর বলছেন –গুরু আর গোবিন্দ দুজনেই দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে প্রণাম করব? বলছেন, গুরু ইষ্টকে দেখিয়ে দেন, সেইজন্য গুরু গ্রেট, গুরু খেই ধরিয়ে দেন। আগেকার দিনে ছিল –ইনি হচ্ছেন গুরু বশিষ্ঠদেবের শিষ্য, তার মানে তিনি ওই পরম্পরার; বিশ্বামিত্রের শিষ্য, মানে ওই পরম্পরায়। আপনি স্বামী গহনানন্দজীর দীক্ষিত, নাকি স্বামী আত্মস্থানন্দজীর দীক্ষিত, তাতে আপনার চরিত্রে কোন তফাৎ পড়বে না। কিন্তু আপনি রামকৃষ্ণ মিশনের না হয়ে রমণ মহর্ষির আশ্রমের দীক্ষিত হলে তফাৎ হয়ে যাবে। আপনার সাধনার তফাৎ হয়ে গেল কিনা। কিন্তু পরম্পরা এক হলে সাধনার তফাৎ হয় না। কিন্তু আরও উপরে যখন যাবেন, তখন বলবেন, সব সাধনাই এক, সব ধর্মের সাধনাতে বলবে –সংসারকে ত্যাগ কর, জগৎকে ছাড়।

অনন্তব্রত করে। কিন্তু পূজা করে –বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তরূপ।

(রামাদি ভক্তদের প্রতি) –যদি বল কোন্ মূর্তির চিন্তা করব; যে-মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জানবে যে, সবাই এক। এটাই হল হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য –*একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সেই এক, তিনিই নানান রূপে আছেন।

কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি –সবাই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য। কোন একটি সাধনা করে যদি পৌঁছে যাওয়া যায়, তখন সমস্ত সিদ্ধি হয়ে যায়। ঠাকুরের তাই হয়েছিল, ঠাকুরের সব রকম সিদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

খুব নামকরা কথা বলছেন –**বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল**। সব কটাতে থাকলে সমস্যা কি আছে! কোন সমস্যা নেই। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা, বা ঠাকুরের ভক্তরা যাঁরা আছেন, সব জায়গায় যান; বৈষ্ণোদেবীও যাচ্ছেন, রামেশ্বরমেও যাচ্ছেন, কেদারবদরীও যাচ্ছেন, সমস্যার কিছু নেই।

একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেষ্টা করবে। ভক্তরা যাঁরা ওখানে ছিলেন, রাম আছেন, কেদার আছেন, চৌধুরী আছেন, এনারা সবাই সংসারে আছেন কিনা, তাই এই কথা বলছেন। সংসারে থেকে কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলো পুরোপুরি যায় না, কমানোর চেষ্টা করতে হয়। কেদার ঠাকুরকে খুব মানতেন, **ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া বলিতেছেন** –

ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। একদিকে ব্রহ্ম, আবার দেবলীলা-মনুষ্যলীলা পর্যন্ত। এটাই আজ রামকৃষ্ণ মিশনের দর্শন। অদ্বৈতীরা এগুলো মানতে চান না; যদিও অদ্বৈতে এর কোন বিরোধিতা নেই। কেন বিরোধিতা নেই, আচার্য শঙ্কর এর পুরো ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকেরা এত শাস্ত্র পড়তেন না, এত দর্শন জানতেন না, নিজের মত ওনারা এগুলো ধরে নিতেন।

কেদার ঠাকুরকে খুব ভালবাসতেন, **কেদার বলেন যে, ঠাকুর মনুষ্যদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন**।

এরপর ঠাকুর নিত্যগোপালের প্রসঙ্গে বলছেন। কথামৃতের পাঠকরা নিত্যগোপালের কথা জানেন। নিত্যগোপাল খুব ভাল সাধক ছিলেন, ঠাকুরও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুর নিত্যগোপালকে বিভিন্ন রকম শিক্ষাদিও দিয়েছিলেন। তবে তিনি ঠিক ঠাকুরের ভাবের লোক নন। যার জন্য দেখা যায়, ঠাকুরের যাঁরা সন্তান শিষ্য, তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করাননি। স্বামীজী, রাখালাদিদের সাথে ঠাকুর যেভাবে মিশতেন এবং এক অপরের সাথে যেভাবে মেলামেশা করাতেন,

নিত্যগোপালের ক্ষেত্রে তিনি সেভাবে করাননি। তবে পরে তিনি খুব ভাল একজন সাধক রূপে পরিচিতি পেয়েছিলেন। সেই নিত্যগোপাল আজ এখানে উপস্থিত। তাঁকে দেখে ঠাকুর ভক্তদের বলছেন –

এর বেশ অবস্থা! নিত্যগোপাল সাধনা করতে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, তার মধ্যে একজন ভক্ত মহিলা ছিলেন। এগুলো আমাদের বেশি আলোচনা করার দরকার নেই। যাই হোক ঠাকুর তাঁকে এবার বলছেন –

(নিত্যগোপালের প্রতি) –তুই সেখানে বেশি যাসনি। –কখন বা একবার গেলি। ভক্ত হলেই বা –মেয়েমানুষ কিনা। তাই সাবধান।

সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এটি সংসারী লোকেদের পক্ষে নয়। সংসারীরা নারীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে। সাধু, সন্ন্যাসীদের নারীসঙ্গ করতে নেই। সাধু সন্ন্যাসী না, যাঁরা সাধক, ঠাকুর সন্ন্যাসী বলতে সাধকদের নিয়ে বলছেন। সবাই জানে মেয়েমানুষদের থেকে সাধুদের অনেক দূরে থাকতে হয়, কথাই আছে –সাধু সাবধান। যাঁরা যোগ সাধনা করেন, ভক্তি নিয়ে থাকেন, তাঁদেরও একই কথা বলা হয়। ভগবান বুদ্ধ যখন বৌদ্ধ ধর্মে নারীর প্রবেশ খুলে দিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এটাই ধর্মের নাশ হওয়ার কারণ হবে। শেষে তাই হল।

আমাদের ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যতিশ্বরানন্দজী মহারাজ, রাজা মহারাজের সন্তান, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, উচ্চমানের পণ্ডিত এবং খুব সম্মান ছিল তাঁর। তাঁর নামকরা বই, Meditation and Spriritual Life, বাংলায় 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন'। খুব ভাল বই। রাজা মহারাজের যাঁরা শিষ্য ছিলেন, সবাই তাঁরা খুব উচ্চমানের ছিলেন। মহারাজের যখন সন্ন্যাসের সময় হয়, উনি রাজা মহারাজকে চিঠি লিখেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে নয় বছর লাগে সন্ন্যাস হতে। এই নয় বছর সবাইকে সাদা কাপড়ে ব্রহ্মচারী বেশে থাকতে হয়। চিঠিতে তিনি লিখছেন, মহারাজ –যদি আমাকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে যেন আমাকে অনুগ্রহ করে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। রাজা মহারাজ খুব মিষ্টি করে লিখছেন যে, 'আমরা কেউ সন্ন্যাসের যোগ্য নই'। খুব দামী কথা। তারপর লিখছেন –'তবে আমি তোমাকে ঠাকুরের হাতে অর্পণ করে দিতে পারি'।

অনেক সময় লোকেরা সন্ন্যাসীদের নিয়ে পাঁচ রকম কথা বলে। আমরা সবাই অপরের থেকে অনেক বেশি আশা করি। আমরা নিজেরা গলদে ভরা, কিন্তু পুলিশের কাছে আশা করি, ওনারা দুর্নীতিগ্রস্থ হবেন না, ঘুষ নেবেন না। আমরা নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্থ, কিন্তু রেলওয়েতে গেলে, কোন অফিসে গেলে মনে করি অফিসের লোকেরা ঘুষ নেবেন না। আমরা সবাই যা খুশি ভোগ করে বেড়াব, আবার এদিকে মনে করছি, সন্ন্যাসীরা যেন ঠিক থাকে। সব সময় আমরা চাই, সবাই ঠিক থাকবে, আমি যা খুশি করে যাব। রাস্তায় বেরিয়ে মনে করি, সবাই যেন ট্রাফিক আইন মেনে চলবে, আমি ট্রাফিক আইন ভাঙতে পারি। এটাই মানুষের স্বভাব। সন্ন্যাসীরাও সমাজ থেকেই আসছেন, যে সমাজে আপনারা আছেন। আমাদের যারা ঘনিষ্ঠ ভাবে জানে না, তারা অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নাদি করে। আমি তাদের সব সময় বলি, এটা মনে রাখবেন যে, আমরা সেই সমাজ থেকেই এসেছি, যে সমাজে আপনি বাস করেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাত-আটজন ব্রহ্মচারী আছেন, যাঁরা নূতন জয়েন করেছেন, এনারা সবাই বিশ্বের বিভিন্ন নামজাদা সব বিশ্বাবিদালয় থেকে পিএইচডি করে এসেছেন। তার মানে দেখুন, এনাদের exposure level কি সাংঘাতিক। সমাজের ইয়ং ছেলেমেয়েরা যে স্বপ্ন দেখে, অক্সফোর্ডে গিয়ে, হার্বার্ডে গিয়ে একটা ডিগ্রি নেবে; ব্রহ্মচারীরা ওইসব ডিগ্রি নিয়ে সেগুলোকে আবার ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের exposure সমাজেরই রয়েছে, তাঁরাও বাসে, ট্রেনে ঘুরেছেন, তাঁরাও বিভিন্ন রকমের লোকের সাথে, ছেলেমেয়ে সবার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। এরপর তাঁদের কাছে

প্রত্যাশা করা যে, তাঁরা কোথাও কোন আকর্ষণে যাবেন না, কোন কিছুতে তাঁদের আকর্ষণ থাকবে না। একবারও কি আপনারা ভেবে দেখেন, এটা যে খুবই অবাস্তবীয়।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি আমাদের সাবধান করে দেন –একবার ওই পথ ছেড়ে দেওয়ার পর আর জগতের দিকে অর্থাৎ সংসারের দিকে যেও না। স্বামী যতিশ্বরানন্দীর কথা আরও উপরে; আপনি সন্ন্যাসের যোগ্য কি না। দুই প্রকারের সন্ন্যাস হয়, যিনি তত্ত্ব জেনে গেছেন –আত্মাই সত্য; তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নেন। এনাদের মন কক্ষণ সংসারের কোন কিছুর দিকে যাবে না। বর্ণনা আছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর জিহ্বাতে চিনি রাখা হয়েছে, তিনি ফুঁ দিয়ে চিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন, মিষ্টত্বের স্বাদে জিহ্বা থেক জল নির্গত হয়ে চিনি ভিজছে না; সাধারণ মানুষের এই জিনিস হবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁরা সন্ন্যাসে আছেন, তাঁদের ছেড়ে দিলে তো হবে না, তাঁরাও তো এই ত্যাগের পথ অবলম্বন করেছেন। সেইজন্য বারবার সাবধান করা হয়। আমাদের মনে হতে পারে, ঠাকুর শুধু মেয়েদের নিয়েই কেন এই রকম বলছেন? এইজন্যই বলছেন, কারণ ঠাকুর এই কথাগুলো উপস্থিত পুরুষ ভক্তদের বলছেন। তেমনি মহিলা ভক্তরা যাঁরা সাধনার জন্য ঠাকুরের কাছে আসতেন, তাঁদেরকে তিনি পুরুষদের থেকে সাবধান করতেন।

যে কোন সম্পর্কে, তা বন্ধুত্বেই হোক, বাবা-মায়ের সম্পর্কেই হোক বাবা-সন্তানের হোক, মা-সন্তানের হোক; একটা নামকরা শব্দ আছে 'দিল্লী কা লাড্ডু', প্রত্যেকটা সম্পর্ক হল 'দিল্লী কা লাড্ডু'। আমরা সন্ন্যাসীরা সবাই এই সমাজ থেকে এসেছি, আমিও সমাজ থেকে এসেছি, আমি সমাজের বিভিন্ন জিনিস দেখেছি। দিল্লী কা লাড্ডু যে খাবে সে পস্তাবে, যে খায়নি সে দুঃখ করবে –আমি পেলাম না। যে পেয়েছে সেও দুঃখ করে বলে –আমি ঠকে গেলাম। যাদের সন্তান হয়নি তারাও চোখের জল ফেলছে, যাদের সন্তান হয়েছে তারাও চোখের জল ফেলছে। যারা বিয়ে করেছে তারাও চোখের জল ফেলছে, যারা বিয়ে করেনি, তারাও চোখের জল ফেলছে। দেখা যায় কিছু কিছু বন্ধু আপনাকে কষ্ট দিয়েছেন। আবার যাদের বন্ধু নেই তারাও দুঃখ করছে বন্ধু নেই বলে। আমাদের মধ্যে যতগুলো সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক অত্যন্ত পাওয়ারফুল সম্পর্ক। লোকেরা মা-ছেলের সম্পর্ক নিয়ে কত কথা বলে। মা-ছেলের সম্পর্ক, ওটা আবার কোন সম্পর্ক নাকি? ওখানে তো পুরোপুরি গিভ এ্যণ্ড টেক সম্পর্ক। ছেলে জানে, এই ভদ্রমহিলার দুধ খেয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আর মা সেখান থেকে নিজের ইমোশানাল সাপোর্ট পায়। মহাভারতে বারবার বলছেন, মা, বাবা, ভাই, বোন, এরা সবাই এমনি তোমার কপালে এসে জুটে গেছে। কিন্তু স্ত্রী বেছে নেওয়া হয়। বলে, মানুষের পাওয়ারফুল বন্ধু কে? অবশ্যই ভার্যা, এখানে তর্কাতর্কি করার কিছু নেই, এটাই সত্য। সবচেয়ে পাওয়ারফুল সম্পর্ক হল নারী-পুরুষের সম্পর্ক। কিন্তু নারী-পুরুষ সম্পর্কটাও দিল্লী কা লাড্ডু। যে খায় সেও পস্তায়, যে খাইনি সেও পস্তায়। সব সম্পর্কেই detachmentটা লাগে। এই নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সেখানেও যদি একটু distance maintain করা হয়, তখন আর কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু মানুষের স্বভাব, বাচ্চা বয়স থেকে যে জিনিসকে দেখে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে একটা যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, সেটা আর রাখতে পারে না, অগত্যা তাকে কষ্ট পেতে হয়।

এই যে ঠাকুর এখানে বলছেন, 'ভক্ত হলেই বা'। খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে একটা ঘটনার কথা প্রচলিত। খ্রীশ্চানদের কনভেন্টস থাকে, যেখানে মহিলারা থাকেন। কোন একজন ফাদারের সেখানকার একজন নানের সাথে মাখামাখি হচ্ছিল। যিনি সুপিরিয়র, ফাদারের কার্য তাঁর নজরে পড়তেই তিনি এটাকে আটকে দিলেন। তখন ফাদার সুপিরিয়রকে বোঝাতে চাইলেন যে, 'ও কিছু না, আমরা দুজন ধর্মেরই কথা আলোচনা করি'। সেখানে সুপিরিয়র খুব দামী একটা কথা বললেন। 'মাটিও ভাল, জলও ভাল, কিন্তু দুটো বেশি মাখামাখি করলে কাদা হয়'। আপনারা যদি এটাকে মনে রাখেন –মাটি নিজের মধ্যে ভাল, জলও নিজের মধ্যে ভাল। ঠিক ভাবে মিশলে চাষবাশও হয়। জল ও মাটিকে মিশিয়ে আবার ইট তৈরী হয়, সেই ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়। আর উল্টোপাল্টা মিশে গেলে কাদা হয়, পাঁক

হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা যে ঠাকুর এখানে বলছেন বলে তা না, যে ধর্মেই যাবেন, দেখবেন সব জায়গাতেই একই কথা বলা হয়েছে।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রতি সন্ন্যাসীদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আধার করে লোকেরা অনেক সময় ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যাঁরাই ধর্মের পথে যান তাঁরা মেয়েদের খারাপ চোখে দেখেন। একেবারেই না, এনারা সমস্ত সম্পর্ককেই খারাপ চোখে দেখেন। কারণ সম্পর্ক মানেই বন্ধন। আর বন্ধন মানেই, আপনি যদি ওটাকে সামলাতে না পারেন, আপনাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। পাহাড়ি রাস্তায় কোন কারণে ঘোড়া যদি বেলাগাম হয়ে যায়, দৌড়ে যে কোথায় যাবে আর আপনাকে কোথায় নিয়ে ফেলে দেবে তার কোন ঠিক নেই, প্রাণ সংশয় হয়ে যাবে। যাঁরা সাধক, যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের একটা যে সাপোর্ট সিস্টেম থাকবে; কল্পনাই করা যায় না। যেমন ধরুন কিছু দিন আগে যে বিবাহ হত, বাবা-মা সেই বিবাহ ঠিক করে দিতেন। আর বিবাহ একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে না, দুটো পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হওয়া। ফলে কোন গোলমাল হলে, সমস্যা হলে দু পক্ষের বড়রা মিলে কথা বলে, আলোচনা করে সমাধান করতেন। দিনে দিনে পরিবারগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাওয়াতে ওই সাপোর্ট সিস্টেমটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরাই আজকাল নিজেদের সমস্যা সামলে নেন। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি কোন সম্পর্কে নামে, সন্ন্যাসীর বাঁচা অসম্ভব। কারণ ওখান থেকে বাঁচার জন্য যে সাহায্য দরকার, ওই সাহায্য করার জন্য তাঁর ধারে-কাছে কেউ থাকে না; কারণ সন্ন্যাসীর কোন সাপোর্ট সিস্টেম নেই।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম'। এখানে শুধু কামিনীকে নিয়ে ইস্যুটা না, ইস্যু অনেক গভীরে যায়। শুধু কামিনী কেন, যদি তাঁকে সাধিকা রূপে দেখা হয়, তাহলেও মেলামেশা চলবে না। কারণ তার সাধনাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা সেই নারী আর পুরুষ। নারী আর পুরুষ হলেই সম্পর্ক হবে, সম্পর্ক হলে কাদা হবে, কিছু করার নেই।

ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, **স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয় –তবুও মেশামেশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হলেও –লোকশিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ-সব করতে হয়**। গীতায় কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন –কর্মের মাধ্যমেই সিদ্ধি হয়। আবার বলছেন –*কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ*, জনকাদি সিদ্ধি পাওয়ার পরেও কর্ম করতেন। ঠিক তেমনি যতক্ষণ জিতেন্দ্রিয় না হচ্ছে ততক্ষণ মেয়েদের থেকে দূরে থাকা দরকার। জিতেন্দ্রিয় হয়ে যাওয়ার পরেও মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে হয়, কারণ জিতেন্দ্রিয়ের আচার ব্যবহার দেখেই অপরে শিক্ষা পাবে।

স্বামীজী অমরনাথ যাত্রায় গেছেন, সঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেক শিষ্য-শিষ্যারা ছিলেন, নিবেদিতাও ছিলেন। স্বামীজীর তাঁবুর পাশাপাশি অন্যান্যদেরও তাঁবু ছিল। একজন সাধু এসে স্বামীজীকে বলেছিলেন –স্বামীজী আমরা জানি আপনি জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু আপনার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের যে তাঁবু হয়েছে এটাকে একটু দূরে করে দিতে বলুন, না হলে সাধারণ মানুষের মনে অন্য রকম ছাপ পড়বে। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু সরিয়ে দিলেন।

সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোক ত্যাগ করতে শিখবে। তা না হলে তারাও পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগদ্গুরু। স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম। মহারাজ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের দীর্ঘদিন সেবা করেছিলেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ তখন স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ স্থাপিত সারগাছি আশ্রমে থাকতেন। দূর দূর থেকে অনেক ভক্ত মহারাজকে দর্শন করতে যেতেন। একবার এক ভক্ত মহারাজকে খুব সুন্দর একটা আসন দিয়েছিলেন। আসনটা ছিল কুশনের তৈরী, উপরটা সিল্ক দিয়ে মোড়া ছিল, দেখতে খুব ঝকমক লাগত। মহারাজের শরীরে অনেক রকম কষ্ট ছিল, ওই ধরণের আসন তাঁর দরকার ছিল। প্রেমেশানন্দজী সুহিতানন্দজীকে আসনটা চেয়ারে উল্টো করে রাখতে বললেন। তার মানে, ওই ঝকমকে জিনিসটা নিচের দিকে চলে যাবে, আর অমসৃন

দিকটা উপরের দিকে চলে আসবে। মহারাজ জানতে চাইলেন, এভাবে রাখার কি কারণ। প্রেমেশানন্দজী বললেন, ‘উল্টো করে রাখলেও কাজ তো একই হবে। কিন্তু সোজা করে রাখলে, যারা দেখা করতে আসবে, তাদের মনে একটা ছাপ পড়বে, আমাদের তো এ-রকম সুন্দর আসন নেই’। এই হল সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ।

এমনিতেই আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত সহজ সরল জীবন। লোকেরা যারা রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই, অনেকেই তারা রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা করে। লোকেরা মনে করে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক টাকা আছে। আমি বলি, আমাদের সমস্ত হিসাবপত্র বাইরে দেওয়া আছে, ওয়েবসাইট খুললেই সব হিসাব পাওয়া যাবে। কয়েক মাস যদি আমাদের ডোনেশান না আসে, সাধুদের খাওয়ার টাকা থাকবে না। আমাদের সেন্টারগুলো চলে, সাধুরা এক পয়সা নেন না, তাঁদের খরচ অত্যন্ত কম বলে এভাবে চলে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়ার আশ্রম কত কম টাকায় চালানো হয়। লোকেরা মনে করে বিদেশ থেকে টাকা আসে, বিদেশ থেকে আসে না; সাধুরা কৃচ্ছ্র সাধন করে চালাচ্ছেন বলে চলছে। নিন্দুকরা নিন্দা করতে ভালবাসে।

আমি একটা খুব সাধারণ কথা বলছি, যদিও কথামৃতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে এক সময় ব্রহ্মচারী ছিলাম। আমাদের শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ ছিলেন সেক্রেটারি। অত্যন্ত মধুর স্বভাবের, মিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আমাদের বাবার মত ছিলেন। তখন ব্রহ্মচারী, প্রচুর কাজ করতাম। দেওঘরের মাটি লাল মাটি, সাদা জামাকাপড় কয়েকদিনের মধ্যে হলুদ হয়ে যেত। জামাকাপড় কাচার পর নীল দেওয়া হত। তখন রানিপল বলে একটা ছিল, এখন নাম জানা নেই, ওটা দিলে কাপড় সাদা হত। ১৯৮২-৮৩ সালের কথা, তখন এক টাকা চল্লিশ পয়সা দিয়ে একটা কৌটা পাওয়া যেত। আমি মহারাজকে গিয়ে বললাম, ‘মহারাজ একটা কৌটা কিনব, একটা কৌটাতে ছয় মাস চলে যায়’। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন জিনিসটা কি। এক টাকা চল্লিশ পয়সা দাম, ছ-মাস চলবে। সব শুনলেন, আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি বললাম, ‘তাহলে মহারাজ একটা কিনে নেব’? মহারাজ বললেন, ‘না না কিনতে হবে না, নীল দিয়েই চালা’। ট্রেনের স্লীপার ক্লাশে আমরা কোন দিন চড়তে পারতাম না। আমাদের নিয়ম ছিল, পারলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাবে, খুব হলে এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে। এ্যক্সপ্রেস ট্রেনে গেলে আবার রেগে যেতেন, টাকা বেশি লেগেছে বলে। আর বাইরের লোকেরা আমাদের নিন্দা করে, আমাদের নাকি অনেক টাকা।

যাঁরা সাধু-সন্ন্যাসীদের একটু কাছাকাছি আসেন, মেলামেশা করেন; তাঁরা ভাল করে জানেন আমাদের কি রকম সাদামাটা জীবন, তখন আমাদের দেখে তাঁদের ভিতরেও একটু ত্যাগের ভাব আসে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দেখি, বেলুড় মঠেও দেখি, আমাদের কাছে বড়লোকেরা আসে না, অত্যন্ত সাধারণ লোকেরা আসেন। তাঁদের যে সামান্য সীমিত মাইনে, যেটা দিয়ে বাড়িতে একটু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতেন, সেটা না করে মঠ-মিশনকে দান করেন, মনে করেন, এই টাকা দিয়ে গরীবের সেবা হবে, সমাজের সেবা হবে আর সাধুদের একটু খাওয়া-পরা চলবে।

ঠাকুর বলছেন, **তা না হলে তারাও পড়ে যাবে**। খ্রীশ্চানরা যখন প্রথম চার্চ আদি করেছিলেন, তাঁরা তখন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পরে পরে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে ভোগের ভাব এসে গেল। এখন চার্চ মানে বিরাট অর্থবান। তাতে সেই ত্যাগ-তপস্যালব্ধ ক্ষমতাটাও চলে গেল। সমাজ যে সম্মান করত, সেটা আর করে না। সমাজ সম্মান করে ত্যাগের। সাধুদের প্রচুর টাকা-পয়সা হলে একটু গ্ল্যামার হয় ঠিকই, কিন্তু সেই সম্মানটা পায় না। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু। সন্ন্যাসী যেমন ধর্মশিক্ষা দেন, তেমনি সমাজে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেটা দেখিয়ে দেন। ত্যাগের আদর্শ সবচেয়ে বড় আদর্শ। শুধু কামিনী না, কাঞ্চন থেকেও দূরে থাকেন, নামযশ থেকে দূরে থাকেন। এটা অনেকবার দেখা গেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে মহারাজদের যখন কোন উপাধি দেওয়া হয়েছে, ওনারা না করে দিয়েছেন।

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাস্টার প্রহ্লাদের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহ্লাদের অহেতুকী ভক্তি –ঠাকুর বলিয়াছেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারির বর্ণনা এখানেই শেষ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় ভক্তসঙ্গে –রাখালের প্রতি গোপালভাব

মাস্টারমশাই ২৫শে ফেব্রুয়ারির পর আবার নিয়ে আসছেন ৯ই মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের বর্ণনায় (পৃঃ ১৪২)। **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি দুই-একটি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন**। ঠাকুর নিজের মত কথা বলে যাচ্ছেন।

অমবস্যার দিন, ঠাকুরের সর্বদাই জগন্মাতার উদ্দীপন হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। মা তাঁর মহামায়ায় মুগ্ধ করে রেখেছে। মানুষের ভিতর দেখ, বদ্ধজীবই বেশি।

বদ্ধজীব মানে, যারা নিজের জীবনটুকু জানে, যাদেরকে নিজের খুব আপনজন মনে করে, তাদের জীবনটুকুই জানে, তার বাইরে আর কিছু জানে না। সমাজে থাকতে হয় বলে, অল্প একটু অপরের জন্য কিছু করে দিল। আপনারা এখানে যে কজন কথামৃতের কথা শুনছেন, ধরেই নিচ্ছি আপনাদের পড়াশোনা আছে। যাঁদের একটু বয়স হয়েছে তাঁরা কথামৃত, গীতা বা নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন আর ইউটিউবের সৌজন্যে ক্লাশগুলো শোনেন। কিন্তু শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য এর বাইরে সবাই আর কি কি পড়েন? খবরের কাগজ পড়েন, সাধারণ মাসিক পত্রিকাগুলো পড়েন আর টিভিতে ভক্তির সিরিয়ালগুলো দেখেন। কিন্তু আমি জ্ঞান চাই, এই ভেবে কজন জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন, ভেবে দেখবেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবারই জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা সামান্য কয়েকটা জিনিসের মধ্যে সীমিত, অবশ্য সবাই না। এমনকি কলেজের প্রফেসাররা বছরের পর বছর একই নোটস দিয়ে যাচ্ছেন। নূতন করে যে নোটস তৈরী করবেন, সেটাও করতে চান না। এনারাই হলেন বদ্ধজীব। নিজের অত্যন্ত ছোট্ট একটু জগৎ, সেখানে একটু জ্ঞান আছে, একটু সমৃদ্ধি আছে। টাকা-পয়সা একটু যে বেশি উপার্জন করবেন, সেই চেষ্টাটুকুও তাঁদের নেই।

কলকাতাতে কণ্ডাক্টেড ট্যুরস হয়, অমুক ট্রাভেল, তমুক ট্রাভেল। ওই একটা ছোট্ট গ্রুপ, ওই কোকুনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করে কাশ্মীর পর্যন্ত ঘুরে আসবে। একটু যে ওর বাইরে গিয়ে দেখবে, ওখানকার লোকেদের জীবনযাত্রা কেমন, ওদের খাওয়া-দাওয়া কেমন, কোন চেষ্টা নেই। আমি একবার ঘুরতে গিয়েছিলাম। ওখানকার রিসর্টের যিনি দেখাশোনা করেন, বলছিলেন, 'এখানে একটা নির্দিষ্ট সিজিনে অনেক বাঙালি আসেন। ওনাদের জন্য আমাদের কোন ঝামেলা পোয়াতে হয় না। ওনারা এসে নিজেদের মত ভাত, ডিমের কারি, আলুভাজি বানিয়ে নেন, তাতেই হয়ে যায়'। ওই সীমিত একটা গণ্ডী, ওর বাইরে যাবেন না, আর ওর মধ্যেই ভালবাসা চাইছে, না পেলে কষ্ট পাচ্ছে; আবার ওখানেই ঘুরেফিরে যাবে।

এত দুঃখ-কষ্ট পায়, তবু সেই 'কামিনী-কাঞ্চনে' আসক্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না; আবার ভুলে যায়। আগে আগে আমরা এর আলোচনা করেছি।

দেখ, তাঁকে কেউ খোঁজে না। আনারসগাছের ফল ছেড়ে লোকে তার পাতা খায়। তখন এক ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন –

ভক্ত –আজ্ঞা, সংসারে তিনি কেন রেখে দেন?

আগেও এর উপর অনেকবার আলোচনা হয়েছে। ভগবান কেন এই জগৎ করেছেন কেউ জানে না। বেদের নামকরা নাসদীয় সূক্তও একই কথা বলছেন; এই জগৎ, এই সংসার কেন তিনি করেছেন কেউ জানে না। তবে এটা জানা আছে যে, আমি আজকে যেখানে আছি, এটা কি; আর এখান থেকে কোন দিকে যেতে পারি। যে কোন রাস্তায় আমরা সামনের দিকেও যেতে পারি, পিছনের দিকেও যেতে পারি। চাইলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, আবার মুখ না ফিরিয়ে পিছনের দিকেও হাঁটতে পারি বা মুখ ঘুরিয়ে চলতে পারি। জগতের যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সবাইকে কাজ করতেই হবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও কাজ। আমরা যে আলোচনা করে যাচ্ছি, এটাও কাজ। আপনারা যাঁরা শুনছেন, শোনাটাও কাজ।

একটা খুব সহজ উপমা আমি প্রায়ই দিই। আমরা যখন আট কি নয় বছরের ছিলাম, বিকালের দিকে খেলতে যেতাম। আট-দশজন বন্ধু মিলে যে কোন একটা খেলা খেলতাম। কবাডি থেকে শুরু করে ফুটবল ইত্যাদি যখন যেটা পারতাম খেলতাম। গলায় গলায় বন্ধুরা মিলে সব খেলতে নামলাম। খেলতে খেলতে ঝগড়া হয়ে গেল, ঝগড়া হতে হতে হাতাহাতি। বড়রা সবাই দেখতেন, কিছু বলতেন না। যখন দেখতেন একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, তখন নেমে ছাড়িয়ে দিতেন। ছাড়িয়ে দেওয়ার পরেও ঝগড়া থামত না, তখন মুখে –তোকে দেখে নেব; আয় তবে দেখেই নিই কত তুই দেখে নিবি।

কাজ করতে করতে আমাদের অবস্থা বাচ্চাদের খেলার মত হয়ে যায়। খেলা করতে গিয়ে নিজের দলের প্রতি ভালবাসা, অপরের দলের প্রতি একটা বিদ্বেষ, সেখান থেকে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। এতক্ষণ খেলা বলছিলাম, সেখান থেকে এবার অন্য একটা উপমা নিচ্ছি –সাপ খেলা। সাপ খেলায় বিষাক্ত সাপ নিয়েও খেলা করছেন, কখন যে ছোবল দেবে জানা নেই। আমি একজনকে জানতাম, ওনার হঠাৎ সাপ খুব ভাল লাগতে শুরু হল। উনি ঘরে সাপ রাখতেন, সাপকে খাওয়াতেন। সব রকম সাপ রাখতেন, সব কটাই মারাত্মক বিষাক্ত। একদিন কি করে একটা সাপ এমন ছোবল মারল যে, প্রাণ যায় যায়। বহু কষ্টে বেঁচে গেলেন। তারপর থেকে তিনি চিরদিনের মত সাপ রাখা বন্ধ করে দিলেন।

এই যে বন্ধ করলেন, খুব ইন্টারেস্টিং। আমি ওই ঘটনাটা ভুলতে পারিনি, কিভাবে তিনি সাপ রাখতে শুরু করলেন। অনেকেই তাঁকে সাপ রাখতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তাও রাখতেন, আর খুব সাবধানেই রাখতেন। কিন্তু একদিন ছোবল মেরেই দিল। আমরা যে কাজগুলো করি, কাজের মধ্যেই আমাদের দুষমণি আছে, ভালবাসা আছে –সবটাই সাপ। কখন যে সে ছোবল মারবে, তার কোন ঠিক নেই। যখন ছোবল মারে, তখন দিব্যি খাই –আর না। ওই ছোবল খাওয়ার পর আমরা যখন মৃত্যুমুখী হয়ে যাই, তখনও বলি –আর না। ঠাকুর আগে যে প্রসববেদনার কথা বলেছিলেন –সেখানে বলছেন, প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, আর স্বামীর কাছে যাব না, কিন্তু বলার পর আবারও যায়, কারণ ওটা মৃত্যুমুখী ছিল না। কিন্তু কখনো যদি মৃত্যুমুখী হয়ে যায়, তখন সত্যি সত্যি সরে আসে, এ-রকমও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ – সংসার কর্মক্ষেত্র, কর্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। যে কর্মই আমরা করি না কেন, কর্ম যদি আমাদের ঈশ্বরের দিকে না নিয়ে যায়, তাহলে ওই কর্মই বন্ধনের কারণ হবে। ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হলে, প্রথমেই দরকার একটা detachment। এই Detachment যদি না থাকে কোন কিছুই আপনাকে ঈশ্বরের দিকে কক্ষণ নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা সব সময় দাঁড়িপাল্লা নিয়ে হিসাব করতে থাকি, এটাতে আমি কি পেলাম, ওটাতে আমি কি পাব। আমাকে মাঝে মাঝে অনেকে লিখে পাঠান, মহারাজ আপনার কথাতে খুব উপকার পেলাম। লোকেরা এত হিসেবী কল্পনাই করতে পারি না। সবাই দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসে আছে –সমর্পণানন্দের ক্লাশ করে আমার এতটুকু লাভ হল, অমুক সাধুর সঙ্গ করে আমার এতটুকু লাভ হল। আমাদের কথাগুলোকে নিয়ে দাঁড়িপাল্লাতে দিয়ে মাপছে;

মেপে দেখল –আপনার কথাগুলো শুনে বেশ ভাল লাগল। আপনার কথাগুলো শুনে আমার বিশেষ উপকার হয়েছে –মাপছে। বুঝতে পারছি, সব দু-পয়সার মানুষ, ভিতরে কিচ্ছু নেই, সব কিছুতে লাভক্ষতি দেখছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্টুডেন্ট, ওর ভিতরে কোথাও একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল, খুব সংশয়ে ছিল। আমাদের কথা শুনে সে ওটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, পরে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। আমাকে বলে গেল, আমি দ্বিতীয়বার আপনার কাছে আসব না। ছেলেটি স্বীকার করল, ও বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু একটা কথা শুনে, ওর একটা বিরাট সমস্যা ছিল, কি সমস্যা সেটা আমাকে বলল না, শুধু থ্যাঙ্ক ইউ, সো মাচ্ বলে বেরিয়ে গেল। বলল, 'ভাগ্যিস আপনার কথা বাই চান্স শুনেছিলাম'। বাকিরা তো সব সব সময় হিসাব করে যাচ্ছে। ঠাকুরের কথা শুনতে যাচ্ছে, সেখানেও আসক্তি।

বাচ্চা বয়সে বন্ধুদের সাথে আমরা কত মারামারি করতাম, এখন বয়স হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারছি, ওগুলো আসলে ছিল ছেলেখেলা। সাপ ছোবল মারার পর চেতনা এলো –সাপ নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। এই জিনিসগুলোকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে, আপনারা অনেক হয়ত বুঝতেও পেরেছেন। যারা ভুল কাজ করছে, নারীদের যারা অসম্মান করছে, এই নারীদের অসম্মান করতে করতে পরের ধাপে শীলহানি করার দিকে হাত বাড়াবে। সেখান থেকে আরও এগোবে। প্রথমের দিকে সে হয়ত বেঁচে যাবে, তারপরে তাকে কেউ অপমানিত করবে, লাঞ্ছিত করবে। তাতে যদি চেতনা এসে যায়, তার মানে তার জ্ঞান হয়ে গেল। ঠাকুর যেটা বলছেন –তবে জ্ঞান হয়; তার মানে এই চেতনা এসে যায় – এটা করতে নেই। তাতেও যদি না হয়, এই যে বলা হয় –কেউ শুনে শেখে, কেউ দেখে শেখে, বাকিরা ঠেকে শেখে। এটাতে যদি না হয়, শেষ এমন কিছু হবে, যেখানে বিরাট একটা ঝামেলা পাকিয়ে অশান্তির ঝড় নিয়ে আসবে। হয়ত পুলিশ কেস হয়ে গেল, হয়ত বা জেল হয়ে গেল; তখন বলে –আর না। চেতনা যদি একবার হয়ে যায়, তখন সে ওই জিনিসটা থেকে চিরদিনের মত সরে আসবে।

অনেক আগেকার একটা ঘটনা। একজন খ্রীশ্চান ফাদার ছিলেন, তিনি খুব সুন্দর কবিতা লিখতেন। ওনার কবিতাগুলোও খুব সুন্দর ছিল। তার মধ্যে কিছু কিছু কবিতা ছাপা হয়ে গিয়েছিল। অনেক লেখার পর তাঁর হঠাৎ মনে হল যে –আমার এই লেখালেখি আমাকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হতেই উনি ওনার যাবতীয় যত লেখা ছিল, সব আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। ওনার সাহিত্যচর্চার জীবন ওখানেই ইতি হয়ে গেল। চেতনা এসে গেল –আমার সমস্ত কিছু ঈশ্বরের জন্য। কাজ করতে করতে তবে চেতনা হয়।

গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম করো, আর এই সব কর্ম করো না। কর্ম কি, অকর্ম কি, এগুলো আমরা বেদ থেকে পাই। বেদ থেকে এগুলো আবার বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এসেছে, ধর্মশাস্ত্র থেকে আবার গুরু আমাদের বলে দিয়েছেন। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম খুব খোলাখুলি ধর্ম, অন্যান্য ধর্মে সব কিছু একেবারে বেঁধে দেওয়া আছে –এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে। হিন্দুদের এভাবে কোন কিছু ফিক্সড থাকে না, হিন্দুদের পুরোটাই হল –গুরু যেমন বলে দিয়েছেন।

আবার তিনি নিষ্কামকর্মের উপদেশ দেন। গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ*, কবি, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, তাঁরাও মোহিত হয়ে যান। *তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ*, নিষ্কামকর্ম করলে তুমি অশুভ থেকে মুক্তি পাবে। গীতাতে এই ভাবটা ঘুরেঘুরে আসে। আবার যেমন অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলছেন –*যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, যাদের অহংকার ভাব, যাদের 'আমি কর্তা' এই অভিমান নেই এবং যাদের বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, এটাই নিষ্কামকর্ম। মানুষ প্রথমে আসক্তি বশতঃ কর্ম করে। আপনার মনে একটা দুর্বলতা আছে, সেটার জন্য কর্ম করছেন। যেমন যার টাকা-পয়সার দরকার, তার মানে অর্থের প্রতি দুর্বলতা আছে,

সেইজন্যই সে চাকরি করছে। ওই দুর্বলতাটা আস্তে আস্তে চলে যায়, তখন ওটাই কর্তব্যবোধ হয়ে মাথায় চলে আসে। আসলে খুব একটা তফাৎ নেই, দুর্বলতা হল সকাম কর্ম, কর্তব্যটা হল নিষ্কাম কর্ম। যদি কাউকে বলতে দেখেন –যদি আমার দুর্বলতাটা চলে যায়, আমি খুব খুশি হব; বুঝবেন ওর আর উপায় নেই, ফেঁসে গেছে।

আমাদের এক মহারাজ খুব মিষ্টি করে বলতেন, লোকেরা কত আশা করে, কত মোহ পড়ে বিবাহ করে। ভাবে সুখে থাকব। কিছু দিন পর দেখে তার ভোগ শেষ, শুধু যোগ রয়েছে। এক লাখ টাকা মাইনে পায়, কিন্তু সে নিজের উপর কটা টাকা খরচ করে? নিজের খাওয়া-পরার উপর কটা টাকা খরচ হয়? উপার্জিত সমস্ত টাকা যাচ্ছে তার স্ত্রী, তার সন্তান, তাদের ভবিষ্যত, তাদের নিরাপত্তা, তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য এগুলোতে। ভোগ করার জন্য সংসারে নেমেছিল, এখন সে ছেড়ে দিতে চাইলেও পারবে না, বাড়ির লোকেরাই তাকে ছাড়তে দেবে না। গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনবে –ছেলেমেয়েদের কে দেখবে? সেখান থেকে যদি সন্ন্যাসের দিকে চলে যায়, তখন আর এগুলোর কোনটাই থাকে না– মুক্তি, ঈশ্বরের ধ্যান তবেই হয়, এ-ছাড়া হয় না।

কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়। আমাদের ভিতরে কত ময়লা, আমরা নিজেরাই জানিনা। বেশ কিছু বছর আগে দিল্লির একটা টিভি চ্যানেল থেকে আমার ইন্টাভিউ নিয়েছিল। তিনি জানেন আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, তিনি জানেন আমার কয়েকটা বই ছাপা হয়েছে। আমাকে উনি জিজ্ঞেস করলেন –'এই যে এত বছর আপনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, এতদিনে আপনার কি achievement, আপনার উপলব্ধি কি'? আমি বললাম, 'আমার উপলব্ধি কিছু না, আমি কেবল এটা বলতে পারি যে, এতদিনে সন্ন্যাসজীবনে আমার একটু বিশ্বাস জেগেছে, ঠাকুরের প্রতি একটু বিশ্বাস জেগেছে; আর মনে এখনও অনেক অঙ্কট-বঙ্কট, তার সাথে নূতন অঙ্কট-বঙ্কট জুটেছে, কিন্তু অনেকগুলো পরিষ্কার হয়েছে'। আমার কথা শুনে উনি খুব আশ্চর্য হয়ে বলছেন –'এতদিনে আপনার এই এতটুকু'? আমি তখন বললাম, 'দেখুন, অন্য সন্ন্যাসীরা যাঁরা আছেন তাঁদের শুভকর্ম আছে, তাঁদের উপলব্ধি আমার থেকে নিশ্চয় অনেক বেশি। এতে আমার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কোনটাই নেই। আপনি আমাকে আমার উপলব্ধির কথা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি আমার উপলব্ধি বলছি'। রামকৃষ্ণ মিশনে আসার পর আমাকে বিভিন্ন সেন্টারে যা যা কাজ দেওয়া হল, সেই কাজগুলো করতে গিয়ে পুরো আসক্ত হয়েই কাজ করেছি, কিন্তু মনের ময়লাগুলো কেটে গেছে। আজকে শাস্ত্র পড়ে আমি বুঝতে পারছি, কাজ করছি বলে আমার মনের ময়লাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে। সেখান থেকে আমার এই বোধটা আসছে, সত্যিই আমার মুক্তি চাই। কোন ঝামেলা থেকে মুক্তি চাইছি না, আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর জীবনে আর কিসের ঝামেলা।

এই যে নিষ্ঠা –এটা মুখের কথা নয়। এটা তখনই হয়, যখন প্রচুর কাজ করা হয়। এই যে ঠাকুর বলছেন –কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কাটে। তাহলে যাঁরা সন্ন্যাসী না, তাঁদের কি হবে? আগে সন্ন্যাসী কজন হতেন? ঠাকুর, স্বামীজী আসার পর সন্ন্যাসীদের একটা গ্ল্যামার এনে দিয়েছেন। এখনও লোকেরা মনে করে, সন্ন্যাসী মানে জীবনে কিছু পারেনি, সন্ন্যাসী মানে একটা মুর্খ, সব জায়গায় বিফল হয়ে এখানে এসেছে, কিছু জানে না –এই ধারণা মানুষের মনে এখনও রয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনার যে ভাব ছিল, এই ভাব চিরদিনই ছিল, সংসারে থেকে সাধনা। সংসারে থেকে সাধনা মানে, যতটা অনাসক্ত হওয়া যায়, যা কিছু কর্ম করবে, প্রথমে তো ভোগের জন্য করেছিলে, সেখান থেকে কর্তব্য রূপ, সেখান থেকে শেষে – হে ঠাকুর আমাকে মুক্তি দাও। এই শরীর চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, তার বাইরে যেন আমাকে আর জড়াতে না হয়। আর যতটুকু ফাঁকা সময় পাওয়া যাবে, সেটুকু সময় ঈশ্বর আরাধণায় যেন নিজেকে লাগিয়ে রাখতে পারি। যখন কাজ থাকবে তখন এক হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরে রাখব, আর-এক হাত দিয়ে সংসার করতে হবে; যখন কাজ

থাকবে না, তখন দুই হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরে রাখা। মনের ময়লা যদি পরিষ্কার না হয়ে থাকে, তাহলে এটা হবে না।

আপনারা একবার দেখুন, আপনারা এতজন কথামৃতের ক্লাশ শুনছেন; আপনার পাড়ায় এত লোক আছে, আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা বলবেন, আপনার মাথাটা গেছে। কেন বলবেন? কারণ ওনাদের মনটা এখনও পুরো কলকাতা কর্পোরেশনের ধাপার মাঠ। বাইপাসের ধারে দেখতাম ধাপা, বিশাল ডাম্পিং গ্রাউণ্ড, কলকাতার সব আবর্জনা ফেলা হয়। আমাদের মন এই রকম একটা আবর্জনার ঢিপি। কত জন্ম যে পরিষ্কার করতে লাগবে, একমাত্র ভগবানই জানেন। ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য কোন যে একটা সহজ পথ আছে, তাও নেই। এই শাস্ত্র শুনতে শুনতে, নিষ্কাম ভাবে কাজ করতে করতে, নিষ্কাম ভাবে মানে –আমার এটা দায়ীত্ব তাই করছি, এখানে আমার পাওয়ার কিছু নেই, ভোগের কিছু নেই।

স্কুল-কলেজে আমরা যখন পড়তাম, তখন পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়তাম –এটাকে বলে সকাম কর্ম। এখন যাই পড়ি, জ্ঞান অর্জনের জন্যই পড়ি –এটা সকাম কর্ম নয়। ফলে কি হয়, জ্ঞান আহরণটা ভাল হয়। সংসার হল ডাক্তারখানা, সংসারে কাজ করতে করতে ভবব্যাধি সারে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়িতে সবাই বৃদ্ধ। বন্ধুরও বয়স হয়েছে, আর সবাই অসুস্থ। রোজই কাউকে না কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সারাটা দিন ওনার চলে যায় শুধু বাড়ির চার-পাঁচজন বয়স্ক লোকদের সামলাতে। তিনি মন খারাপ করেন না, তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি নিজেকে নিয়েই ভাবি কি এমন কর্ম করেছিলাম, যার জন্য আজ এতজন বয়স্কদের সামলাতে সামলাতে আমার সমস্ত শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু যে বই পড়ব, হয় না; একটু যে লেকচার শুনব, সময় পাই না; একটু যে জপধ্যান করব, সেটাও হয় না। লোকেদের চিকিৎসা করে যতটুকু উপার্জন করি তাতে বাড়ির খরচ চলে, বাকি সময়টুকু বয়স্ক লোকগুলির দেখাশোনা করতেই চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও বয়স হয়ে যাচ্ছে'। ওনার কথা শুনে ভাবি, জগতের সত্যিই কি অবস্থা। এই করতে করতে ভিতর থেকে বৈরাগ্য আসবে, তারপর কয়েকটা জন্ম পরে একটু সুযোগ সুবিধা হবে।

কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে, তবে ছাড়বেন। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়বেন। এটা আমি আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি। একটা বয়সের পরে, কিংবা রোগ হলে, বা অনেক মার খাওয়ার পরে লোকে বলে –সত্যি বলছি মহারাজ, আমার আর এগুলো লাগবে না। আরে, আপনি কি করে বলবেন যে আপনার লাগবে না। গীতার কথা –*রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততক্ষণ এই বিষয়ের রসগুলো যায় না। সবটাই বীজাকারে থাকে, সুযোগ পাওয়া মাত্র আবার চলে আসবে, আসবেই, আসতে বাধ্য। আপনি এখন যে বলছেন, আপনার মনে এই দুর্বলতা নেই, এটা আপনি ভাবছেন। একটু যদি আপনার শরীরটাকে তরতাজা করে দেওয়া হয়, আপনার যৌবন যদি ফিরিয়া আনা যায়; সঙ্গে সঙ্গে আবার আপনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। যিনি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, ঠাকুরকে যে বয়সেই দিয়ে দিন, উনি অন্যথা করবেন না। চৈতন্য মহাপ্রভুকে যে শরীরই দিয়ে দিন, উনি ওই রকমই থাকবেন। ভগবান বুদ্ধ জ্ঞানের পরে ওনাকে যে শরীরই দিয়ে দিন, উনি ওই রকমই থাকবেন, পাল্টাবেন না। যাঁরা এই তথাকথিত বৈরাগ্যের কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, তাঁদের পরিস্থিতি খারাপ, আর তাদের স্বাস্থ্য প্রতিকুল বলে বৈরাগ্য আসছে। অনুকূল পরিস্থিতি, সুস্বাস্থ্য দিয়ে দেখুন, বৈরাগ্য কোথায় থাকে। ভগবানের কাছে এই বৈরাগ্য কোন বৈরাগ্যই না।

হাসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার জো নাই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।

কথাটা হল –কর্ম ও কর্মযোগ; প্রথমে কর্মফল ত্যাগ হয়, তারপরে হয় কর্মত্যাগ; কিন্তু কাজ সবাইকেই করতে হয়ে। এক-একজন সন্ন্যাসী যে কি হারে কাজ করেন, বাইরের লোক বুঝতেই পারবে

না। আমি তো ভিতরে আছি, আমি জানি কি হারে সন্ন্যাসীদের কাজ করতে হয়। যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের চোখমুখটাই অন্য রকম হয়ে যায়। কাজকর্ম না করলে সময় ফাঁকা হয়ে যায়। মুখে বলা সহজ যে, ফাঁকা সময় পেলে খুব জপধ্যান করব –ও হয় না। শুদ্ধ মন না হলে জপধ্যান হবে না। ঠাকুর আবার বলছেন, কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কাটে। খুব দামী কথা। এর উপর আগে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি।

এই যে ঠাকুর বলছেন –রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার ছাড়বে না; আমাদের জীবনে যে এত দুঃখ-কষ্ট, বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, আমাদের ভিতরে কত রকম রোগের কসুর আছে, আমরা নিজেরাই ধরতে পারিনা। সংসারে থেকে মানুষ কত রকমের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়, তখন সে বলে –আমার আর লাগবে না।

এরপর মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –**ঠাকুর আজকাল যশোদার ন্যায় বাৎসল্য রসে সর্বদা আপ্লুত হইয়া থাকেন, তাই রাখলকে কাছে সঙ্গে রাখিয়াছেন**। রাজা মহারাজকে ঠাকুর সন্তানের মত দেখতেন, আমরাও ওই ভাবেই দেখি যে, রাখাল ঠাকুরের সন্তান, তিনি ঠাকুরের মানসপুত্র। রাজা মহারাজের বয়স তখন খুব কম, ঠাকুরকে খুব ভালবাসতেন। আপনারা যাঁরা কথামৃতের ক্লাশ শুনছেন, ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই ভক্ত। ভক্ত মানেই টিয়াপাখির মত মেনে নিই ঠাকুর অবতার, আমরা মেনে নিই ঠাকুর ভগবান। ভগবান কি, অবতার কি, আমরা এই নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছি, আপনারাও বহুবার শুনেছেন; কিন্তু এর কোন দাম নাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত ধ্যানের গভীরে গিয়ে ওই ভাবে অনেকক্ষণ না থাকেন, ততক্ষণ এই জিনিসগুলো মনে কোন ছাপ ফেলবে না, বোধ তো অনেক দূরের কথা। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দিলে এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে থাকতেন। সঙ্গে রাধু, মাকু, নলিনী সবাইকে নিয়ে মা থাকতেন। সারাদিন খোটাখুটি লেগেই আছে। নারী-পুরুষ সব ভক্তরা মায়ের কাছে আসছেন, সবাই বলেন যে, মা কত আপন। এখনও ভক্তরা জয়ারমবাটীতে এসে বলেন, মা কত আপন। স্বামী সারদানন্দজী, যিনি মায়ের ভারি, তিনি দিনে একবার করে মাকে প্রণাম করতে আসতেন। মহারাজ প্রণাম করতে আসছেন, খবর দেওয়া হলেই মা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লম্বা অবগুণ্ঠনে আবৃত করে রাখতেন। এই দৃশ্যের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –থপথপ করে সিঁড়ি দিয়ে মহারাজ মাকে প্রণাম করতে যখন উঠতেন, তখন তাঁর পুরো শরীরটা কাঁপত। সেই সময় সবাইকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হত। মায়ের সামনে এসে মহারাজ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। শরীর কাঁপছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, গলা কাঁপাতে কাঁপাতে কোন রকমে জিজ্ঞেস করছেন –মা ভাল আছেন। মা বলতেন -হ্যাঁ বাবা ভাল আছি। রোজ একই ভাবে আসা, একই প্রশ্ন, একই উত্তর। শরৎ মহারাজ আবার কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসতেন।

এবার আপনি একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন তো। বেলুড় মঠের গর্ভগৃহে অবস্থিত ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তখন কি আপনার এই ভাব হয়? বেলুড় মঠের যে কোন শাখা কেন্দ্রের মন্দিরে বা ঠাকুরঘরে ঠাকুরের বিগ্রহ বা পটের সামনে দাঁড়ালে বা কোন সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়ালে আপনার কি এই ভাব হয়? হয় না। কেন হয় না? আমাদের প্রস্তুতি নেই বলে হয় না। যদি আপনার ভিতর প্রস্তুতি থাকত, তাহলে এটাই হত।

ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর অবতার, এটা বোঝার জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে। যখন এই প্রস্তুতি হয়, তখন একটু বুঝবেন জিনিসটা কি, তখন বোঝা যায় কিভাবে ঠাকুর নিজে যিনি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি কিভাবে এই সংসারে মানুষ রূপ ধারণ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করে যাচ্ছেন, আর তাঁর পক্ষে কত কঠিন এইভাবে সংসারে মনটাকে নামিয়ে রাখা। অতি সাধারণ একটা ঘটনা –তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, একদিন একজন ঠাকুরকে বললেন –তুমি এই রাখাল, নরেনের মত কায়েতের ছেলেগুলোর উপর এত মন দাও কেন? 'ওরে আমি ওদের সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখ, আমি যদি

ওদের থেকে মন তুলে নিই, তাহলে তো এই সংসারেই আমার মন থাকবে না। এই দেখ আমি ওদের থেকে মন তুলে নিচ্ছি'।

মন্দিরের চাতালে বসে এই কথা হচ্ছিল। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর সমাধিস্থ। চুল, রোম সব শজারুর কাঁটার মতা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কথামৃতে বর্ণনাগুলো দেখবেন –যখন তখন সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, সমাধি থেকে নামার সময় জল খাবো, তামাক খাবো; এই ধরণের কথাগুলো বলছেন মনটাকে নামানোর জন্য। মনটাকে বাহ্য জগতে নামিয়ে আনার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায়ে নামিয়ে আনতেন। এই ভাবগুলো মানুষের মধ্যেও হয়। ঠাকুর কখন নিজের চেষ্টাতে সমাধিতে যেতেন না, কিছুটা নিজের মন থেকে, কিছুটা মায়ের ইচ্ছা। যেখানে মায়ের বর্ণনা আছে, শ্রীশ্রীচণ্ডী বা অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যায়, সেখানে বলছেন – মা জগৎকে পোষণ করছেন। ঈশ্বর যেন মা, ঠাকুর এইভাবে রাখালকেও দেখছেন।

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এটা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের বর্ণনা। বলছেন, **যেমন মার কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর ভর দিয়া বসিতেন। যেন মাই খাচ্ছেন**। রাসলীলার বর্ণনা যেমন সবাই ধারণা করতে পারে না, ঠিক তেমন ঠাকুরের এই ভাবগুলিকে ধারণা করা খুব কঠিন। মন যদি খুব শুদ্ধ পবিত্র না থাকে, সাধনা করে মন যদি একটু উপরে না গিয়ে থাকে, তাহলে এই জিনিসগুলো বোঝা যায় না।

ঠাকুর এইভাবে বসিয়া আছেন, এমন একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, বান আসিতেছে। বান দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সবাই দৌড়ালেন, ঠাকুরও দৌড়াচ্ছেন। অন্য এক জায়গায় বর্ণনা আছে, ঠাকুর কাপড় ছেড়েই দৌড়েছেন। যারা কাপড় সামলাতে ব্যস্ত ছিল, তাদের আর বান দেখা হল না। আগেকার দিনে গঙ্গায় জল কম থাকত। ফরাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর গঙ্গার জল অনেকটা বেড়েছে। সেইজন্য আগেকার দিনে বান খুব জোরাল হত। ঠাকুর তাঁদের বলছেন –বান কি তোমার কাপড় পরার অপেক্ষায় থাকবে? ভগবান যখন মানুষ হয়ে লীলা করেন, তখন কি রকম সব মানুষের মত।

বেলুড় মঠের অনেক আগেকার গল্প –একজন নূতন ব্রহ্মচারী এসেছেন, সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করতে এসেছেন। সঙ্ঘে অনেক রকম লোকই আসে; তবে ইদানিং ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবধারার প্রচার, প্রসার হওয়াতে লোকেরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে একটু জানে। আগেকার দিনে লোকেরা মনে করত, সাধুদের যেমন আখড়া হয়, বেলুড় মঠও সেই রকম একটা আখড়া। তখন মঠে পূজ্যপাদ স্বামী ভরত মহারাজ ছিলেন, খুব নামকরা মহারাজ। ওনার কাছে গিয়ে নূতন ব্রহ্মচারিটি বলছেন –'মহাশয়, আপনারা কি ধরণের সব সাধু! রাত্রে দেখলাম সব সাধুরা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন'। ব্রহ্মচারিটির ধারণা, সাধু মানে সারা রাত বসে জপধ্যান করবে। বিচিত্র বিচিত্র সব লোকেদের ধারণা। প্রথম প্রথম বালি মিউনিসিপ্যালিটিতে বেলুড় মঠকে প্রচুর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটি সাধুদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে –সাধুরা কি চা খায়? সাধুরা কি খাটে শোয়? আশ্চর্য, সাধুরা চা খাবে না, সাধুরা খাটে শোবে না, এটা করবে না, সেটা করবে না; আরও কত কি। একেবারেই তা নয়, সাধুরা কিছু কিছু জিনিস থেকে দূরে থাকেন, আর কোন কোন জিনিসে একটু বেশি মন দেন।

ঠাকুরের মনে প্রশ্ন উঠেছে; **শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) – আচ্ছা, বান কি রকম করে হয়?**

মাস্টার মাটিতে আঁক কাটিয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, ভাটা; পূর্ণিমা, অমাবস্যা, গ্রহণ ইত্যাদি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –ওই যা! বুঝতে পারছি না; মাথা ঘুরে আসছে। টনটন করছে। আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন করে জানলে? শ্রীশ্রীমায়েরও খুব আশ্চর্য লাগত, এ-রকম কি করে হয়!

দেখ, আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম, কিন্তু শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত। গণনা অঙ্ক পারলাম না। আগেকার দিনে অঙ্ক শেখাবার জন্য ছড়া আদি করে করে শেখানো হত। এখন শিক্ষা দেওয়ার পুরো সিস্টেমটাই পাল্টে গেছে। তাই বলে এগুলোকে টেনে হিঁচড়ে ইমোশানাল কোন কিছু বার করার কোন দরকার নেই। আমি এক-আধবার অনেক জায়গায় দেখেছি এগুলোকে ইমোশানাল বানিয়ে দিতে –ঠাকুর যোগ শিখলেন, ঠাকুর বিয়োগ শিখতে পারলেন না, ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ কথা, এই কথাগুলো টেনে ওর থেকে ইমোশানাল জিনিস বানাবার কোন দরকার পড়ে না।

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙানো যশোদার ছবি দেখিয়া বলিতেছেন, 'ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে'। মালিনী থেকে মেলেনী, যাঁরা ফুল বিক্রি করেন, ফুল থেকে মালা তৈরী করেন। ছবি আঁকার সময় যদিও নিজের ভাবই ফুটে আসে, কিন্তু ছবিরও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, একটা প্রতিরূপ কিনা। ঈশ্বর দেবতার ব্যাপারে যে ধারণাগুলো আমরা পাই, জিনিসটা যত তার কাছাকাছি হবে তত ভাল।

দুপুরের খাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করেছেন। **অধর ও অন্যান্য ভক্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। অধর সেন এই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন**। ঠাকুরকে অধর প্রশ্ন করছেন –

অধর (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) –মহাশয়, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে; বলিদান করা কি ভাল? এতে তো জীবহিংসা করা হয়। বলিদান করা যায় কিনা, মাংস খাওয়া যায় কিনা, মাছ খাওয়া যায় কিনা ইত্যাদি, এগুলো ধর্মজীবনে খুব নামকরা প্রশ্ন। আর বলি মানে জীবহিংসা, বলিপ্রথা নিয়ে বারবার ধর্মকে সম্মুখীন হতে হয়। কিসে জীবহিংসা নেই? আপনি যে চাল, ডাল, গম খাচ্ছেন, তাতে কি জীব নেই? আলু কেটে খাচ্ছেন, পটল কেটে খাছেন, তাতে কি প্রাণ নেই? ঠাকুর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে তন্ত্রমতে, শক্তিমতে বলি দেওয়ার প্রথা আছে। মনুস্মৃতিতে খুব সুন্দর বলছেন –মাংস খাওয়া, মদ খাওয়, মৈথুন করা, এগুলোতে কোন দোষ নেই, তবে না করলে ভাল। এটা হল হিন্দু মর‍্যাল কোড, হিন্দু মর‍্যালিটি এভাবেই চলে। এই যে তন্ত্র মত আদি আছে, সেখানে মানুষের যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলোর নিন্দা করা হয় না। তুমি মাংস খেতে চাইছ, ঠিক আছে, অবশ্যই খাবে; কিন্তু মার উদ্দেশ্যে বলি দ্বারা অর্পণ করে সেটাকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ কর। প্রসাদ রূপে গ্রহণ করাকে আর ভোগ করা বলা যাবে না। ইদানিং কালে এত পিকনিক হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের পার্টি হচ্ছে, এগুলো এনারা করতে দিতেন না। বয়স্করা দেখে থাকবেন, আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে মাংসকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা হত। এমনকি হিন্দুরা মাংসে পেঁয়াজ রসুন দিতেন না। এখনও, আমাদের এখানে ছেলেরা পড়তে আসে, ওদের অনেকের বাড়িতে এখনও পেঁয়াজ রসুন চলে না। আগেকার দিনে হিন্দুদের বাড়িতে পেঁয়াজ-রসুন ঢুকত না। মাংস খাবে, কিন্তু মা কালীকে যেটা বলি দেওয়া হয়েছে সেই মাংসকে প্রসাদ করে গ্রহণ করা হয়, ওই মাংসে পেঁয়াজ রসুন দেওয়া যাবে না। এখনও বলি দেওয়া মাংসে পেঁয়াজ রসুন দেওয়া হয় না। ঠাকুরও অন্য জায়গায় বলছেন, মদ খাবে, কিন্তু অর্পণ করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করবে। আপনার কি কোন কিছুতে দুর্বলতা আছে, কোন খাওয়া, কোন পরা, কিছু করা, কোন এমন ভোগ যেটা থেকে আপনি বেরোতে পারছেন না? ঈশ্বরকে অর্পণ করে সেটা করুন, দেখবেন আসক্তি চলে যাবে। প্রসাদ রূপে গ্রহণ করলে দুর্বলতা চলে যাবে। এটা গেল লোভ।

দ্বিতীয় হল, বাড়িতে কোন একটা প্রাণের ভয় আছে, কিংবা কোন একটা মানত আছে; তখন জানলেন যে, মা কালীর ওখানে পাঠাবলি দেওয়া হয়; সেটা দেখে বা শুনে আর-একজনও মনে মনে

ঠিক করে নিল, যদি এই রকম হয়, আমি মা কালীর ওখানে পাঁঠাবলি দেব; এটাকেই বলা হয় শাস্ত্রবিধি। ঠাকুর বলছেন – **‘বিধিবাদীয়’ বলিতে দোষ নাই**। শাস্ত্র বলে দিয়েছে, আপনি বলি দিতে পারেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। **যেমন অষ্টমীতে একটা পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না**। অধর সেন যে প্রশ্ন করেছেন, আপনাদেরও মনে এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসছে যে, বলি না হলেই ভাল। সবার জন্য বলি চলে না।

আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মার প্রসাদী মাংস, এ-অবস্থায় খেতে পারি না। কালী মন্দিরে আছেন, বলি হচ্ছে, মায়ের প্রসাদ ঠাকুরের কাছে আসছে, আগে হয়ত খেতেন, এখন ঠাকুরের যে অবস্থা সেই অবস্থায় তিনি আর খেতে পারেন না। **তাই আঙুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন**। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি মাতৃরূপে আছে, তাঁকে অর্পণ করা হয়েছে যে জিনিস, সেই জিনিসকে তুমি গ্রহণ করতে চাইছ না, তাতে তিনি রাগ করতেই পারেন।

আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্বভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এই অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্ত্বনা হয় যে, তার দেহমাত্র বিনাশ হল। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। তাত্ত্বিক ভাবে এটা কিছু না। আপনার কাছে পিঠে কেউ মারা গেলেন, আর সেখানে গিয়ে আপনি বলতে শুরু করলেন – সে তো মরেনি, ওর দেহটাই মরেছে। মৃতের আত্মীয়রা আপনাকে আর বাড়িতে কোন দিন ঢুকতে দেবে না। ঠাকুর বলছেন তার দেহমাত্র বিনাশ হল। আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই। ঠাকুর বলছেন কারণ তিনি সর্বভূতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখছেন, মৃত্যু মানে তার খোলটা মাত্র নাশ হল।

বেশি বিচার করা ভাল নয়, মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হল। বেশি বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। সেইজন্য বেশি বিচার করতে নেই। বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্র, যেখানে দ্বৈত ভাব রয়েছে, এই জায়গাতে বিচার করতে গেলেই সব গুলিয়ে যাবে। **এ-দেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়**। আমার এক বন্ধু মহারাজকে একবার আমি এই ধরণের একটা প্রশ্ন করেছিলাম। উনি আমাকে বলছেন, ‘অদ্বৈত নিয়ে আপনি যত প্রশ্ন করুন, আমি সব উত্তর দিয়ে দেব, কিন্তু যেমনি ভক্তিতে নেমে যাবেন তখন আর এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে এটা, সব গুলিয়ে যায়, কিছুই বোঝান যায় না’। উনি সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত ছিলেন, অনেক আগেকার কথা। আমি ওনার কথাটা শুনে খুব জোর হেসে ফেলেছিলাম। আসলে তাই, ভাগবত আদি যদি শোনেন, সব গুলিয়ে যায়। একটু যদি বিচার করতে যান, এর সঙ্গে ওর, ওটার সঙ্গে এটার সব কিছু কাঁটায় কাঁটায় মিলবে না।

বিচার করতে যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তাহলে আপনি বেদান্তী হয়ে যান। বেদান্তীরা শুধু বিচার করে করে দাঁড় করিয়ে দেবে। তার সাথে এই ব্যাপারে আপনার ভাল একটা সম্ভবনা তৈরী হয়ে যাবে যে, আপনি ধর্মপথ থেকে পুরোপুরি সরে যাবেন। খালি অধ্যাস, মিথ্যা, সাপ আর দড়ি নিয়েই থাকবেন। আমি মজা করে বলি –আচার্য বললেন, ব্রহ্মাই সত্য, বাকি সব মায়া। ওনার পরম্পরার ক্রমপর্যায়ে যাঁরা যাঁরা এলেন, তাঁরা সবাই জিনিসটাকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে গিয়ে শুধু মায়ার উপর জোর দিয়ে গেলেন –দড়ি, সাপ আর সাপ, দড়ি, আর তার সাথে স্ফটিক আর ফুল। শুধু এই কটাকেই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। মাঝখান থেকে মূল যে জিনিসটা ছিল –সমস্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই; ওনারা ভুলেই গেলেন। থেকে গেছে শুধু বিচার, এতে কোন লাভ হয় না, মূলটাই হারিয়ে যায়। যাঁদের করা দরকার, ভগবান তাঁদের সেই জ্ঞান, সেই শক্তি দিয়ে পাঠান, আমাদের করার দরকার নেই। ঠাকুর অত্যন্ত সহজ উপমা দিচ্ছেন –এ-দেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। **তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। ধ্রুবর ভক্তি সকাম। রাজ্য লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তি**।

ভক্ত –ঈশ্বরকে কিরূপে লাভ হয়? ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের অনেক কিছুর ব্যাপারে কৌতুহল ছিল। ঠাকুর সবার কথার উত্তর দিতেন, এখানেও ঠাকুর বলে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ওই ভক্তির দ্বারা। তবে তাঁর কাছে জোর করতে হয়। দেখা দিবিনি, গলায় ছুরি দেব –এর নাম ভক্তির তমঃ। ঠাকুর ভক্তিতেও সত্ত্ব, রজো ও তমোর কথা বলতেন। ওই ভক্তের মনে কিউরিসিটি।

ভক্ত –ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

আমাদের একজন সিনিয়র মহারাজের একটা গল্প আছে। ভক্তরা দু-চারটে বই পড়ে সর্বজ্ঞানী হয়ে মহারাজদের কাছে আসেন। তখনকার দিনে এখনকার মত এত লোকজন আশ্রমে আসতেন না, খুব কম লোকজন আশ্রমে আসতেন। একজন ভক্ত মঠে এসে সিনিয়র একজন মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজ, আপনার কি ঈশ্বরদর্শন হয়েছে'? সেই মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –'আপনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন, আমিও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস না, এসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবেন না'। অনধিকারচর্চায় নামতে নেই। এই ভক্তের কৌতুহল হয়েছে, শুনেছেন ঠাকুরের মা কালীদর্শন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ – হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার –দুই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়রূপে দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। অবতারতত্ত্ব আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, আমাদের গীতার ক্লাশগুলিতেও বিস্তারে আলোচনা হয়েছে। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ নিরাকার তিনি নিজের শক্তিতে সাকার হন, তিনি নিরাকার রূপেও বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ হন, সাকারেও প্রত্যক্ষ হন। আর তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন এই দেহে তাঁকে দেখা যায়। শুধু দুর্ভাগ্য যে, অবতারকে বেশি লোকে জানতে পারে না, চিনতে পারে না। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ সাকার যে ঈশ্বর তাঁকেও খুব অল্প কয়েকজন ছাড়া জানতে পারে না, বুঝতেও পারে না। সাকাররূপে যে কজন দর্শন করেন, তার থেকে নিরাকার দর্শন আরও কম লোকের হয়, কিন্তু অবতারকে সবচেয়ে বেশি মানুষ জানেন যে ইনি ভগবান।

কাউকে যদি অবতার রূপে মনে হয়, আপনি কি করে বুঝবেন যে ইনি অবতার কিনা? মাঝে মাঝে এক আধজন বাবাজীর নাম আমরা শুনে থাকি। অনেকে এসে আমাদের কাছে জানতে চান, ইনি কি সত্যিই অবতার? কিছু দিন পরে খবর পাই উনি এখন জেলে আছেন। আমরা কি করে বুঝব ইনি অবতার কিনা? প্রথম লক্ষণ হল –যাঁরা অবতারের সঙ্গ করেন, তাঁদের জীবনটা আমূল পাল্টে যায়। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –হাতি যদি ডোবায় নামে, ডোবার জলে তোলপার পড়ে যায়। আপনি যদি কোন সাধুর কাছে পৌঁছে যান, যাঁর ভিতর সত্যিকারের শক্তি আছে, আপনার জীবনে তোলপার শুরু হয়ে যাবে, আপনি নিজেকে আর সামলাতে পারবেন ন। জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ, সংসারের প্রতি যে আকর্ষণ –এটা খসে যাবে। এই যে বলা হয় –ফলেন পরিচিয়তে, ফল দিয়ে জানা যায়; অবতারকে দেখতে হবে না, অবতারের আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের দেখুন। ভাল করে দেখুন, তাঁদের মন কতটা সংসার থেকে সরে ঈশ্বরের দিকে গেছে, তাতেই বোঝা যায়। আর দ্বিতীয় আরেকটা লক্ষণ হয় –অবতার জীবদ্দশায় যে কাউকে ধ্যানের গভীরে বা বিনা ধ্যানেও দর্শন দেন আবার মহাসমাধির পরেও দর্শন দেন। এমনিতে অবতারকে বোঝা একটু কঠিন, কারণ এতে বুজরুকি হওয়ার প্রচুর সম্ভবনা।

চালবাজ ও ফ্রড বাবাজীরা পাঁচজন শিষ্যকে আগে থেকে শিখিয়ে দেবেন লোকেদের এই বলতে যে –উনি আমাকে এখানে দর্শন দিয়েছেন, ইত্যাদি। রোমান ক্যাথলিক চার্চে যখন সেন্ট বানায়, ওরা বলে এই সেন্ট এই এই মিরাক্যালস করেছেন। ভাবলে অবাক লাগে, তখন মনে সন্দেহ হয় এনারা কি সত্যিই ধর্ম পথে আছেন? দুটো টাকা দিয়ে বশ করে একজনকে দিয়ে অতি সহজে মিরাক্যালের ব্যাপারটা বলিয়ে দেওয়া যাতে পারে। ওরা পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে নেয় ঠিকই, কিন্তু আপনার টাকা-পয়সা

হয়ে গেল, আপনার রোগ ভাল হয়ে গেল, আপনার সন্তানের ভাল হয়ে গেল, আমাদের হিন্দু ধর্মে এগুলোর কোন দাম নেই। মূল্য হল, আপনার জীবন কত পরিবর্তন হল। সংসার থেকে আপনার মন কতটা সরে এলো, ধর্মের প্রতি আপনার আগ্রহ কতটা বাড়ল। ঈশ্বরদর্শন হয়ে যাওয়ার পর এগুলো যদি না হয়, তাহলে ঈশ্বরদর্শনে লাভ কি? জিনিসটা ম্যাজিক্যাল হয়ে গেল। বাইবেলে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, যীশু কিভাবে নিজের শিষ্যদের বিভিন্ন রকমের দর্শন দিয়ে, বিভিন্ন রকমের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে। **১১ই** মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার, আজ ঠাকুরের জন্মতিথি (পৃঃ ১৪৫)। কিছু দিন আগে বেলুড় মঠে ঠাকুরের তিথিপূজায় ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করা হল। **আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন**।

নররূপী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসবের প্রাঞ্জল বর্ণনার কারণে এই পরিচ্ছেদটা খুব সুন্দর। যিনি অনন্ত তাঁর কিসের জন্মতিথি? আবির্ভাব তিথি ঠিক আছে, কোন সন্দেহ নেই, সমস্যাও নেই। ভগবান যখন নররূপ ধারণ করেন, সেই নররূপে তিনি কিভাবে একজন আদর্শ পুরুষ বা একজন মানুষ, কেমন যেন আপন বলে বোধ হয়, এই ধরণের উৎসবের মধ্যে নররূপী ভগবানের এই জিনিসগুলো সুন্দর প্রকাশ পায়। তাতেও কিন্তু ওই যে ঈশ্বরীয় ভাব, মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা –এটা থেমে যায় না।

মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন –**মঙ্গলারতির পরে প্রভাতী রাগে নহবতখানায় মধুর তানে রোশনচৌকি বাজিতেছে। বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নূতন বেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয়ে ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে**, ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –তুমি এসেছ। (ভক্তদিগকে) লজ্জা, ঘৃণা, ভয় –তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। মাস্টারমশাইর মনপ্রাণ খুলে নাচগান করাটা হত না। **কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা**।

স্বামীজী তাঁর গানে ঠাকুরের বর্ণনা করছেন –*অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্ নৃত্যম্*। ঠাকুরের ভিতরটা অদ্বৈতভাবে সমাহিত, কিন্তু সামনে ভক্তিভাব। কারণ সাধারণ লোক অদ্বৈতভাব নিতে পারে না, তারা ভক্তিটাই নেয়। তাই যে করে হোক, নৃত্য করে হোক, গান করে হোক ঠাকুর মানুষের মধ্যে ভক্তিভাবকে প্রথিত করে দিচ্ছেন। ঠাকুরের তিথিপূজার দিন বেলুড় মঠে ভোরবেলা উষাকীর্তন হয়। সন্ন্যাসীরা মঠ প্রাঙ্গনে দু-বাহু তুলে নৃত্য করতে করতে ঠাকুরের মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। এই একটা দিনই এভাবে মঠ প্রাঙ্গনে সব সাধুরা মিলে নৃত্য করেন, অন্য আর কোন দিন হয় না। কারণ আমরা বেদান্তী সন্ন্যাসী কিনা, আমাদের সম্প্রদায়ে এভাবে নৃত্যাদি হয় না।

এখানে নিজের জন্মতিথি নিয়ে কিছু না, এটা একটা বিশেষ তিথি –ফাল্গুন শুক্ল দ্বিতীয়া। দশ বারো বছর আগে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ মঠের ম্যানেজার ছিলেন। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ঠাকুরের তিথিপূজায় আমাকে উনি বললেন –তুমি বিকালের ধর্মসভায় হিন্দিতে ঠাকুরের কথা বলবে। যখন আমি স্টেজে মাইকের সামনে ভাষণ দিতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার মনে হল, যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের তিথিপূজাকে জন্মাষ্টমী বলা হয়, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথিকে রামনবমী বলা হয়, তেমনি হয়ত একদিন হবে যখন এই তিথিকে ঠাকুরদ্বিতীয়া বলে উল্লেখ করা হবে। এটা আমি লেকচারেও বলেছিলাম।

এই যে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? এই লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয় বলা হয় –এই বাক্যকে আমরা প্রায়ই জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই লাগাই। কিন্তু তা না, ঠাকুর লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয় বলছেন শুধু ঈশ্বরের নামগুণগান করাতে।

ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান শুরু করেছেন, সাথে সাথে ঠাকুরের মনও ভাবরাজ্যে চলে গেছে। **ঠাকুরের মন শুষ্ক দিয়াশলাই, একবার ঘষিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দিয়াশলাই, যত ঘষো জ্বলে না –কেন না মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কানে কানে কি বলিতেছেন**।

আমরা যদি এই দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখি, আপনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন, সেই পূণ্য জন্মতিথি, ঠাকুরের জন্মদিন পালন করছেন সবাই, ভক্তরা সবাই মিলে নৃত্য করছেন। তার মধ্যে ঠাকুর সমাধিমগ্ন হয়ে আছেন। চারদিকে যেন আধ্যাত্মিকতার বান ডেকেছে, যে বান সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি মানসচক্ষে সব দেখছেন এবং আপনিও এক অজানা আনন্দের রাজ্যে ভেসে যাচ্ছেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাবে'?

ভবনাথ –আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কি দরকার?

ভবনাথ –আজ্ঞা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে যাবে। (কালীকৃষ্ণের প্রস্থান)

শ্রীরামকৃষ্ণ –ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখত? ওর কপালে নাই।

যখন এই বিশেষ দিনগুলো আসে –শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, ঠাকুরের তিথিপূজো, মায়ের তিথিপূজা; আগে থেকে প্ল্যান করে সমস্ত কাজগুলোকে পিছিয়ে দিতে হয়, জরুরী যে কাজ সেটাকেও সরিয়ে দিতে হয়, পরে হবে। যেভাবেই হোক, আশ্রমে এসে হোক, নিজের বাড়িতে উৎসব করে হোক, দিনটাকে উদযাপন করা। আপনারা এত ভক্তরা আছেন, আপনার বাড়িতেই উৎসব করতে পারেন। বাড়িতে পূজোর আয়োজন করুন, আরও পাঁচ-দশজন ভক্তদের ডাকুন, প্রসাদ খাওয়ান। তারপর সময় হলে মঠে এসে প্রণাম করে যান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে ভক্তসঙ্গে –সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

সকাল আটটা-নটা হয়েছে, ঠাকুরের স্নানের সময় হয়েছে। স্নান করার সময় বলছেন – **'এক ঘটি জল আলাদা করে রেখে দে'। শেষে ওই ঘটির জল মাথায় দিলেন**। ঠাকুরের ঠাণ্ডা লেগে যেত বলে পুরো জলটা মাথায় ঢেলে স্নান করতে পারতেন না। খুব মধুর কথা, এতে বোঝা যায় যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতই থাকছেন। লোকেরা প্রায়ই প্রশ্ন করে, সাধুদের কেন শরীর খারাপ হবে? সাধুদের যেন শরীর খারাপ হত নেই। সাধুদের শরীর কেন খারাপ হবে না, সাধুদের শরীরটা মানুষেরই তো শরীর। আমি একবার এক সর্দারজীর ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম, সর্দারজী আমাকে বলছেন, 'আরে সাধুলোগো কি তবিয়ৎ খারাপ হোতি হ্যায়'? আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ক্যায়া করে পাপীতাপী লোগ কে আশপাশ রহতে হ্যায়'। কি করব, একটা উত্তর তো আমাকে দিতে হবে। তুমি যদি ক্যাট ক্যাট করে কথা বল, ক্যাট ক্যাট উত্তর পাবে; যদি ভদ্রলোকের মত কথা বল, ভদ্রলোকের মত উত্তর পাবে।

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন। শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া দুই-একটি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ির পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা-কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যালফেলে –ডিমে যখন তা দেয়, পাখির দৃষ্টি যেরূপ হয়। খুব সুন্দর বর্ণনা। দেখাচ্ছেন, ঠাকুর কিভাবে মায়ের মধ্যে ডুবে আছেন।

মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করছেন। কোন বিধি নেই, কিছু নেই। **পূজার নিয়ম নাই –গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন**। মাঝে মাঝে যখন এই বর্ণনাগুলি পড়ি, কখন ভাবি, স্বপ্নেও যদি নিজের মধ্যে এই ভাব কখন দেখি। আমাদের জীবনে এই রকম ভাব তো আর কোন দিন হবে না যে, এই স্তরে গিয়ে দেখতে পারব। এখানে মাস্টারমশাই বর্ণনা করে যাচ্ছেন ঠাকুর মন্দিরে মন্দিরে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে নিত্যগোপাল, কেদার চাটুজ্যে এসেছেন। নিত্যগোপালকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে, 'তুই কিছু খাবি'? এখানে যে বর্ণনা তাতে দেখাচ্ছেন, অবতার একজন মানুষ রূপে মানুষের মধ্যে কিভাবে থাকেন, এগুলো দেখলে মনে হয়ে যেন ঠাকুর আমাদের, খুব আপনজন, খুব কাছের মানুষ।

নিত্যগোপালের বয়স তেইশ-চব্বিশ, আর একজন পরম ভক্ত স্ত্রীলোক একত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স, তাকে নিয়ে ঠাকুর বলছেন –**সেখানে কি তুই যাস?**

নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায়) –হাঁ যাই। নিয়ে যায়।

সাধুদের বাড়িতে নিয়ে যেতে নেই। সাধুকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া মানে সাধুর সর্বনাশ করা। একজন সাধু তৈরী করার পিছনে কত খাটনি লেগে থাকে। সে নিজের বাবা-মা-ভাইবোন সবাইকে ছেড়েছে, নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে সঙ্ঘ তার পিছনে কত ভাবে লেগে আছে, পাঁচ বছর, দশ বছর ধরে শুধু ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে একটা সাধুকে কিভাবে সঙ্ঘ তৈরী করছে। এয়ারফোর্সে পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার সময় বলে দেওয়া হয়, যত দামী প্লেন হোক, প্লেন যদি ক্র্যাশ করতে যায়, প্লেনের কথা ভাববে না, আগে তুমি প্যারাস্যুট পরে প্লেন থেকে ঝাঁপ মারো। একটা প্লেন চলে গেলে টাকা দিয়ে আরেকটা প্লেন কিনে নেওয়া যাবে, কিন্তু একটা পাইলট তৈরী করতে অনেক বছর লেগে যাবে। পাইলটের জীবনের অনেক দাম, তাকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। একটা সাধুর জীবনও সঙ্ঘের কাছে, সমাজের কাছে প্রচণ্ড দামী। আপনারা যাঁরা শুনছেন, কত কষ্ট করে আপনারা আজকে মনকে এই স্তরে এনেছেন। এই স্তরে, যেখানে নিজের কাজকর্ম ছেড়ে, আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে শাস্ত্রের কথা শুনছেন। এটাকে কি নষ্ট হতে দেওয়া যায়? একটা ভারি পাথরকে ঠেলে ঠেলে পাহাড়ের উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। বিনা কারণে পাথরটাকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া কি কোন মানে হয়? এখানে সাধু বলতে ঠাকুর সন্ন্যাসীকে বলছেন না। যাঁরাই ঈশ্বরের পথে আছেন, কোন পুরুষ না, কোন মহিলা না, আপনারা সবাই সন্ন্যাসী না, কিন্তু সাধু। যাঁরই মন কিছুক্ষণের জন্য ঈশ্বরের দিকে গেছে, সেই সাধু। ঠাকুর তাই কি বলছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ –ওরে সাধু সাবধান। এই কথা কোন সন্ন্যাসীকে বলছেন না, একটা ইয়ং ছেলে, যার ঈশ্বরের দিকে মন গেছে, সে একান্তে এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তাকে এই কথা বলছেন –ওরে সাধু সাবধান। আমি অনেক মহারাজদের জানি, যাঁরা ঘরে 'ওরে সাধু সাবধান' লিখে দেওয়ালে সাঁটিয়ে রেখেছেন। শুধু সাবধানেই থাকতে হয়, কিছু করার নেই। এই কথা আপনাদের উপরেও প্রযোজ্য, কারণ নিত্যগোপাল কোন সন্ন্যাসী নন। ভাল সাধক ছিলেন, সাধক তো আপনারাও। এই যে আপনারা গীতা শুনছেন, কথামৃত শুনছেন, তার মানে তো আপনারা সাধক। সেই স্তরে কেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না, কারণ সাবধান থাকছেন না –ওরে সাধু সাবধান।

মনকে কখনই একটা স্তরের নিচে যেতে দিতে নেই, সংসারে এমন কিছু করতে নেই, এমন কোন সম্পর্কের সাথে জড়াতে নেই, যেটা আপনাকে টেনে নিচে নিয়ে চলে যেতে পারে। একবার দুবার করলেই বোঝা যায় যে এই জিনিসটা আমাকে টেনে নিচে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা থেকে সরে আসতে হয়। আপনারা এখন যাঁরা এই কথামৃতের ক্লাশ শুনছেন, আপনাদের বাড়ির অনেকেই হয়ত আছেন যাঁরা আপনার এই ক্লাশ শোনাটা পছন্দ করেন না, কিন্তু মেনে নিয়ে চুপ থাকছেন। আপনার বাড়ির লোকেরা এতে ইনভেস্ট করছে। আপনার বাচ্চাকে যখন স্কুলে পড়াশোনা করতে পাঠান, তাতে আপনি একটা ইনভেস্ট করছেন। কি ইনভেস্ট করছেন? নিজের সময়, নিজের ইমোশান, টাকা-পয়সা। এই ইনভেস্টমেন্টকে বিনা কারণে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। নিজের জীবনে ধর্মের পথে যা অল্প একটু এগিয়েছেন বা অনেক বেশি এগিয়েছেন, যেটাই হয়ে থাকুক, এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। এটা শুধু আপনার ইনভেস্টমেন্ট না আপনার যে কজন পরিচিত আছেন তাঁদের সবারই এতে ইনভেস্টমেন্ট আছে। আপনার বাড়িতে স্বামী বা স্ত্রী আছেন, আপনার সন্তানরা আছে, সবাই জানেন আপনি এই ক্লাশগুলো শুনবেন। বাড়ির লোকেরাও মেনে নিয়েছেন, ওনারাও আপনার এতে ইনভেস্ট করছেন – আচ্ছা তুমি এগিয়ে যাও। আপনি এটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারেন না। কোন ভাবেই এটাকে ব্যাড ইনভেস্টমেন্টের দিকে যেতে দিতে পারেন না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন –ওরে সাধু সাবধান।

এক আধবার যাবি –একটা পরিচিতি আছে, ঠিক আছে যাবি। **বেশি যাসনে –পড়ে যাবি। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া**। ঠাকুর এখানে যে অর্থে 'মায়া' শব্দ বলছেন, উপনিষদ আদিতে শব্দটা হয় 'এষণা'। সেখানে অনেকগুলো এষণার কথা আছে, কিন্তু সব এষণাকে উপনিষদ তিনটে জিনিসের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন –পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। পুত্রৈষণা, আমার সন্তান চাই, সন্তান হলে লোকেরা কত খুশি হয়। বিত্তৈষণা, সংসারে থাকতে গেলে সে সংসারী হোক, সাধু হোক সবারই টাকা-পয়সার দরকার হয়। লোকৈষণা, একটা বয়সের পরে মানুষ ভাবতে শুরু করে, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? তখন তার এই এষণা আসে, আমি যেন ভাল স্বর্গে যেতে পারি, ভাল জন্ম যেন হয়, ভাল লোকে যেন থাকতে পারি; অশুভ যোনিতে গিয়ে যেন না পড়ি।

এই তিনটে এষণার মধ্যেই আমরা ঘুরঘুর করতে থাকি। এটাই বন্ধন, এই বন্ধনটা যখন আরও গভীর হয়ে যায়, বর্তমানকালে আমরা যার জন্য 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করি। এই মায়া বেদান্তের মায়ার সঙ্গে প্রায় এক, তফাৎ কিছু নেই। কিন্তু ঠাকুর বারবার বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, কারণ উপনিষদে যে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা বলছেন, যাঁরা উচ্চস্তরের সাধক, উপনিষদ তাঁদের জন্য বলছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের মূল্যবোধ অনেক কম।

সাধুর মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। মেয়েরা যাঁরা সাধনজীবনে আছেন তাঁদের জন্যও একই জিনিস প্রযোজ্য। মাটিও ভাল, জলও ভাল, মিশলেই কাদা। **ওখানে সকলে ডুবে যায়** – এগুলো সংসারীদের জন্য নয়, যদিও সংসারীদের উপরেও একই জিনিস প্রযোজ্য। **ওখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি**। এটা ঠাকুরের কথা না, প্রচলিত কথা। পুরাণাদিতে এই জিনিসটাকে নিয়ে কত কাহিনী আছে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। ভগবান তখন মোহিনী রূপ ধারণ করে সমস্ত অসুরকে ওতেই মজিয়ে দিলেন।

আমি অল্প একটু অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছি, মেয়েরা ইমোশানালি একটু বেশি ক্ষমতা ধারণ করতে সক্ষম হন। একজন মহিলা আইএএস অফিসার একবার কথা বলতে বলতে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন –মেয়েদের দরকার আর্থিক নিরাপত্তা, পুরুষের দরকার হয় ইমোশানাল নিরাপত্তা। যারজন্য মেয়েরা টাকা পেয়ে গেলে ওদের আর কিছু লাগে না, পুরুষ থাকুক আর না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুরুষদের নারী লাগবেই লাগবে, কারণ তাদের দরকার ইমোশানাল স্ট্যাবিলিটি। কারণ পুরুষ ইমোশানালের দিক থেকে খুব দুর্বল। অনেক সময় মেয়েরা এই নিয়ে

চেঁচামেচি করে –ঠাকুর কেন মেয়েদের নিয়ে এই রকম বলেছেন? কারণ, স্বাভাবিক ভাবে মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি স্ট্যাবল্ হয়। পুরুষকে দেখলে যত মেয়ের মাথা ঘোরে, তার ঢের বেশি গুণ মেয়েদের দেখে ছেলেদের মাথা ঘোরে। পুরাণ আদির কোন কাহিনীতে আপনি পাবেন না যে, মেয়েদেরকে বোকা বানানোর জন্য, ফাঁদে ফেলার জন্য কোন পুরুষকে পাঠানো হয়েছে। পুরুষগুলোকে বোকা বানানোর জন্য একজন অপ্সরা এসে গেল, কোন রূপসী মেয়ে এসে গেল আর তাতে – ব্রহ্মা বিষ্ণু পরে খাচ্ছে খাবি। **ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন**।

মাস্টারমশাইর সংসারে নিজের এত সমস্যা ছিল যে, কামিনী-কাঞ্চন শব্দটা এলেই উনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। মাস্টারমশাই সব শুনে নিজের মনে ভাবছেন –**কি আশ্চর্য! এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা। এমন উচ্চ অবস্থা সত্ত্বেও কি ইঁহার বিপদ সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন**। মাস্টারমশাই আরও অনেক কিছু বলতে বলতে শ্রীচৈতন্যের ছোট হরিদাসের উপর শাসনের কথা বলছেন। ধর্ম জগতে যাঁরাই মহাত্মা হয়েছেন, নিজের শিষ্যরা যাঁরা আছেন, ওখানেই সব মহাত্মার ইনভেস্টমেন্ট হয়ে আছে, তিনি চান না যে তাঁর এই ইনভেস্টমেন্ট বৃথা নষ্ট হোক। শিষ্য মেয়েমানুষের দিকে গেলে বা মেলামেশা করতে থাকলে ওনারা বিভিন্ন ভাবে শিষ্যকে আটকানোর চেষ্টা করেন। মাস্টারমশাই বলছেন, –**শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয় – তাড়াতাড়ি পূর্ব হইতে সাবধান করিতেছেন। ভক্তরা অবাক্। 'সাধু সাবধান' –ভক্তরা এই মেঘগম্ভীরধ্বনি শুনিতেছেন**। তবে আপনারা মনে রাখবেন, এই সাধু সাবধান এটা শুধু সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন না, আপনারা যাঁরা শুনছেন সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়। পরের পরিচ্ছেদে ঠাকুর শব্দব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাকার-নিরাকার – ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি

সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তরা মিলে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করছেন। তারই বর্ণনা মাস্টারমশাই করে যাচ্ছেন। ঠাকুরের প্রথম দর্শন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মাস্টারমশাইর ঠাকুরের সঙ্গ করাটা মাঝামাঝারি অবস্থায় পৌঁছে গেছে। ঠাকুর আর বেশি দিন নেই, খুব জোর তিন বছর আর আছেন। তিন বছরও অনেকটা সময়, যদিও মাস্টারমশাই সব দিনের কথা লিখে যেতে পারেননি। এখন বিভিন্ন কারণে, কিছুটা ঠাকুরের জন্মমহোৎসবে অনেকেরই সেদিন আগমন হয়েছিল।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত-চর্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

বেদান্ত-চর্চা গৃহস্থরা চিরদিনই করতেন। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃতে পাঁচ বছরের একটা এমএ কোর্স আছে। প্রত্যেক বছরই একজন দুজন বৈষ্ণববাড়ির ছেলে ভর্তি হয়। সেকেণ্ড ইয়ারে তিনজন আছে যারা বৈষ্ণববাড়ির ছেলে। কেউ বৈষ্ণব হয়েছে, কারুর বংশটাই বৈষ্ণবের, কারুর বাবা-মা বৈষ্ণব। দেখে খুব ভাল লাগে। সবাই এখানে থাকে, তিলক আদি কাটে। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, বর্তমানকালে আমরা যে এত কিছু বলছি –সমাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কেমন দিনকাল হয়ে যাচ্ছে, সবাই ফেসবুক, হোয়াটসাপ নিয়েই থাকে; সেখানে আজকের দিনে বাচ্চা ছেলে তিলক কেটে গ্রাজুয়েশান করছে, ভাবা যায়! জগতের সমস্ত সুখ বাদ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করছে। দেখলেও কেমন একটা শ্রদ্ধা জন্মায়। যে বয়সে জগতের সব কিছু ভোগ করার কথা, সেখানে এরা পুরো নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম পালন করছে। পানিহাটির একটি ছাত্র বলল, রোজ দুপুরে এগারো রকমের ভোগ দিয়ে মহাপ্রভুর সেবা করা হয়, তাও আবার দিনে ছয়বার। আমি বললাম, 'বাড়ির লোকেরা কি আর কোন কাজ করেন না'?

ছাত্রটি এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করছে, কিন্তু মনপ্রাণ পুরো মহাপ্রভুর সেবায় ডুবে আছে। ঠিক তেমনি কিছু গৃহস্থ ছিলেন বেদান্ত-চর্চা করতেন। আবার অনেকে শাক্ত ছিলেন, শৈব ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে পড়লে দেখা যায়, কত রকমের সাধু, কত রকমের ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন। ঠাকুর সমস্ত প্রকার সাধনা করেছিলেন বলে, যে সম্প্রদায়ের লোক আসছেন, তাঁকে তিনি তাঁর মত কথা বলছেন।

দক্ষিণেশ্বরবাসী –এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে-বাহিরে হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –শুধু শব্দ হলে তো হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটা আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না। 'তোমায় না দেখলে', খুব মূল্যবান কথা। শুধু নাম দিয়ে তো হবে না, তাঁকে দেখতে হবে, তাঁকে অনুভব করতে হবে। তখন দক্ষিণেশ্বরবাসী বলছেন –

দঃ নিবাসী –ওই শব্দই ব্রহ্ম। ওই অনাহত শব্দ।

এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার, শব্দব্রহ্ম জিনিসটা কি। দক্ষিণেশ্বরবাসী যিনি বেদান্ত-চর্চা করেন, কেদার চাটুজ্যের সাথে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঠিক করার চেষ্টা করছেন, ভদ্রলোক ঠিক মানতে চাইছেন না। ঠাকুরকেও তাই বলতে হচ্ছে, **ওঃ বুঝেছ! এর ঋষিদের মত**। তারপর বলছেন, ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে কিভাবে দেখেছিলেন।

শব্দব্রহ্মের ধারণাটা বেদেই এসেছে। কিন্তু বেদে পরিষ্কার করে ঠিক 'শব্দব্রহ্ম' এই নামে আসেনি, ভাবটা এসেছে। বেদের খুব নামকরা শব্দ, *চত্বারি বাক্ পরিমিতা*। বেদে বলছেন চার রকমের বাক্ হয়। 'বাক্' শব্দটা এখানে একটা সমষ্টিগত শব্দ; শব্দ, নীরবতা সব মিলিয়ে বাক্। আমরা যেভাবে বাক্ বলছি, বা ইংরাজী speech বলছি, বেদের 'বাক্' জিনিসটা তার থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তার মধ্যে বলছেন, এই যে বাক্, এর চারটি পদ। তিনটি পদ চাপা থাকে, শুধু একটি পদ মানুষ ব্যবহার করে। মানুষ চতুর্থটা দিয়ে কথা বলে। বেদে এটা পরিষ্কার করে বলা নেই, কিন্তু ভাষ্যকাররা এটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আর পরের দিকে ভাগবত আদিতে এবং তারও পরে যে হিন্দু দর্শন এসেছে সেখানে পরিষ্কার করে বাক্কে চারটে শ্রেনীতে বলে দিয়েছেন –পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। এই চারটি হল বাক্।

বাক্কে যদি শব্দ রূপে দেখা হয়, তখন বাকের চারটি ধাপ আসে। সাধারণ ভাবে আমরা যে কথাবার্তা বলি –এটা হল বৈখরী। বৈখরীর পিছনে একটা সূক্ষ্ম অবস্থা থাকে, যেটাকে বলে মধ্যমা। ঠাকুরের খুব নামকরা কথা, আমরাও শুনে থাকি –সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে, সেখান থেকে তাঁর কৃপায় যোগীরা নাদ ভেদ করে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ করেন। বৈখরী হল সন্ধ্যাবন্দনাদি যে করা হয়, যার মধ্যে মন্ত্র আদি সব রয়েছে। জপ শুরু করার পর মানুষ বৈখরীকে পেরিয়ে মধ্যমার স্তরে পৌঁছায়। মধ্যমা হল –জপ করার সময় আপনি লক্ষ্য করবেন, বিশেষ করে অনেক দিন ধরে দিনে এক টানা চার-পাঁচ হাজার জপ যদি করা হয়, তখন জপ করার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না, আপনা-আপনিই জপ চলতে থাকে।

গুরু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন জপ করার সময় জিহ্বা যেন না নড়ে, কিন্তু দেখা যায় জিহ্বা নড়ার জন্য যেন ছটফট করে। আর জিহ্বা যদি নাও নড়ে তাহলেও দেখবেন জিহ্বার ডান দিক আর বাম দিকে একটা কম্পন হতে থাকে। এগুলো নার্ভ সেন্টারের জন্য হয়। নার্ভ সেন্টারগুলো সক্রিয় রয়েছে মানে মধ্যমা কাজ করছে। মধ্যমাকে যদি আপনি সাইলেন্স করে দিতে পারেন, এরপরেই আপনার ঠিক ঠিক জপ শুরু হবে। তার মানে মধ্যমাকে সাইলেন্স করে দেওয়ার পর ঠিক ঠিক জপ শুরু হয়। জিহ্বা যে হাল্কা করে নড়ে, এর কারণ আমাদের ভোকাল কর্ডগুলো খুব হাল্কা নড়তে থাকে। ওটাকেও যদি

কোন ভাবে আটকে দেওয়া যায়, তখন জপ অনেক দ্রুত হতে থাকবে। সাধারণ অবস্থায় আপনার একশ আটবার জপ করতে যদি পাঁচ মিনিট লাগে, আর আপনি যদি ওই স্তর পেরিয়ে যান, তখন একশ আট জপ করতে আপনার তিরিশ সেকণ্ডও লাগবে না। কারণ ফিজিক্যাল মোশান বন্ধ হয়ে গেছে কিনা।

মধ্যমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে আসে পশ্যন্তি, যেখান থেকে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি। ওই অবস্থায় পৌঁছে গেলে সব সময় ওঙ্কার ধ্বণি শুনতে পাওয়া যায়; এটাকে বলে অনাহত। অনাহত মানে, কোথাও কোন কিছু দিয়ে আহত হয়ে শব্দের উৎপত্তি হয়নি। আমরা এই যে বলছি 'শব্দ', এখানে 'শ' 'ব' ও 'দ' দিয়ে সাইলেন্সটা টুকরো হয়ে গেছে, এটাকে তাই বলছেন আহত, কিন্তু এখানে বলছে অনাহত। এই অবস্থাকেও মানুষ যদি অতিক্রম করে যায়, তখন সে শব্দব্রহ্ম অবস্থায় পৌঁছে যায়। শব্দব্রহ্ম হল, যেখানে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা একক অবস্থায় অবস্থিত। কিন্তু এটাও পরমাত্মা নন। ঠাকুর বলছেন, এই নাদ ভেদ করে যোগী পরমাত্মাতে পৌঁছে যায়, যেটাকে আমরা এখানে পরা বলছি। এখানে পুরো জিনিসটা একটা সমষ্টি রূপে রয়েছে। এই সমষ্টি রূপের যে সাউণ্ড, সাউণ্ড শব্দটা ঠিক না, শব্দটাই ভাল শব্দ; গ্রীক ফিলজফিতে এটাকে 'লোগোস' বলে।

বাইবেলে বলছেন –In the beginning there was word and the word was with God and the word was God। হিন্দু ধর্মের দর্শনাদিতে যেভাবে বলা হয়েছে, বাইবেলে তার থেকে বেশি পরিষ্কার ভাবে বলা আছে। কিন্তু ওনারা এর ব্যাখ্যা পুরো অন্য রকম দেন বলে পুরো জিনিসটা এলেমেলো হয়ে যায়। বাইবেলের কথার বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায় –যখনই সৃষ্টি হয় তখন তা শব্দ থেকেই হয়, সেই শব্দ তখন ভগবানের সাথেই ছিল, আর শেষে বলছেন শব্দই ভগবান। এই যে শব্দব্রহ্ম, ঈশ্বর আলাদা আর শব্দব্রহ্ম আলাদা, খ্রীশ্চানিটির এটা অত্যন্ত গভীর একটা জিনিস। বাইবেলের এই কথা এত উচ্চমানের কথা যে, যদি বেদান্ত কেউ বুঝতে চান, তাহলে এই একটি কথা দিয়েই তিনি বুঝে নিতে পারবেন। আর ওই একটি বাক্যকে যদি বুঝতে হয় তাহলে তাকে বেদান্ত বুঝতে হবে, তা নাহলে বোঝা যাবে না।

আমরা যদি খুব সহজ ভাষায় বলি –ঈশ্বর আছেন, তিনি চাইছেন সৃষ্টি হোক, *সকাময়ত*, তিনি ইচ্ছা করলেন। এই যে ইচ্ছা করলেন, এটাই একটা শব্দ। শব্দের দুটি রূপ –একটা হল এই যে তাঁর ইচ্ছা, যেটাকে ইংলিশে আমরা আইডিয়া বলি, দ্বিতীয় হল শব্দ, যেটা শব্দ রূপে আসে। 'কলম' একটা শব্দ, এখানে প্রথমে 'কলম' একটা আইডিয়া রূপে আসছে, তারপর 'কলম' একটা শব্দ রূপে আসছে। শব্দটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল শব্দের পিছনে যে আইডিয়াটা আছে।

আমাদের ঋষিদের বক্তব্য ছিল –সৃষ্টি যখনই হয় তখন সমস্ত শব্দ এক সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এর অর্থটা বুঝবার জন্য একটা উপমা নিতে হবে। ফাঁকা মাঠে আপনি একটা বাড়ি করছেন। বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা বলবে, এখানে একটা ফাঁকা মাঠ ছিল এখন বাড়ি হয়েছে। একটা নূতন জিনিস সৃষ্টি হল, একটা আইডিয়া এলো, আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করা হল একটা বাড়ি রূপে। ভগবান এভাবে সৃষ্টি করেন না। ভগবানের সৃষ্টি হল শব্দব্রহ্ম, তার মানে যত ধরণের শব্দ হতে পারে আর যত ধরণের ভাব হতে পারে, এর সবটার সমষ্টিকে নিয়ে হয় শব্দব্রহ্ম। সেইজন্য শব্দব্রহ্মকে খুব উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

মৈত্রী উপনিষদ আমাদের একটা খুব নামকরা উপনিষদ; সেখানেই পরিষ্কার করে এই দুটি জিনিস এসেছে –শব্দব্রহ্ম ও অশব্দব্রহ্ম। ব্রহ্মের আগে অনেকগুলো শব্দ লাগানো হয়, যেমন সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম, আবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, তার সঙ্গে আসছে শব্দব্রহ্ম ও অশব্দব্রহ্ম। আমার ব্যাখ্যা হল, মন যতদূর যেতে পারে, এটাই শব্দব্রহ্ম; যদিও সবাই এই ব্যাখ্যাকে মানবেন না। যত দর্শন আছে, ঋষিরা যেভাবে যেভাবে জিনিসগুলোকে দেখেছেন, সেটাকেই আমি খুব সহজ করে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি।

শব্দব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হয়, ভগবান সৃষ্টি করেন না। আবার অন্যান্য দর্শনে বলবেন, সৃষ্টি শক্তি করে, কিংবা বলেন ভগবান মায়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। এই মায়াটাই কিন্তু শব্দ, কারণ শব্দব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু শব্দ সত্য, সেইজন্য আবার শব্দব্রহ্মকে ঠিক ঠিক মায়া বলা যাবে না। মৈত্রী উপনিষদ বলছেন, শব্দব্রহ্মকে আগে জয় করে তারপর সেই অশব্দব্রহ্মে যেতে হয়। অশব্দব্রহ্ম মানে যেখানে বিরাজ করছে complete silence। এই নৈঃশব্দ পরা; পশ্যন্তি, মধ্যমার নৈঃশব্দ না। এই নৈঃশব্দ হল যেখানে কোন ভাব নেই, কোন শব্দ নেই।

পূর্বমীমাংসা হিন্দুদের খুব নামকরা দর্শন, এবং পূর্বমীমাংসাই হিন্দুদের মূল দর্শন। এই যে ঠাকুর এখানে বলছেন, 'ওঃ বুঝেছ, এর ঋষিদের মত'; এই ঋষিদের মত কিন্তু মীমাংসার মত। সাধারণ ভাবে ঋষিদের মত বেদান্তের মত নয়, বেদান্ত যাঁরা দিয়েছেন তাঁরাও ঋষি। বাল্মীকি রামায়ণে পর পর দেখুন –বিশ্বামিত্র আছেন, বশিষ্ঠ মুনি আছেন, ভরদ্বাজ মুনি আছেন তার সাথে আসছেন শরভঙ্গ ঋষি, সুতীক্ষ্ণ আসছেন, অগস্ত্য মুনি আসছেন। সবাই খুব নামকরা ঋষি মুনি। এনাদের সাধনা তিনটে – যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও তপস্যা। রামকৃষ্ণ মিশনেরও সাধনা এটাই। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা যে কাজ করেন এখানে ওনারা চ্যারিটি করছেন না, ওনাদের কাছে এটা যজ্ঞ, যেখানে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এখন আমরা যে ক্লাশ নিচ্ছি, এটা ঠাকুরের সেবা, আমার জন্য এটা একটা যজ্ঞ। কেউ যদি উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেন, অবান্তর প্রশ্ন করেন; এগুলো আমাদের কাছে বিঘ্ন; আমরা এই বিঘ্ন হতে দেব না, কারণ আমাদের কাছে এটা একটা যজ্ঞ। আমাকে অনেকে বলেন, আপনি এত বিরক্ত হয়ে যান কেন। আমি এইজন্যই বিরক্ত হই, কারণ আমার যজ্ঞে বিঘ্ন করছে। যে কজন ঋষি-মুনির নাম বলা হল এনারা সবাই যজ্ঞ করতেন, আমরাও যজ্ঞ করে যাচ্ছি।

এরপর আসে স্বাধ্যায়। আমরা যে জপ করি, এই জপ স্বাধ্যায়ের মধ্যেই পড়ে। নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ, এটাও স্বাধ্যায়ের মধ্যে পড়ে। তপস্যা হল, আপনার যে জীবনধারা, ওই জীবনধারাকে ওর মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এনার সবাই কিন্তু ছিলেন মীমাংসক। এনাদের ধারণা ছিল, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও তপস্যা যদি করা হয়, তাহলে তাঁরা উচ্চ উচ্চ স্বর্গে যাবেন। সেখানে ভোগ করার পর *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, শুভকর্মের ভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার স্বর্গলোক থেকে নিচে নেমে আসবেন। কিন্তু ওই নিচে নেমে আসাটা এত লম্বা ব্যবধানে হবে যে, নিচে নেমে আসা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। সেখান থেকে মীমাংসকরা এসে গেলেন ব্রহ্মলোকের ধারণাতে। হিন্দুদের যে ট্রাডিশানাল ধর্ম, এখনও আমরা বাড়ি বাড়ি যে ধর্ম পালন করি, এটা মীমাংসকদের থেকে আসছে, বেদান্ত থেকে না। কারণ পূজা, অর্চনা, আচার বিধি, এগুলো সব মীমাংসা থেকেই আসে।

মীমাংসকরা ঈশ্বরের দিকে তাকানও না, ঈশ্বরকে মানেনও না, তাঁদের কাছে বেদ শেষ কথা। এই বেদই হল শব্দব্রহ্ম। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, ভগবান শব্দ দেন। এই শব্দই বেদ। সেইজন্য বেদকে ভগবান বলা হয়। যার জন্য বলা হয়, যা কিছু এই জগতে আছে, সব বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে যদি দেখা হয়, ভগবান ভাবগুলো দিয়ে রেখেছেন। আপনি যখন সাধনা করবেন, আপনি যখন ধ্যান করবেন, ধ্যানের গভীরে যাবেন, তখন সেই সত্যগুলো আপনার কাছে এসে যাবে। তার মানে মীমাংসকদের জন্য, এই ঋষিদের জন্য শব্দব্রহ্মই হল শেষ কথা।

বেদান্ত কিন্তু শব্দব্রহ্মকে শেষ কথা রূপে মানছেন না। বেদান্ত বলছেন, তুমি ঠিকই বলছ যে, শব্দব্রহ্ম বলতে বেদ। শুধু বেদ না, মীমাংসকরা বলছেন, এই শব্দব্রহ্মের মুর্ত রূপ হল যজ্ঞ বা স্বাধ্যায়, তপস্যা যদি মিশিয়ে দেওয়া হয়; এর বাইরে আর কিছু নেই। বেদান্ত এখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে যান, বেদান্ত বলেন যে, যেমন গীতাতে বলছেন *শব্দব্রহ্মাতি বর্ততে*, শব্দব্রহ্মের পারে চলে যাওয়া। এখানে এসে মীমাংসক আর বেদান্তের মত পাল্টাতে শুরু হয়ে যায়। *শব্দব্রহ্মাতি বর্ততে*, শব্দব্রহ্মকে পেরিয়ে যান, অর্থাৎ পরমাত্মার কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। তখন *পুনরাবর্তিনোহর্জুন*, বারবার যে এই লোক

থেকে সেই লোক ঘুরতে হচ্ছে, এই ঘোরাঘুরিটা আর থাকে না। ফলে মীমাংসা আর বেদান্তে বিরাট তফাৎ এসে যায়।

বেদান্ত শব্দব্রহ্মকেও মানেন, বেদকেও মানেন। তার থেকে যেটা বেশি, তা হল, হিন্দুদের একটা খুব নামকরা ফিলজফি হল ব্যাকরণ। আপনার বলবেন, ব্যাকরণ আবার কি করে ফিলজফি হবে। যাঁরা ঠিক ঠিক বৈয়াকরণ তাঁরা নিজেদের ফিলজফার রূপেই দেখেন। আমরা যে অর্থে গ্রামার বা ব্যাকরণ রূপে নিই, এনারা ওই ভাবে নেন না। আমাদের স্বামী মোক্ষদানন্দজী খুব নামকরা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, উনি নিজে ব্যাকরণের বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। একবার আমি আমার ছেলেমানুষি স্বভাব থেকে বলেছিলাম, 'ব্যাকরণ পড়ে কি হবে? বারো বছর লাগবে ব্যাকরণ পড়তে, সেটা শেষ করে সংস্কৃতে ঢুকবে, সেখান থেকে প্রকরণগ্রন্থ, বিবেকচূড়ামণি আদি পড়তে হবে, বেদান্ত আর কবে পড়বে'? উনি তখন হেসে বলেছিলেন, 'জিনিসটা তা না, ব্যাকরণ পুরো দর্শন; আর পতঞ্জলির ব্যাকরণের উপর যে মহাভাষ্য আছে, সেটা দর্শনশাস্ত্র পড়তে গেলে পড়ানো হয় এবং পড়তে হয়। পতঞ্জলির এই মহাভাষ্যে বিভিন্ন যে দর্শনগুলো আছে, তার পুরো আলোচনা রয়েছে, এটাও মানুষকে ঈশ্বরদর্শনের দিকে নিয়ে যায়'। মহারাজের এই কথাগুলো ছিল আমার জন্য চোখ খুলে দেওয়ার মত জ্ঞান। এইজন্যই বলা হয় যে, নিজে বইটই পড়ে হয় না, আচার্যের সঙ্গ না করলে বোঝা যায় না। তা নাহলে নিজের মনের একটা ধারণার গর্তে বসে আছেন, আর মনে করছেন আমি সব জেনে ফেলেছি, আমি সবজান্তা হয়ে গেছি।

বেদান্তে শব্দব্রহ্ম আর পরমব্রহ্মে যে তফাৎ করছেন, পূর্বমীমাংসা পরমব্রহ্ম বলে কিছু মানে না। ব্যাকরণ খুব ইন্টরেস্টিং, ওনারা বলছেন, এই শব্দব্রহ্মটাই পরমব্রহ্ম। এখানে দেখা যাচ্ছে, কতগুলো ধাপ এসে যাচ্ছে; শব্দব্রহ্ম এত সহজ নয়। যাঁরা আগে কথামৃতের এই অংশটা পড়েছেন, তাঁরা মনে করেছেন, বাঃ কি সুন্দর কথা। কিন্তু ওইটুকু না, জিনিসটা রীতিমত খুব গভীর। হিন্দুদের যে বাস্তবিক ধর্ম, বেদের ধর্মে পরমব্রহ্ম বলে কিছু মানবেই না, সেখানে শব্দব্রহ্মই শেষ কথা। কারণ বেদে যেটা বলা হয়েছে সেটাই শেষ কথা, বেদ হল শব্দব্রহ্ম। সেইজন্য বেদে যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও তপস্যা, এটাই শেষ কথা। ঋষিরা এটাই করতেন – যজ্ঞ, স্বাধ্যায় আর তপস্যা। কিন্তু বনে জঙ্গলে যে ঋষিরা থাকতেন, তাঁদের বেশি শিষ্য আদি ছিল না, যাঁরা গভীর সাধনাতে ডুবে থাকতেন; তাঁরা কিন্তু এই জিনিসটাকে দেখলেন –শব্দব্রহ্মের একটা সীমা রয়েছে, সীমার পারে হলেন পরমব্রহ্ম। বৈয়াকরণরা বলছেন, সচ্চিদানন্দ যেমন সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এটা হল সেই যে ব্রহ্ম, তাঁর এক-একটা দিক। রামানুজাচার্য সৎ, চিৎ, আনন্দকে গুণ রূপে নিলেন। ঠিক তেমনি ব্রহ্মের যে গুণ এটা হল শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম যা ব্রহ্মও তাই। অর্থ হল, শব্দব্রহ্ম হল শেষ কথা, বৈয়াকরণদের মতে। মীমাংসকদের মতেও তাই শব্দব্রহ্ম শেষ কথা।

একমাত্র বেদান্ত এটাকে মানে না, এনারা বলেন, না, *শব্দব্রহ্মাতি বর্ততে*। ঠাকুর বেদান্ত মতের, ঠাকুর এটাই বলছেন –নাদ ভেদ করে কেউ কেউ তাঁর কৃপায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ পায়। ওঁএর 'অ' 'উ' এবং 'ম' যে ধ্বণিগুলি বেরোচ্ছে, এই তিনটে ধ্বণির মধ্যে সমস্ত রকমের শব্দ বাঁধা। নাম আর নামী অভেদ, সেইজন্য সমস্ত শব্দের মধ্যে সমস্ত বস্তু বাঁধা। সমস্ত শব্দ, সমস্ত বস্তু, সমস্ত ভাব মিলে শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তি হল নাদ। যদি কেউ প্রচুর জপধ্যান করেন, ঠাকুরের যদি কৃপা হয় তাহলে তিনি এই নাদ ধ্বণি শুনতে পারবেন। আমাদের একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন, ওনার কানে কিছু একটা সমস্যা ছিল। মহারাজকে নিয়ে সবাই খুব মজা করতেন। একদিন উনি মহন্ত মহারাজকে গিয়ে বলছেন, 'আমার কানে সব সময় ভোঁ ভোঁ আওয়াজ চলে'। ওনাকে সব মহারাজরা মজা করে বলতেন, 'আপনি কত উচ্চ মাপের মহারাজ, সব সময় নাদধ্বণি শুনতে পান, আমরা তো এত জপধ্যান করেও শুনতে পারলাম না। আপনার তো অনেক সৌভাগ্য'। যাই হোক পরে ওনার চিকিৎসা করা হয়েছিল। কোন যোগসিদ্ধি হয়েছি কি হয়নি বোঝার আগে আপনারাও একটু ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন। এই জিনিসগুলো খুব গভীর ও উচ্চস্তরের ব্যাপার। অনেক জপধ্যান করলে কিছু কিছু অনুভূতি হয়। কিন্তু

সেই অনুভূতিগুলোর বিরাট কিছু দাম নেই। এতে এটুকু বোঝা যায় যে, আপনি ঠিক পথ আছেন। কিন্তু মাঝখান থেকে মাথা খারাপের মত অনেক কিছু এসে যায়।

খুব সংক্ষেপে আমরা শব্দব্রহ্মের একটা আলোচনা করলাম, শব্দব্রহ্ম বলতে ওনারা কি বোঝান। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন, তিনি আইডিয়াস দিয়ে, ভাব দিয়ে সৃষ্টি করেন। সেই ভাবের অভিব্যক্তি হল শব্দ। এই অভিব্যক্তিটা বেদের, বেদ হল সমস্ত জ্ঞানরাশি, সেইজন্য বেদ হল শব্দব্রহ্ম। আবার যোগের দিক থেকে যদি যাওয়া হয়, যে জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে বলছেন শব্দব্রহ্ম, যেটা খ্রীশ্চানরাও বলছেন। আবার তন্ত্রমতে বলছেন, শিব আর শক্তি এক। সৃষ্টি যখন হয় তখন স্পন্দন হয়, স্পন্দন যদি না হয় তাহলে সৃষ্টি হবে না। এই স্পন্দনটাই শব্দব্রহ্ম। শিবের ডমুরু সব সময়ই বাজছে, শিবের ডমুরু যদি থেকে যায়, সৃষ্টি থেমে যাবে। এই যে সৃষ্টি যেটা চলছে, এটাই হল শব্দব্রহ্ম।

এই অনাহত ধ্বণি আর শব্দব্রহ্ম, ঠাকুর এই দিকটাকে নিয়ে এখানে বলছেন না, শব্দের যে প্রতিপাদ্য, যেটা একটা জিনিসের দিকে নির্দেশ করছে, সেটার দিকে ঠাকুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। রাজযোগে বলছেন, *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*। *ওঁ* হলো *তস্য বাচকঃ*, সেই যে ঈশ্বর, তাঁর বাচক। বাচ্য ও বাচকের তফাৎ আছে। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, সিদ্ধি সিদ্ধি বললে তো আর নেশা হবে না। সিদ্ধি গায়ে মেখে নিলেও নেশা হবে না। সিদ্ধিকে বেটে তৈরী করে খেতে হবে। ঠিক তেমনি, এই যে মন্ত্রজপ করা হয়, মন্ত্রের যে ভাব সেটার উপর ধ্যান করতে হবে, শুধু জপ করে গেলে হবে না। যাঁরা শিবমন্ত্র পেয়েছেন, শিবমন্ত্র বলতে কি বোঝাচ্ছে, শিবের উপর যদি ধ্যান না করা হয়, কেবল মন্ত্র জপ করে গেলে কিছুই হবে না। টিয়া পাখিকে শিখিয়ে দিলে সেও *ওঁ নমঃ শিবায়* বলতে থাকবে, তাই বলে কি টিয়া পাখির মুক্তি হয়ে যাবে? কখনই হবে না। জপাৎ সিদ্ধির কথা যে বলা হয়, সেখানেও যতক্ষণ ওই ভাব সৃষ্টি না হয়, মন্ত্রের যে প্রতিপাদ্য, মন্ত্রের যে ভাব, তাতে যতক্ষণ অবস্থান না করা হয়, সিদ্ধি হবে না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন –শুধু শব্দ হলে তো হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না।

তার মানে, এই যে মীমাংসকদের মত, যাঁদের কাছে বেদ হল শেষ কথা, যাঁদের কাছে শব্দব্রহ্ম শেষ কথা; ঠাকুর এটাকে মানছেন না। ঠাকুর বলছেন, অশব্দব্রহ্ম, মৈত্রেয়ী উপনিষদের যে কথা বলা হল, এই যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা, যাকে শব্দব্রহ্ম বলা হচ্ছে, এটা হল বাচক; যাঁর প্রতিপাদ্য হলেন ঈশ্বর। বলছেন, এনার ঋষিদের মত। এখানে সেইসব ঋষিদের কথা ঠাকুর বলছেন, যাঁরা স্বাধ্যায়, তপস্যা ইত্যাদি করে নিজেকে শুদ্ধি করে যাচ্ছেন। আমরা আজকে যে রূপে ঈশ্বরকে মনে করি, ওনারা তখন এই রূপে নিতেন না। এই রূপের ধারণাটা পরে এসেছে। ওই শব্দই ব্রহ্ম যখন বলছেন, তখন তিনি কিছুটা পূর্বমীমাংসা, কিছুটা বৈয়াকরণ, সবকিছুকে মিলিয়ে বলছেন। পরমব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম, এগুলো পুরোটাই যুক্তিতর্কের বিষয়।

ঋষিদের কি মত ছিল? ঠাকুর বলছেন –**ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন, 'হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই'। রাম এই কথা শুনে হেসে চলে গেলেন**। এই জায়গাতে এসে পুরো টপিকটা পাল্টে গেল। আমরা এতক্ষণ শব্দব্রহ্ম নিয়ে যে আলোচনা করছিলাম, এখানে এসে ঠাকুর চলে গেলেন নিরাকার সাকারে। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই যে অবতার হয়ে আসেন, এটাকেই ঠাকুর এখানে বোঝানর জন্য বলছেন। সেখান থেকে ঠাকুর অবতার তত্ত্বে চলে আসছেন। আজ ঠাকুরের জন্মদিন পালন হচ্ছে, জন্মোৎসব পালনের মধ্যে এই ভাবটাই এখানে সৃষ্টি হয়েছে, কি সেই ভাব; ভাবটা হল ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করে নরলীলা করেন, ভাবটা হল সেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করা।

কেদার – ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন। কেদার চাটুজ্যে তিনি সাধন-ভজন করতেন, কিন্তু কেমন একজন সাধারণ মানুষের মত শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে ঋষিদের পুরো

সম্প্রদায়কে এক কথায় উড়িয়ে দিলেন –ঋষিরা বোকা ছিলেন। কেদার চাটুজ্যে কি বোঝেন রাম জিনিসটা কি? আজকে আমরা পরম্পরায় ঠাকুরকে অবতার বলে জেনেছি, পরম্পরায় ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে আসছি। কিন্তু আমরা ঠাকুরকে কতটুকু বুঝি? তখনকার দিনে যাঁরা ঠাকুরকে মানতেন না, তাঁদের এক কথায় 'বোকা' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেদার চাটুজ্যের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরভাবে) –আপনি এমন কথা বলো না। সাবধান করে দিচ্ছেন। কথামৃতে ঠাকুরকে গম্ভীর হতে খুব কম দেখা যায়, একবার দুবার হয়েছেন। ঠাকুর কখন রেগে যাচ্ছেন, আবার কখন মজা করছেন, ওর মধ্যেই সার কথাগুলো বেরিয়ে আসছে; কিন্তু গম্ভীর খুব কম হতেন।

এই কথা আমি প্রায়ই বলি, বর্তমানের কালের শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের লিবারাল বলে, মার্ক্সিস্ট বলে; এনারা ধর্মকে আফিং বলে মনে করেন, সেইজন্য বলেন ধর্মের কোন দরকার নেই, অর্থাৎ এনারা এক কথায় ধর্মের আট হাজার-দশ হাজার বছরের এই পরম্পরাকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। ঋষিরা একটা আইডিয়াকে ধরে নিয়ে ওটাতেই নিজের জীবনকে পুরোপুরি ঢেলে দিয়েছেন। মন তাঁদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ পবিত্র এবং কোন কিছুতেই কোন স্বার্থ নেই তাঁদের। নিজের দেহমনের জন্য ঋষিদের কোন কিছুর চাহিদা নেই। ঋষিদের আছে শুধু এই তিনটি জিনিস –তপস্যা, পবিত্রতা আর বিদ্যা। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ শুরুই করছেন এই দুটি শব্দ দিয়ে –*তপঃ স্বাধ্যায় নিরতম্*। এই রকম উচ্চ আদর্শে সমর্পিত ঋষি-সমাজকে এক কথা দিয়ে পুরো উড়িয়ে দিচ্ছেন –ঋষিরা বোকা ছিলেন।

যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। (সকলের হাস্য) যার যেমন রুচি। ঠাকুরের খুব প্রিয় উপমা। এখন জানিনা মায়ের মাছকে এতভাবে রান্না করেন কিনা।

ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। বাল্মীকি রামায়ণের কথায় আমরা যে ঋষিদের কথা বললাম, সেখান থেকে যদি মহাভারতে চলে যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে সেখানে ঋষিরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইছেন। জ্ঞানযোগের যে পথ, ঋষিরা সেই পথের পথিক, তাঁরা অবতারকে মানেন না। কিন্তু শব্দব্রহ্মের যে আলোচনা করা হল, সেখানে অবতার শব্দটা আসে না। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে শব্দব্রহ্ম অবতার রূপে খ্রীশ্চানিটিতে আসে, যেখানে বলা হল the Word, এই Wordএর সাথে খ্রাইস্টকে এক করা হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুকে যদি নেওয়া হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি সেই অবতার, তিনি হলেন সেই শব্দের প্রতিপাদ্য; যদি পুরো জিনিসটাকে মেলাতে হয়।

বলছেন, **আবার ভক্তেরা অবতারকে চান –ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য**। সবাই জ্ঞান পথে থাকতে চান না, ঠাকুর বলছেন, যার যেমন পেটে সয়, যার যেমন রুচি। কথামৃতেই আমরা দেখছি, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন –এখন আমার ভাব পাল্টাচ্ছে। রোমা রোঁলা, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, ওনার বোনও বিদুষী মহিলা ছিলেন। বোন ভারত নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। রিসার্চের কাজে লাগতে পারে মনে করে লাইব্রেরিয়ান ওনাকে ঠাকুরের উপর একটা বই দিলেন। বইটা পড়ে তিনি চমকে উঠেছেন। তিনি তখন নিজের ভাই রোমা রোঁলাকে বইটা পাঠালেন। বইটা পড়ার পর রোমা রোঁলার ঠাকুরের ব্যাপারে খুব আগ্রহ জন্মাল, তারপর তিনি ঠাকুর, স্বামীজীকে নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন। পরে তিনি ঠাকুরের জীবন ও স্বামীজীর জীবন নিয়ে দুটি খুব সুন্দর মূল্যবান বই রচনা করলেন। ব্যক্তিগত ভাবে ঠাকুরের উপর আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল লীলাপ্রসঙ্গ, তারপরেই রোমা রোঁলার এই বই। যদিও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বইটা লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব গভীর বই।

সেখানে রোমা রোঁলা খুব সুন্দর কথা বলছেন –পাঁচ হাজার বছরের হিন্দুদের যে আধ্যাত্মিক ইতিহাস পুরোটা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সমাহিত। ওই যে পঞ্চাশোর্ধ আয়ুকাল, তার মধ্যে পুরো হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ইতিহাস সন্নিহিত। কথামৃত আর লীলাপ্রসঙ্গ একসাথে মিলিয়ে পড়ে নিন, তার মধ্যে পুরো ধর্মের ইতিহাস পেয়ে যাবেন। ফলে ঠাকুরের ভাব পাল্টাবেই, আলাদা আলাদা সাধনা থাকতেই হবে। যদি তা না থাকে, তাহলে পুরো আধ্যাত্মিক যে ইতিহাস, সেটা পাওয়া যাবে না। যার জন্য ঠাকুর কখন শৈব মতে, কখন বৈষ্ণব মতে আবার কখন শাক্ত মতে ও বেদান্ত মতে, সমস্ত মতের সাধনা করছেন। সেইজন্য ঠাকুর সব মতের সব কিছুকে নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। ফলে তিনি এটাও বুঝতে পারতেন কখন কে কি মতের কথা বলছে।

এখানে যে ঠাকুর বলছেন – ওনার জ্ঞানীর মত, এখনও আপনি যদি হিমালয়ে যান, দেখবেন সেখানে যাঁরা সত্যিকারের সাধু, যাঁরা উপনিষদকে নিয়েই থাকেন, তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই মানেন, অবতার তত্ত্বে তাঁরা নামতে জান না। অবতার হয়ত আছেন, কিন্তু আমার লাগবে না। বিল গেটসের এত এত টাকা আছে, তাতে আমার কি; অবতার আছেন তো আছেন, তাতে আমার কি। আবার যাঁরা অবতারকে ভক্তি করেন, তাঁরা বলবেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আছেন তাতে আমার কি। আমি আমার মাকে ভালবাসি, মা আমাকে যেমনটি রাখবেন। ঠাকুর বেড়াল ছানার কথা বলছেন, বেড়াল তার ছানাকে যেখানে রাখে ছানা তাতেই খুশি। এগুলো রুচি ভেদ।

হিন্দু ধর্মের ঠিক ঠিক মত কি, এটা যদি জানতে হয়; ঠাকুরকে না পড়লে জানা যাবে না। বেদ পড়ে আপনি বার করতে পারেন হিন্দুদের এই মত, উপনিষদ পড়ে বলতে পারেন, এই মত; কিন্তু যতক্ষণ ঠাকুরকে না পড়া হবে, ততক্ষণ কারুর পক্ষে বলা সম্ভবই না, ঠিক ঠিক হিন্দু মত কি। সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য একটা চটি বই আছে, ওটা সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছেই থাকে; সেখানে স্বামীজী বলেছেন –সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ঠাকুরের জীবন আদর্শ দিয়ে হবে। ঠাকুরের জীবন হল শাস্ত্র প্রমাণ – এটাই শাস্ত্র। সেইজন্য কেদার চাটুজ্যে যেটা বলছেন বা দক্ষিণেশ্বর নিবাসী যেটা বলছেন, এটা ভুল। কারণ ঠাকুর তাঁদের কথা খণ্ডন করে দিচ্ছেন।

বলছেন, **তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়**। ঠাকুর এবার আস্তে আস্তে অবতার তত্ত্বে নিয়ে যাচ্ছেন। শব্দব্রহ্ম পিছনে পড়ে থাকল, চলে এলেন অবতার তত্ত্বে। **পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য যেন উদয় হল**। এটা অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা, এবং বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের বর্ণনা দেওয় হয়। ধরুন কোন সভাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসবেন, প্রধানমন্ত্রী আসবেন জেনে সবারই মন এমন ভাবে তৈরী থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীকে দেখার পর মন থেকে বাকি সব কিছু নেমে যায়। ঠাকুর এখানে ব্যাখ্যাটা পুরো অন্য রকম দিচ্ছেন।

তবে সভাসদ্ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর –তাঁর জ্যোতিঃ জড় জ্যোতিঃ নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হল। এই যে বাক্য –রামচন্দ্র আসার পর সভায় শত সূর্যের উদয় হল –ওটা একটা অন্য অর্থে দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে ঠাকুর অন্য অর্থে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সূর্যের এত তেজ ও রশ্মি, এমন জ্বলজ্বল করছে, যে পদ্মফুল পর্যন্ত আলো পৌঁছাত না, এটা অবশ্য হবে না; আমরা বোঝানর জন্য একটা উপমা নিচ্ছি, সেটাও যেন আলো পেয়ে গেল। আলো পেয়ে গেল, তার যে ফটো সেন্সর, সেটার জন্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। যেমন চাঁদের আলোতে পদ্ম ফুটবে না, সূর্যের পাওয়ারফুল আলো এলে পদ্ম ফুটবে। আর যদি শত সূর্য হয়, তাহলে যেখানে কখন আলো পৌঁছায় না, সেখানেও আলো পৌঁছে যাবে। যাঁরা ধ্যান করেন, যাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আদি হয়েছে বা হয়ে থাকে; অনেক বছর জপধ্যান করে যাঁদের জ্যোতিদর্শন হয়, এই জ্যোতিদর্শনটা কল্পনার জ্যোতি না, আর টিউবলাইটের জড় জ্যোতি না, এটা চেতন জ্যোতি। এমনি হাজার ভোল্টের আলোতে চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু জ্যোতিদর্শন হলে ওই জ্যোতির আলোতে চোখ ঝলসাবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়ে মন অন্তর্মুখ হইল। 'হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিতে হইল'। –এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ। ঠাকুরের এই কথাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে রোমা রোঁলা বলছেন – আমরা কি এই যুগেই বাস করছি, না অন্য কোন যুগে; এগুলো বিশ্বাস হয় না। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনারা ভক্ত, আপনাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি আছে; কিছু না হোক কথাটাও অন্তত মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু যাদের মধ্যে এই ভাবনা নেই, তারা বলবে রোগ ছিল, এই ছিল, সেই ছিল বলে কাটিয়ে দেবে। রোমা রোঁলা দুটোর মধ্যে কোনটাই নন, তিনি ভক্তও নন; তিনি আবার যে বিশ্বাস করেন না, তাও না। সেইজন্য তিনি অবাক হয়ে বলছেন –আমরা এটা কোন যুগের কথা শুনছি? একশ বছর আগে এই জিনিস এই কলকাতা শহরের পাশে দক্ষিণেশ্বরে হয়েছে? শুনে মনে হয় কবেকার কথা, পাঁচ হাজার, সাত হাজার বছর আগে ঋষিরা এ-রকম ছিলেন। কিন্তু তাতো না, এখানেই এই ঘটনা হয়েছে কয়েক বছর আগে। শুধু বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র সভায় এসেছেন শত সূর্যের উদয় হল, আর সবার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ। এই ভাবগুলি একটুও যদি কারুর হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন তিনি বুঝবেন জিনিসটা ঠিক কি। পড়লাম, পাঠ করলাম; এগুলো তা নয়। অনেক সময় শুনে অনেকে চোখের জল ফেলতে শুরু করেন, পুরো ইমোশানালিজম্।

একজন মহারাজের কথা শুনেছিলাম। মহারাজের পরিচিত একজন ওনার ঘরে গিয়ে দেখছেন উনি বসে আছেন, সামনে কথামৃত খোলা। চোখটা একদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে, হাল্কা একটু জলও বেরোচ্ছে। একজন ঘরে এলেন উনি বুঝতেও পারলেন না, যিনি এসেছিলেন তিনি দরজাটা আবার বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে আসা আর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোনটাই টের পেলেন না। এই যে ভাব, এখানে উনি অবাক হয়ে জিনিসটাকে অনুভব করছেন। হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত এই রকম একটা শব্দে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কল্পনার কিছু নেই, একটু ভিতরে অনুভূতি প্রবণতা আনতে হবে, ভিতরটা একটু সংবেদনশিল হতে হবে। সমস্যা হল আমাদের মধ্যে সংবেদনশীলতা নেই। সারাটা দিন এই গৃহস্থ চর্চা করে, জগতের আবর্জনার চর্চা করে তার সাথে টিভি, সিরিয়াল, ফেসবুক করে করে মনটা হয়ে গেছে একেবারে অসংবেদনশীল, সহজ করে বললে বলতে হয়, একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে। ভোঁতা হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই জিনিসগুলিকে অনুভব করতে পারিনা, আমরা ব্লান্ট হয়ে গেছি। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর জন্য কত রকম বাজনা নিয়ে ওর কানের কাছে বাজাতে লাগল, তাও ঘুম ভাঙল না। আমরাও ঠিক ও-রকম হয়ে ভোঁতা হয়ে গেছি। খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যদি না বলা হয়, কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে হরিবোল হরিবোল করলে তখন আমাদের মনে হয় একটা কিছু হচ্ছে। একটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে একটা ফুলের উপর গিয়ে বসল, ফুলটা নড়ল কি নড়ল না, এটা যেন আপনার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। আপনি এমন ডুবে আছেন, প্রজাপতি যে ফুলের উপর বসল, সেটা দেখে আপনার মনে হল আপনার গায়ের উপর একটা বোঝা এসে পড়ল। তখন বুঝতে হয় একটু সংবেদনশীলতা আপনার এসেছে।

ঠাকুর সমাধিমন্দিরে। ভগবানদর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল! সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায়। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য। মৃগীরোগীরা মাটিতে পড়ে যাবে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, আর চেহারাতে একটা বেদনার ছাপ থাকবে। ঠাকুরের কোনটাই নেই, মধুর হাসি। **ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, অবাক্; একদৃষ্টে এই অদ্ভুত প্রেম রাজ্যের ছবি, এই অদৃষ্টপূর্ব সমাধি-চিত্র সন্দর্শন করিতেছেন**।

এই পুরো আলোচনা কত সময় লেগেছে, খুব জোর পাঁচ থেকে সাত মিনিট –শব্দব্রহ্ম, ঠাকুর একটু বললেন, শ্রীরামচন্দ্র এসে গেলেন, শ্রীরাম থেকে সভা, সভা থেকে হৃৎপদ্ম, ঠাকুর সমাধিস্থ। দু-মিনিট আগে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরবাসীকে লক্ষ্য করে বলছেন –ওঃ বুঝেছি, ওর ঋষিদের মত। সরাসরি

বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তোমার ধারণাটা ভুল। সেখান থেকে কয়েকটা বাক্য বলতে না বলতে মন চলে গেল সমাধিতে।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল।

ঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া 'রাম' এই নাম বারবার উচ্চারণ করিতেছেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। এখানে কোন ইমোশান নেই। সমাধি অনেকক্ষণ ছিল, চুপ করে দু-চার মিনিট বসে আছেন তা না; বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি) –অবতার যখন আসে, সাধারণ লোক জানতে পারে না –গোপনে আসে। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার –এ-কথা বারজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি'। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ধরণের কথা নেই, অন্য কোন রামায়ণে থাকতে পারে। আর বাল্মীকি রামায়ণেও এ-রকম কিছু নেই। তুলসীদাসের রামচরিতমানসেও নেই। দক্ষিণেশ্বরে অনেক সাধুরা আসতেন, ঠাকুর হয়ত তাঁদের কাছে শুনেছিলেন বা অন্য কোন রামায়ণে থাকতে পারে, আমার জানা নেই।

কিন্তু বক্তব্য হল, অবতারকে আমরা কিভাবে জানব? এই প্রশ্ন অনেকবার আসে। অবতারকে জানার একটাই পথ –অবতারের শিষ্যকে ধরতে হয়, ফলেন পরিচিয়তে। অবতারকে জানা যায় না; আমি, আপনি অবতারকে চিনতে পারব না। অবতার নিজের মুখে বলেন –আমি অবতার। ফ্রড বাবাজীরাও তো নিজেদের অবতার বলে বেড়াচ্ছে। তাই বলা হয়, তাঁর শিষ্যদের আচার-ব্যবহার, চরিত্র দেখে বোঝা যায়। এই যে ঠাকুর যে কথাটা বললেন –দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। তাঁর অত কাছ থেকে দেখেছেন বলে জানেন, এবং ওনাদের জীবনটাও পরিবর্তন হয়ে যায়। যীশুর যে বারোজন শিষ্য, তাঁদের দেখে বোঝা যায় যীশু কি জিনিস ছিলেন। আপনার জীবন দেখে লোকেরা বুঝবে ঠাকুর কি রকম, কারণ আপনারা ঠাকুরের কথা শুনছেন কিনা। আপনার জীবন দেখে কেউ ইম্প্রেসড্ হয়েছে কি? কেউ কি বলছে, আমাকে এনার মতই হতে হবে? একবার ভেবে দেখবেন। ঠাকুর বলছেন, সাধারণ লোকেদের কথা ছেড়ে দাও, ঋষিরাও অবতারকে বুঝতে পারেন না, কারণ অবতার নিজেকে তাঁদের কাছে প্রকাশ করেননি। প্রথমে অবতার এসে দু-চারজনকে বলেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে ছড়াতে শুরু করে। ঠাকুরের সময়েই কজন আর তাঁকে অবতার বলে জানতেন।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। এটা আরেকটা লম্বা আলোচ্যে বিষয়। ভক্তি বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি, সাধনা করে নিজের ইষ্টের কাছে পৌঁছে যাওয়া। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেমন সামীপ্য, সারূপ্য ও সালোক্য; অর্থাৎ নিজের ইষ্টের লোকে বাস করা, তাঁর কাছে থাকা, তাঁর মত রূপ পাওয়া; এটাকে বলছেন মুক্তি। আবার আছে সাযুজ্য, ইষ্টের সাথে এক হয়ে গেল। ঠাকুর কিন্তু ইষ্টের সাথে এক হয়ে যাওয়াকে বিরাট কিছু বা শ্রেষ্ট বলে মনে করছেন না। মুক্তি এতে আপনার হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু পাকা ভক্তি যদি বলতে হয় তাহলে এই সচ্চিদানন্দ স্তরে গিয়ে আবার সেখান থেকে নেমে এসে ভক্ত আর ভক্তি নিয়ে থাকা। এ জিনিস প্রায় অসম্ভব। আপনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত করলেন, করার পর সেখান থেকে আপনি যতক্ষণ না নেমে আসতে পারছেন; বুঝতে হবে ঈশ্বরের উপরে ততক্ষণ আপনার পাকা ভক্তি নেই, ততক্ষণ জ্ঞানও নেই।

বিলাতে কুইন (রানী)-কে দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা, কুইন-এর কার্য –এ সকল বর্ণনা কর চলতে পারে। কুইন-এর কথা তখন বলা ঠিক ঠিক হয়। যিনি অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করার পর সারাক্ষণ ঈশ্বরকে নিয়ে আছেন, তিনিই ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা বলতে পারেন। বাকিদের ঈশ্বরীয় কথা

কিছু না। **ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, 'হে রাম,তুমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুত তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে'। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকাভক্তি**। এই অংশের পুরোটাই অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। ভরদ্বাজ মুনি জানতেন যে, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

আগের পরিচ্ছেদে কেদার চাটুজ্যে বলেছিলেন –ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন। ঠাকুর গম্ভীর হয়ে কেদার চাটুজ্যেকে বলছেন – আপনি এমন কথা বলো না। আজ রামনবমী, আমাদের কাছে আজকের দিনটা খুব শুভদিন। কথামৃত একটা ক্ষীরসাগরের মত, যেখান থেকেই তোলা হোক, সেই ক্ষীরই উঠে আসবে। কথামৃত নিত্য পাঠ করতে হয়। সকালে স্নানের পর জপধ্যানাদি থেকে উঠে কথামৃতের এক পাতা কি দু-পাতা পড়ার পর দৈনন্দিন কাজে নামা। কিংবা দুপুরবেলা বিশ্রাম আদি করে দ্বিতীয়বার কাজে নামবেন, সেই সময় দু-পাতা পড়ে নিলেন। নাহলে রাত্রে শোওয়ার আগে পড়লেন। এগুলো করলে চিন্তা-ভাবনা খুব গভীরে চলতে থাকে। মাস্টারমশাই নিজের মত বর্ণনা করছেন –

ভক্তেরা এই অবতারতত্ত্ব অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ –যাহাকে বেদে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছে –সেই পুরুষ আমাদের সামনে চোদ্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেকালে বলিতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে "রাম রাম" করিয়া এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে? নিশ্চয় ইনি হৃৎপদ্মে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন। এখন হৃৎপদ্মে রামরূপ দর্শন করা একটা জিনিস আর অবতারতত্ত্ব আরেকটা জিনিস। তবে আজকে রামনবমীর শুভদিনে রামনামে ঠাকুরের সমাধির কথা, খুব সুন্দর একটা মেলবন্ধন।

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও অন্যান্য অনেকে নামসংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারান্দায় উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংকীর্তন করিতেছেন।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি। তখন আবার সংকীর্তনের মধ্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়েমালা। ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধিনিমগ্ন। প্রভুর কখন অন্তর্দশা – তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য হইয়া পড়েন। কখন বা অর্ধবাহ্যদশা –তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যদশা –তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন।

এখানে তিনটি অবস্থার কথা বলছেন –অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। আগেও একবার আমরা এই তিনটি অবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তবে এই জিনিসগুলো সব সময় মনে থাকে না। একবার বুঝে নিলে ভাল। দ্বিতীয়বার শোনা মানে ওই জিনিসটাকে আরেকবার আউড়ে নেওয়া। অনেক আগে ১৯৮৭ সালে আমি তখন ব্রহ্মচারী, ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। পরমপূজ্যপাদ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, যিনি মঠের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন, তিনি আমাদের লীলাপ্রসঙ্গ পড়াতেন। ওনার পড়ানোর টেকনিক এত সুন্দর যে, পুরো বইটাই যেন মাথায় বসে আছে। এখনও লীলাপ্রসঙ্গ উল্টেপাল্টে দেখার সময় মনে পড়ে যায়, মহারাজ কখন কি বলেছিলেন। ওই সময় তিনি আমাদের কিছু লেখা লিখতে বলেছিলেন। আমাকে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব' এই বিষয়ের উপর লিখতে বললেন।

আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝি, উনি এই রকম ছিলেন, উনি এই রকম করতেন। অনেকটা লেখার পর একটু গভীরে গিয়ে লেখাটা নিয়ে চিন্তা করতে বসলাম। ক্লাশ সিক্স সেভেনে যে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়, অনেকটা সেই রকম লেখাটা হয়ে যাচ্ছিল; একটু উঁচু মানের কিন্তু ওই রকমই। স্বামী প্রভানন্দ আমার আচার্য, ওনার জন্য এই পেপারটা লিখতে হচ্ছে। মহারাজের সাথে লেখাটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি তখন আমাকে এই কথাটা বলেছিলেন, কথাটা আমার খুব সুন্দর লেগেছিল। পরে আমি যখন আমার 'পরম' বই লিখি, তখন এই জিনিসটার উপর রীতিমত একটা চ্যাপ্টার বানিয়ে দিলাম। মহারাজের কাছেই শেখা। আমি যে কথাগুলো বলি, বেশির ভাগ কথা মহারাজদের কাছেই শেখা। এনারা খুব উচ্চমানের আচার্য।

ব্যক্তিত্ব – personality শব্দটা এসেছে persona থেকে, এটি একটি লাটিন শব্দ। ইতালিতে রোম যখন সব দিক দিয়ে তুঙ্গে, সেই সময় রোমের আশেপাশের ভাষা লাটিন ছিল, পরে লাটিন ভাষাটা রোমও নিয়ে নেয়। একটা নামকরা প্রবাদ ছিল –All roads lead to Rome। তখনকার দিনে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগতের সব কিছুর কেন্দ্র ছিল রোম। বিশেষ করে জুলিয়াস সিজার, জুলিয়াস সিজারের পর অগস্ট্য সিজার, একটার পর একটা সিজাররা যাঁরা এলেন, তখন চারিদিক থেকে সব সম্পদ রোমে এসে জমা হতে শুরু হল। শুধু জুলিয়াস সিজারই বানিয়েছেন তা না, তার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু রোমান সভ্যতা অনেকদিন চলতে থাকল।

প্রাচুর্য হলে যা হয়, কলা, সংস্কৃতি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আসে। রোমে তখন অনেক সার্কাস হত, সার্কাসে নানা রকমের যুদ্ধটুদ্ধ হত; অনেক রোমান থিয়েটারসও ছিল, সেখানে বিভিন্ন ধরণের পারফরমেন্স হত। পরফরমেন্স করার সময় ওরা মাস্ক লাগিয়ে আসত। এখন আর মাস্ক লাগিয়ে হয় না, যদিও কুচিপুরী নৃত্যে মাস্ক লাগায়, কিন্তু মাস্কের ব্যবহারটা এখন উঠে গেছে। ওই মাস্ককে ওরা বলতেন Persona। পারফরমেন্স করার সময় ওরা চেহারার উপর মাস্ক লাগিয়ে দিত, এখন যেমন মেকাপ লাগানো হয়। মাস্কের লাটিন শব্দ হল Persona। সেখান থেকে এই শব্দ গ্রীক ভাষাতে আসে, বিভিন্ন ভাবে হয়ে হয়ে ইংলিশে এসে হয়ে গেলে Personality। যার জন্য personalityর অর্থ হয়, লোকটি আসলে যা, তার উপরে যেটা মুখোশ। আমার আপনার সবারই পার্সোনালিটি আছে। পার্সোনালিটি বলতে আমরা বোঝাতে চাই, উনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু পার্সোনালিটির আসল অর্থ হয়, কি মুখোশ নিয়ে আপনি ঘুরছেন। অফিসে যখন কাজ করতে যান, তখন আপনার এক ধরণের মুখোশ, বাড়িতে আর-এক ধরণের মুখোশ, বন্ধুদের সঙ্গে আর-এক রকমের মুখোশ। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব মানে শ্রীরামকৃষ্ণের কটি মুখোশ। এই কথাগুলো মহারাজের কাছেই শুনেছি।

মহারাজের এই কথাগুলো আর কথামৃতে মাস্টারমশাইর কথাগুলো, দুটোকে মিলিয়ে মহারাজের কথাগুলো আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছিল। কি সাংঘাতিক জিনিস! আমরা যখন কারুর পার্সোনালিট বর্ণনা করতে যাই; যদি গান্ধীজীর কথা বলি, তখন সত্য, অহিংসা এগুলোকে নিয়ে বলব; নেতাজীকে বলি একজন বীরপুরুষ ইত্যাদি। ঠাকুরের পার্সোনালিটি বলার জন্য স্বামী প্রভানন্দজী আমাকে যে দিশা নির্দেশ করলেন তা হল এই তিনটে –অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা।

ঠাকুর হলেন সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আমরা অবতার বলি আর যাই বলি, সবটাই না বুঝেই বলি। এই যে শুদ্ধ আত্মা, বেদে উপনিষদে যাঁকে শুদ্ধ আত্মা বলা হয়েছে, সেই শুদ্ধ আত্মার যে ভাব; ওই ভাবেতে ঠাকুর যখন ডুবে যাচ্ছেন –তখন এটা হল অন্তর্দশা। ওই অন্তর্দশাতে গিয়ে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে, নাকি সবিকল্প সমাধি হচ্ছে, এগুলো আমরা বলতে পারব না। অন্তর্দশায় তিনি রামের ভাবে ডুবে আছেন, নাকি কৃষ্ণের ভাবে ডুবে আছেন, না মা কালীর ভাবে ডুবে আছেন; আমাদের জানার কোন পথ নেই। শুধু এটুকু জানা আছে যে, এক হৃদয়রাম জানতেন আর শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, যদি এই এই লক্ষণ দেখ তাহলে এই দেবী বা দেবতার নাম করবে, তখন আমার মন ওই

অবস্থা থেকে বাহ্য জগতে নেমে আসবে। অর্থ হল, ঠাকুর কি ভাবে আছেন, রামের ভাবে আছেন নাকি কৃষ্ণের ভাবে আছেন, নাকি কালীর ভাবে আছেন, ওনার শরীরের লক্ষণ দেখে বোঝা যেত। কিন্তু তখনও ওই অবস্থায় অন্তর্দশা থেকে একটু নেমে আসার পরেও ওনার মন পুরো ডুবে থাকত ঈশ্বর তত্ত্বে বা আত্মতত্ত্বে বা ব্রহ্মের সঙ্গে একাকার হয়ে। এর বেশি আমাদের পক্ষে জানার উপায় নেই আর দরকারও নেই। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য।

অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা এই তিনটে শব্দ আমাদের বৈষ্ণব পরম্পরা থেকে আসে। মহাপ্রভুর যে বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাই, সেখানে এই তিনটে ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তাহলে ঠাকুর আসলে কি? ঠাকুর প্রত্যেকে অবস্থায় সেই শুদ্ধ আত্মা, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ওই ভাবে যখন তিনি আছেন, যেখানে তিনি তাঁর সঙ্গে এক, তা সে ভক্ত রূপেই হন, আত্মা রূপেই হন; এর বেশি আমাদের জানার কোন উপায় নেই, কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, তখন তিনি জড়বৎ। মনে হবে যেন একটা ছবি। ওই যে মুখোশ, ওই যে পার্সোনা, ওই পার্সোনার উপর যখন আর-একটি পার্সোনা লেগে যাচ্ছে, তখন তিনি আরেকটু জগতের দিকে চলে আসছেন। একটা লণ্ঠনের আলো বা যে কোন জিনিসের আলো, সেই আলোর উপর যখন একটা আবরণ দিয়ে দেওয়া হল, তখন আলোটা একটু পাল্টে যায়। তার উপরে আর-একটা আবরণ দিলেন, আলো আরেকটু পাল্টে গেল।

বেদান্তের দৃষ্টিতে আত্মা সব সময় নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখেন না। যখন নিজেকে বিনা কোন আবরণে দেখছেন, তখন তিনি জড়বৎ। কিন্তু যখন একটা আবরণ এসে যাচ্ছে, সেটাই তখন তাঁর কাছে জগৎ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর আর জগতে কোন তফাৎ নেই। আত্মা যখন শুধু আত্মাকেই দেখেন যখন নিজেকেই দেখেন –তখন এটাই ঈশ্বর। আত্মা নিজেকে যখন মন দিয়ে দেখেন, ওটাই তখন হয়ে যায় জগৎ। তাই ঈশ্বর আর জগতে কোন তফাৎ নেই। বিভিন্ন ধর্মে দেখবেন, আর আমরাও যেভাবে বুঝি তাতে আমাদের মনে হয় –ঈশ্বর একটা, জগৎ আর-একটা। তা নয়। আমি বসে আছি, সামনে দৃশ্য দেখছি; এমনি খোলা চোখে। কিন্তু যারা খালি চোখে দেখতে পারেন না, তাঁকে চশমা লাগাতে হবে। চশমা দিয়ে এক রকম দেখছেন। এবার চশমাতে একটা রঙিন কাঁচ লাগিয়ে নিলাম, তখন দৃশ্যগুলো অন্য রকম দেখাবে। কাঁচটা হল মন, এটাই জগৎ রূপে দেখায়। ওই আবরণ যদি খুব পাতলা আবরণ হয়, তখন মনে হয় যেন দুদিক থেকে আসছে –মনের জগৎটাও আসছে, অন্তর্জগৎটাও আসছে। ওই অবস্থায় ঠাকুর ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের ভাবে নৃত্য করছেন। বেদেও ঈশ্বরকে নর্তক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা নিয়ে বেদে স্তুতি আছে। কিংবা কোন গায়ক যখন ওই বিষয়ে ডুবে যান, বিশেষ করে লাস্য, নাচের একটা বিধি, যেখানে প্রেমের ভাব, ওই লাস্যে যখন ডুবে যাচ্ছেন, তখন প্রেমে হারিয়ে যান, কোন হুঁশ থাকে না। গানেও তাই হয়, এমন ডুবে যান যে কোন হুঁশ থাকে না। এই জিনিস শুধু ভারতবর্ষে না, বিশ্বের সব জায়গার গানে, সব জায়গার নৃত্যে হয়। একটা সাধারণ মন যখন নৃত্য করতে করতে, এক, দুই, তিন, চার স্টেপিং করে করে আস্তে আস্তে ওই জায়গাতে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে আর তার ভিতরে ওই ভাবটা আসছে।

ঠাকুরের তিনটে দশা কিন্তু সেভাবে হচ্ছে না, ঠাকুর স্বাভাবিক ভাবে অন্তর্দশার লোক। সেইজন্য যখন এই জগতের দিকে মন দিচ্ছেন তখন তাঁর অন্তর্দশার দিকে, আত্মাতে পিছুটান থেকে যাচ্ছে। আমার আপনার সবার পিছুটান সংসারের দিকে থাকে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের অবস্থার কথা ভেবে যদি ঠাকুরের অবস্থার কথা ভাবা হয় –ঠাকুরের কি কষ্ট, একবার ভেবে দেখুন তো। আপনি নিজে একটা নদের হাট বসিয়েছেন, যারা আপনার আপনজন, তাদের সঙ্গে বসে আনন্দে গল্প করছেন। কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে কোন দায়ীত্ব পালন করার জন্য, বা রান্নার কাজে ওই আনন্দের হাট ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে; তখন আপনার মনে কত বিরক্তির ভাব আসবে; কিন্তু আপনার কিছু করার নেই, আপনাকে ওটা করতেই হবে। মায়েরা অনেকে মিলে দুপুরবেলা অবসর সময় বসে গল্পগুজব করে আনন্দ উপভোগ করে। সেই সময় কোন মা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই দেখ দেখি ছেলেটা কেমন বিরক্ত

করছে যে, আমাকে এখন ওকে নিয়ে বাড়ি যেতেই হবে’। সেই মা আড্ডার আসর ছেড়ে যেতে চায় না, কিন্তু ছেলেকেও ছাড়া যায় না। এর থেকেও যদি বেশি তফাৎ করে দেওয়া হয়, যেখানে ওই অন্তর্জগতের দাবি না মিটিয়ে যাবে না, কিন্তু বহির্জগতে গিয়ে বহির্জগতের দাবিকে একটু দাবিয়ে দিতে হচ্ছে; কি কষ্ট। ঠাকুর বলছেন, সংসারীদের সঙ্গে বিষয়ীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে যখন আরেকটা আবরণ আসছে, তখন বাহ্যদশা। মাস্টারমশাই বাহ্যদশার বর্ণনা করছেন –**তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন**। শুধু সংকীর্তনাদি না, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গও করতেন।

খুব মজার জিনিস, যাঁরা ঠাকুরকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, অনুধ্যান করেছেন; দেখবেন, এই তিনটি ছাড়া ঠাকুরের অন্য আর কোন অবস্থা নেই। আমরা পার্সোনালিটি বলতে যেটা বুঝি, বা লাটিন শব্দ ‘পার্সোনা’ যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে দেখা যাবে –আমি সমর্পণানন্দ, আমি বিভিন্ন মুখোশ ধারণ করি; যার জন্য কারুর কাছে আমি ভাল, কারুর কাছে মন্দ। কিন্তু ঠাকুরের জীবন যদি দেখি, তিনি সব সময় সেই এক। নরেনের সামনে এক রকম, হৃদয়ের সামনে আরেক রকম, কখনই তা দেখা যাবে না –সব জায়গায় তিনি সমান। হয় তিনি অন্তর্দশায়, নাহলে অর্ধবাহ্যদশায়, তাও নাহলে বাহ্যদশায়। তিনি কার সামনে আছেন তাতে কিছু আসে যায় না। মথুরবাবু আর অন্যান্যরা আছেন তাঁদের সামনেই সমাধি হয়ে যাচ্ছে, ওনার তাতে কিছু আসে যায় না কে কিভাবে দেখছে। মাস্টারমশাইর বর্ণনাতে আছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, ঘরে ঢুকে দেখছেন ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় আছেন, ডুবে যাচ্ছেন সমাধিতে। মাস্টারমশাই বুঝতে পারছেন না কি হচ্ছে। এই তিনটের কোন একটার মধ্যে তিনি থাকতেন, চতুর্থ কোন অবস্থা ঠাকুরের নেই।

আমরা জানতে চাইতে পারি, ঠাকুরের মানবচরিত্রের কি কি চারিত্রিক গুণ ছিল? কিন্তু সেগুলো তাঁর পার্সোনালিটি না। পার্সোনালিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি ট্রেডস্, চারিত্রিক গুণ, এগুলোর কোন কিছুই ঠাকুরের নেই, ঠাকুরের এই তিনটিই আছে –অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। যখন তিনি বাহ্যদশায়, তাঁর কাছে সবাই ভক্ত, সবাই ঈশ্বরীয় কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন। যদিও আমরা দেখি বিভিন্ন লোকজন আসছেন, তাঁদের সাথে হাসিমজা করছেন, আরও অনেক কিছু করছেন। কিন্তু ঘুরেফিরে দেখা যাবে তিনি সব প্রসঙ্গকে টেনে ঈশ্বরীয় কথাতে নিয়ে ফেলে দিচ্ছেন। সংকীর্তন করুন, কথা বলুন, যাই করুন, ঘুরেফিরে তিনি ঈশ্বরের কথায় চলে যাচ্ছেন। এই হল পার্সোনালিটি অফ্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব।

ঠাকুর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধ চৈতন্য – তার উপর একটা একটা করে এই তিনটে আবরণ আসছে। আমরা মানুষ রূপে নিজেকে নিয়ে বলি, আমার সত্য কি? –For all practical purposes আমি হলাম একজন মানুষ। এই মানুষের উপর আমি বিভিন্ন মুখোশ লাগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের উপর এই তিনটে অবস্থা খাটে না। তাহলে কি আমরা বাহ্যদশাতেই আছি? তাও না, কারণ বাহ্যদশাতেও ঠাকুর সেই শুদ্ধ আত্মাতেই বাস করছেন। কখন পুরো ডুবে আছেন, আবার যখন অল্প একটু ডুবে আছেন তখন মাতালের মত, একটা নেশার ঘোরের মত। যাঁদের অনেকক্ষণ ধ্যানাদি করার অভ্যাস আছে, যখন এটাকে নিয়ে চিন্তা করবেন তখন খুব মধুর লাগবে, তখন মনে হবে আমি আর ঠাকুরে কি তফাৎ? এই তফাৎ, ঠাকুরের যে পার্সোনালিটি, ঠাকুরের উপর যে মাস্কগুলো লেগে, যে পার্সোনা লাগানো আছে, এই জায়গাতে আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের কোন মিল নেই।

আমরা মুখের কথা বলি, ঠাকুর ভগবান; আমরা বলি, ঠাকুর অবতার; এটাও আমাদের মুখের কথা। ঠাকুরের পার্সোনালিটিতে আর আমাদের পার্সোনালিটিতে একটা মৌলিক তফাৎ হল, আমরা যে জায়গায় আছি, ঠাকুর সেখান কখন নামছেন না। ঠাকুর যেখান থেকে নামছেন, আমরা কেবল প্রার্থনা করতে পারি, হে প্রভু কৃপা করে তুমি তোমার হাতটা বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে তুলে নাও। এই বাহ্যদশাতে যেখানে ঠাকুর সবচেয়ে বেশি নেমে আসছেন, সেখানেও আমাদের যাওয়া খুব মুশকিল।

আমরা যে অনেক খেটেখুটে, সাধ্যসাধনা করে সেখানে পৌঁছাব, খুব মুশকিল। এই হল ঠাকুরের পার্সোনালিটির উপর একটা ছোট্ট আলোচনা।

এরপর শুধু বর্ণনা। বর্ণনাতে ব্যাখ্যার কিছু নেই – **এই আনন্দমূর্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তনও থামিল। ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন**। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুরকে নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করান হয়েছে, ছোট খাটের উপর বসে আছেন। **পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় ভক্তচিত্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন**।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্ম-সমন্বয়প্রসঙ্গে

আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন। ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। ঘরে অনেকেই আছেন – **কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। রাখালের বাপ আসিয়াছেন; তিনিও ওই ঘরে বসিয়া আছেন**।

একজন বৈষ্ণব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন –কখন কখন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন। আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে অনেক গোস্বামী আছেন, আমি একজন গোস্বামীকেই জানি। আমি অতটা করিনা, কিন্তু এই কথাটা মনে পড়ে, কিভাবে ঠাকুর গোস্বামীদের প্রণাম করতেন। ঠাকুর সেই বৈষ্ণব গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, তুমি কি বল? উপায় কি? বৈষ্ণবরা সব জায়গায় একই কথা বলে, উনিও সেটাই জানেন।

গোস্বামী –আজ্ঞা, নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। আমাদের এক মহারাজ খুব মজা করে এটা বলতেন –নামে রুচি আর জীবে দয়া। তোমরা জান তফাৎ কি? নামে রুচি মানে আমার নাম, আমার সম্মান, নিজের নাম এটাতেই খালি রুচি। আর জীবে? জীবে না, জিভে, মানে খাওয়াতে রুচি। তখন বয়স কম ছিল, কম বয়সে এগুলো শুনলে খুব হাসি পেত; শব্দের খেলাগুলো শুনতে খুব মজা লাগত। উনি মজা করে আমাদের বোঝাতেন, নামে রুচি, যখন নিজের নামে রুচি তখন তুমি সংসারী, আর যখন নিজের জিভের উপর দয়া করে যাচ্ছ তখন তুমি সংসারী। আর ঈশ্বরের নামে যদি তোমার রুচি হয়, তবে তুমি ভক্ত। আর জীবে দয়া, সবারই প্রতি যদি একটা সেবার ভাব থাকে, তবেই তুমি সাধনপথের পথিক হবে। তার সঙ্গে আরেকটা বলতেন, বৈষ্ণব সেবা, তার মানে মনের মত লোকদের সঙ্গে আড্ডা মারা। নিজের নামে রুচি, জিভে দয়া আর নিজের লোকের সঙ্গ করা- এটাই হল সংসার। সাধুপুরুষের সঙ্গ ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। মহারাজ পুরোটাই মজা করে বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? তখনকার যত সাধনপথ ছিল, সব সাধনপথ দিয়ে ঠাকুর সাধনা করেছেন। তিনি জানেন, নাম মানে গুরুর কাছে যে মন্ত্র পেয়েছেন, যতটা সম্ভব সেই মন্ত্র জপ করে যাওয়া।

আজ রামনবমী, এখানে একটা সাধারণ কথা নিয়ে বলা যেতে পারে। এই যে রামকথা, রামকথাতে রামের কত কথা ও কাহিনী। কৃষ্ণকে নিয়ে এত কথা-কাহিনী নেই। শ্রীরামচন্দ্রের উপর যত গ্রন্থ আছে, এত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের উপর নেই। শ্রীকৃষ্ণের উপর মূলগ্রন্থ ভাগবত। মহাভারতকে ঠিক ভক্তিগ্রন্থ রূপে গণ্য করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রচুর গান রয়েছে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উপর রয়েছে প্রচুর গ্রন্থ।

বাল্মীকি রামায়ণ অতি উচ্চমানের গ্রন্থ। দক্ষিণ ভারতে বেশির ভাগ জায়গায় বাল্মীকি রামায়ণই পাঠ করা হয়। তারপর তামিল ভাষায় এলো কম্ব রামায়ণ। কম্ব রামায়ণ হল সাহিত্যিকদের জন্য। খুব ভাল সাহিত্যিক যদি কম্ব রামায়ণের খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাতে আপনার মনে একটু ভক্তি জাগবে বটে, তবে সেই ভক্তিটাও সাহিত্যের উপরেই আসবে।

ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় একটি করে রামায়ণ আছে। এমনকি থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা অনেক জায়গায় আছে। কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখলেন, তিনি কিন্তু তুলসীদাসের আগে ছিলেন। বাংলায় অনেকেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছেন। ওইদিকে হিন্দি বেল্টে এলেন তুলসীদাস, রচনা করলেন রামচরিতমানস। রামচরিতমানস আসার পর রামকথার প্লাবন হয়ে গেল। আমরা এভাবে জিনিসটাকে বুঝতে পারি –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গদেশে শুধু সাহিত্য না, একটা নূতন সংস্কৃতি দিলেন, ঠিক সেইভাবে তুলসীদাস পুরো হিন্দি বেল্টে একটা নূতন সংস্কৃতি দিলেন, আধ্যাত্মিক ভাব দিলেন। আর মুসলমানদের যে আক্রমণ ছিল, তাতে হিন্দুরা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল, নিজেদের অস্তিত্ব যেখানে হারিয়ে যেতে বসেছিল, এই সংস্কৃতি একাই হিন্দু সংস্কৃতির অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়া থেকে রুখে দিল। যত দিন যাচ্ছে, রামচরিতমানস আরও মানুষের হৃদয়ে গিয়ে দোলা লাগিয়ে দিচ্ছে। হিন্দি বেল্টে বাল্মীকি রামায়ণকে জানেই না। একশ বছর আগে বাংলা হরফে রামচরিতমানস ছাপা হয়েছে, অবধি ভাষাতেই লেখা হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে। কৃত্তিবাস সংস্কৃতির পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধন-ভজন ছিল। বাল্মীকি ছিলেন একজন ঋষি। কিন্তু তুলসীদাস ছিলেন রামময়, রামচন্দ্রে তিনি ঢুকে আছেন, যেখানে নিজের কোন বুদ্ধি একটুও লাগাতে হচ্ছে না। রামচরিতমানস হল, যেন শ্রীরামচন্দ্র নিজে তুলসীদাসজীর হাত ধরে লিখিয়েছেন।

একদিন আমাদের একজন সন্ন্যাসী বন্ধু বলছিলেন, 'আচ্ছা ঠাকুরের উপর এ-রকম রচনা করা যেতে পারে'? আমি বললাম, 'ওই জিনিস হবে না। কারণ আমিত্ব ভাব একটুও যদি থাকে, ওই রচনা হবে না। গ্রন্থ রচনা কখন মানুষ করে না, গ্রন্থ রচনা ভগবান নিজে করেন। কৃত্তিবাসের রচনা, ওটাও ভগবানই করেছেন, কিন্তু ওখানে একটু আমিত্ব আছে। কিন্তু তুলসীদাসের রামচরিতমানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্রীরাম ঢুকে আছেন'।

এই যে ঠাকুর নামের মাহাত্ম্য আর অনুরাগ নিয়ে বলছেন, এই দুটোতে এই হল তফাৎ। অনুরাগ মানে –ভগবান যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছেন। কারুর সাথে আমার যখনই ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়, সব সময় আমি একই কথা বলি –জীবনে কাউকে ভালবেসেছেন? যেখানে বলতে পারছেন, জীবন দিয়ে দেওয়া কিছুই না, আমার সম্মানটুকু পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। মরে যাওয়াটা সহজ, কিন্তু কারুর জন্য নিজের সম্মান বিক্রি করে দেওয়াটা এত সহজ না। আমরা আগেকার দিনে শুনতাম, মা-বাবা তাঁদের নিজের সন্তানকে খুব ভালবাসে। সন্তান পড়াশোনায় খুব ভাল। ওকে লেখাপড়ায় অনেক উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা-মা নিজেদের জমি-জায়গা বিক্রি করে দিত।

আগেকার দিনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতেন, ওরা যে কাউকে ভালবাসছে বলে যুদ্ধ করতেন তা না, আমার শৌর্য দেখাতে হবে, এতে আমার সম্মান বাড়বে। ভগবান গীতায় বলছেন, *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্,* সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই এই ধরণের যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের আজকের যারা মিলিটারি, তারা বলে আমরা দেশকে ভালবাসি। সত্যিকারের ভালবাসাটা ব্যক্তিগত স্তরে হয়। বর্তমান যুগের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই জিনিসগুলো জানেও না, বোঝারও ক্ষমতাই নেই। ভিতরটা পুরো ফাঁপা, কি যে হবে এদের ভগবান জানেন। এই সভ্যতার নাশ হওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। আমরাও সেইদিক থেকে তেমন কিছু না। তবে কি হয়, জপ করতে করতে কখনও তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের ভিতর অনুরাগ দিয়ে দিতে পারেন। এই অনুরাগটা কিন্তু ইমোশান না। রামকৃষ্ণ মিশনে আসার পর প্রথম প্রথম আমরাও খুব ইমোশানালি চার্জড্ থাকি। ভক্তরা এসে যখন নানারকমের

কথাগুলো বলে, তখন নিজেদের কথা মনে পড়ে, আমরা প্রথমে কি ছিলাম, ঠিক এই রকমই। এখন বুঝতে পারছি –ওগুলো বোকামো ছাড়া কিছু ছিল না।

শ্রোতাদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রোতাই হলেন পঞ্চাশের উপর বয়সের। আপনারা একবার ভেবে দেখুন, আপনার যিনি মা, তিনি কোন দিন আপনাকে বলেছেন, আমি তোমাকে ভালবাসি? কখনই না, একবারও বলেনি, আমি তোমাকে ভালবাসি, I love you। কিন্তু তাও আপনি জানতেন মা আমাকে ভালবাসে –এটাকে বলে অনুরাগ। ভিতর থেকে একটি শব্দও বেরিয়ে আসছে না, কিন্তু ভিতরটা ভালবাসায় টগবগ করছে। এই ভালবাসা যখন ঈশ্বরের প্রতি হয়, তখন এটাকে বলে অনুরাগ। এই অনুরাগ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরের দিকে এগোন যায় না। ওই ভগবানের নাম করে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন করে যাচ্ছেন। হয়ত কখন তিনি ইচ্ছে করে একটু কৃপা করে দিলেন, আপনার মধ্যে একটু অনুরাগের ভাব জন্ম নিল।

তুলসীদাস এক জায়গায় বলছেন –বিনু শত সঙ্গ বিবেক নো হোঈ। রাম কৃপা বিনু সহজ না সোঈ, সাধুসঙ্গ না করলে বিবেক জন্মায় না, রামচন্দ্রের কৃপা না হলে এটা হয় না। অনুরাগ ঈশ্বরের কৃপা না হলে হয় না। কিছু দিন আগে আমার এক বন্ধু এসে বলছেন, 'ঠাকুর আছেনই আছেন'। শুনে আমি চমকে উঠে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ভূতের মুখে রামনাম কেন। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন – 'এই করোনার সময় এত দুর্দিন, কিন্তু আমার একটা ইনকামের ব্যবস্থা হয়ে গেল'। কিছু বলার নেই, ইনকামের ব্যবস্থা হয়ে গেল সেইজন্য ঠাকুর আছেনই আছেন। এই ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর কি করবেন!

ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। আমরা সবাই যখন ছোট ছিলাম, এখন আপনারা বুঝে থাকবেন যে, তখন মায়েরা কখন ইমোশান দেখাতেন না। সন্তানের যদি কিছু বিপদ হয়ে থাকে, মা প্রকাশ করবেন না, কিন্তু তাঁর প্রাণ আটুপাটু করতে থাকবে। আমি আমার মায়ের কাছে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা, ওই বয়সেই আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি যখন এক দেড় বছরের বাচ্চা, খেলতে খেলতে কিভাবে গালে বটি লেগে অনেকটা কেটে যায়। প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, এমন রক্ত বেরিয়েছে যে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে। আমার মা ঘটনাটা দেখেনওনি, কেউ এসে বলেছেন। মা পরে আমাকে বলেছিলেন, 'তখন আমার বয়স কম, আর নূতন মা; বলছেন খুলে কাঁদতেও পারছি না'। এটা শোনার আমার খুব মজা লেগেছিল –This is Hindu culture। যে সন্তানকে মা এত ভালবাসে, বটিতে তার গাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, বড়রা সব দৌড়াদৌড়ি করছে, কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়। আর উনি বলছেন, আমি তখন যুবতী মা, খুলে কাঁদতেও পারছি না। মানে, কাঁদতে গেলেও তাঁকে দরজা বন্ধ করতে হবে, কারণ ইমোশান যেন বেরিয়ে না আসে, বড়দের কাছে ইমোশান যেন প্রকাশ না পায়। অনুরাগ এটাই, ভিতরে হয়, ভিতরটা ভালবাসায় টগবগ করছে, অথচ কেউ টের পায় না।

শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? আমাদের সবারই মন কিন্তু কামিনী কাঞ্চনেই থাকে। কামিনী-কাঞ্চন একটা জেনারেল টার্ম, আসলে সংসারের বাইরে, সাংসারিকতার বাইরে আমাদের মন যায় না। মানে নিজের যে শরীর, এই শরীরের বাইরে মন যায় না। যারই দেহবোধ আছে, বিশেষ করে যাদের বয়স হয়েছে, শরীরবোধ তাদের এত বেশি, ভাবলে অবাক লাগে। কাউকে একবার যদি জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল বুলেটিন দিতে শুরু করে দেবে, মহারাজ আমার ঘাড়ে ব্যাথা, কোলোস্টরাল বেড়ে গেছে, লম্বা দু-পাতার বুলেটিন। কেমন আছেন? ভাল আছি। ব্যস্ হয়ে গেল। এত দেহবোধ কেন থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, এখানে আমাদের কারুর শরীর খারাপ হলে আমরা দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়ে থাকি। কোন মহারাজ খবর নিতেও জান না। সিরিয়াস হয়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেবেন, খতম। যাদেরই

দেহবোধ খুব, বুঝবেন ওদের ভিতরটা কামিনী-কাঞ্চনে ভর্তি। দেহবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। সারাটা দিন কেবলই অসুখ-বিসুখ নিয়ে কথা, ওই খেলে হজম হয় না, ওই খেলে পেটে গ্যাস হয়, পাখা একটু বেশি জোরে ঘুরলে এই সমস্যা, আস্তে ঘুরলে এই সমস্যা। এরা ঈশ্বরের কি নামধ্যান করবে?

বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না –ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। গ্রামদেশের লোকেরা জানবেন, বিছে কামড়ালে একটা তামার পাত্রে ঘুটে জ্বালিয়ে একটা বিশেষ ভাবে লাগান হত। আমি নিজে একজনের কাছে শুনেছি, কাশী সেবাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, ওনাকে একবার বিছে কামড়েছিল, তিনি যন্ত্রণায় খুব কাতরাচ্ছেন। গ্রামের একজন রোগী তখন ওখানে ভর্তি ছিল। তিনি তখন বলছেন, মহারাজ, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? দাঁড়ান, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। তখন ঘুঁটে জোগার করে তামার পাত্রে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে কিভাবে সেঁক দিল, দেওয়ার পর আস্তে আস্তে যন্ত্রণটা সেরে গেল। ঠাকুর এটাই বলছেন –শুধু মন্ত্র পড়ে হয় না, আরও অনেক কিছু করতে হয়। নিজের যুগের জন্য ঠাকুর বেশি প্র্যাক্টিক্যাল। সমস্যাগুলো ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিতেন না। শুধু মন্ত্রের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন না, ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।

আমাদের সবারই কি হয়, আমরা যে মতে থাকি, সেই মতটাকে মনে হয় শ্রেষ্ঠ। কারণ যতক্ষণ আপনি চারজনের সঙ্গে কথা না বলছেন, আপনি যদি দুজন মুসলমান, দুজন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে কথা না বলেন; আপনি কি করে বুঝবেন যে আপনি ঠিক। কিছু দিন আগে একজন কমেন্টে লিখলেন, 'বাজার থেকে বেগুন কিনতে গেলেও দেখে নিতে হয় ওর মধ্যে পোকা আছে কিনা, আর ধর্মের ব্যাপারে যাচাই করব না'? আমি বুঝলাম, আমাদেরকে নিয়ে বলতে চাইছেন। আমি ভাবলাম একটা উত্তর দিয়ে লিখে দিই –তুমি যেখানকার, যদি বিচার করা হয় বেগুনে শুধু পোকা আর পোকাই বেরোবে, বেগুন আর থাকবে না। লিখলে রেগে যাবে, কি দরকার, তার থেকে ব্লক করে দিলেই চুকে যাবে। ঠাকুর পরে বলবেন, মতুয়ার বুদ্ধি যাদের তারা ঠিক এই রকম। নিজেরটা ঠিক মনে করে বাকিদেরটা ফেলে দেবে। স্বামীজী এক জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন –ভারতের অধঃপতন সেইদিন তেকে শুরু হল, যেদিন ভারত 'ম্লেচ্ছ' শব্দটি বার করল। হিন্দু ছাড়া যারা আছে, তারা সবাই ম্লেচ্ছ। তাদের ছুলেই আপনাকে স্নান করতে হবে। কি পরিণতি? Interaction বন্ধ হয়ে গেল।

আপনার সুপিরিয়রিটি এখন মনে মনে। যে লোক চুপ থাকে, সে হয় মহাবিদ্বান, আর তা নাহলে মহামুর্খ। মুখটা যদি নাই খোলেন, জানব কি করে? মুখটা তো খুলতে হবে, মুখ খুললে বোঝা যাচ্ছে, আরে এতো মহামুর্খ। কালিদাসকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তুমি মুখটা খুলবে না। কারণ মুখ খুললে ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ে যাবে বলে মুখটা বন্ধ করে রাখে। এটা একটা সাধারণ সমস্য; কারণ তখন নিজের মনে একটা জগৎ বানিয়ে নিচ্ছে আর মনে করছে, আমার মত আর কেউ নেই। গোস্বামী এখানে অজামিলের কথা নিয়ে আসছে। ভাগবতে অজামিলের কথা আছে।

গোস্বামী –তাহলে অজামিল? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই যা সে করে নাই। কিন্তু মরবার সময় 'নারায়ণ' বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল। ঠাকুর সঙ্গ সঙ্গে আটকে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হয়তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল। আর আছে যে, সে পরে তপস্যা করেছিল।

ভাগবতে এটাই আছে। অজামিলের কাহিনী খুব সহজ কাহিনী। লোকটি পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার এক ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুর অবস্থায় সে ছেলেকে 'নারায়ণ' বলে ডাকছে। যমদূতেরা সেখানে এসেছে, এসে দেখছে বৈকুণ্ঠ থেকে নারায়ণের লোকজনরা তাঁকে নিতে এসেছে। কি ব্যাপার? কারণ সে মৃত্যর সময় হরিনাম করেছে, 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছেন, তাই সে বিষ্ণুলোকে যাবে। এই ঘটনার পর ওরা চলে যায়। তখন অজামিলের চেতনা জাগ্রত হয়ে যায়, আমি

এ-সব কি করছি, মৃত্যুর সময় আমার ছেলের নাম 'নারায়ণ' করলাম, তাতেই ভগবানের দূত এসে আমাকে বাঁচাতে চলে এলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি তপস্যায় নেমে পড়লেন।

এরকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিমকাল। অর্থটা হল, ঠাকুর এটাকে অত সহজে ছেড়ে দেবেন না। **হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলা-কাদা মেখে যে কে সেই!** আগেকার দিনে দেখা যেত হাতিকে মাহুতরা নদী বা পুকুরে নিয়ে গিয়ে খুব করে ঘষে ঘষে স্নান করাল। হাতিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে শুঁড় দিয়ে ধুলো টেনে এনে নিজের মাথার উপর ছড়িয়ে দেবে। **তবে হাতিশালায় ঢোকাবার আগে যদি কেউ ঝুল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে গা পরিষ্কার থাকে**। অর্থাৎ শেষ সময়ে যদি ঈশ্বরের নাম করা হয়, তাহলে ঠিক থাকবে।

নামেতে একবার শুদ্ধ হল; কিন্তু তারপরে হয়তো নানা পাপে লিপ্ত হয়। এই বাক্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠাকুর বলছেন না যে, তোমরা জপ করো না; জপ করলে শুদ্ধ হবে ঠিকই। কিন্তু সেই অনুরাগ নাই। ঈশ্বরে যদি অনুরাগ না থাকে তাহলে সংসারে অনুরাগ থাকবে। সংসারে অনুরাগ মানে দেহে অনুরাগ থাকবে, দেহে অনুরাগ মানেই কামিনী-কাঞ্চন আর জগতের নানা জিনিসে অনুরাগ। আপনি জপ থেকে নামলেন, সঙ্গে মন ওখানে যাবেই। পাপ বলতে এখানে সংসার। পাপ নিয়ে আগে অনেকবার আলোচনা করেছি, এখানে আর করছি না।

মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ করব না। মনে বল নাই; আমি যেখানেই দেখি চারিদিকে এই একই সমস্যা –মনে বল নাই। স্বামীজীর পুরো যে বাণী ও রচনা, সেখানে তিনি একটি কথা বলছেন –ফ্রীডম্। অন্নের চাহিদা থেকে মুক্তি, নিজের দুর্বলতা থেকে মুক্তি; জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি, মুক্তির জন্য চাই শক্তি। স্বামীজীর রচনায় শক্তি-মুক্তি এছাড়া আর কিছু নেই। শক্তির কথা স্বামীজী অনেক জায়গায় বলছেন। কিন্তু শক্তি তো রাবণেরও ছিল, হিটলারেরও ছিল, স্বামীজী সেই শক্তির কথা বলছেন না।

Man making and character building educationএর কথা স্বামীজী বলছেন। Man making হল যেখানে শক্তি, character building হল বিবেক; এই শক্তির সাথে যখন বিবেকের মেলবন্ধন হয়, তখন সে মুক্তির দিকে এগোয়। বিবেকের সঙ্গে শক্তি না থাকলে মুক্তি হবে না। আমরা দুনিয়ার বিবেক নিয়ে আসি, কিন্তু ভিতরে শক্তি নেই। এই গাড়ির ব্রেকটা খুব মজবুত। আর ইঞ্জিন? ইঞ্জিন তো নেই। ইঞ্জিনই নেই তো গাড়ি চলবে কি করে? তা না হোক, কিন্তু ব্রেকটা খুব সুন্দর মজবুত, কোন এ্যাকসিডেন্ট হবে না।

চরিত্রবান গরুর কথা আমরা ক্লাশে অনেকবার বলেছি। চরিত্রবান গরুর বিরাট দাম। কি রকম গরু? গরুটার চরিত্র খুব ভাল। এই গরু দুধ দেয় না, বাছুর দেবে না, কোন ষাঁড়ের সঙ্গ করেনি। গরুর বিশেষত্বটা কি? এর চরিত্র; দাদা চরিত্র বলে একটা জিনিস হয় মানবেন তো। এই রকম চরিত্র নিয়ে আমার কি হবে। একটি ইয়ং ছেলে এসেছে স্বামীজীর কাছে, সন্ন্যাসী হতে চায়। স্বামীজী ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মিথ্যা কথা বলতে পার'? 'আমি মিথ্যা কথা বলি না'। 'চুরি করতে পার'? 'আমি চুরি করি না'। 'তোমার দ্বারা সাধু হওয়া হবে না। তোমার শক্তি কোথায়? তুমি চাইছ প্রকৃতিকে জয় করতে'?

আমাদের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন। উনি একটা বই লিখেছিলেন 'Universal Brotherhood'। অনেক আগেকার কথা, তখন ভরত মহারাজা, স্বামী অভয়ানন্দ মঠের ম্যানেজার ছিলেন। ওনার সাথে এই মহারাজের বন্ধুত্ব ছিল। উনি এসে ভরত মহারাজকে তাঁর লেখা বইটা দিতে এসেছেন। ভরত মহারাজ খুব হিউমারাস ছিলেন। "তুমি লিখেছ 'Universal Brotherhood'?

সেন্টারে যাঁর সঙ্গে কোন সন্ন্যাসী ভাই দুদিন টিকতে পারে না, সে কিনা বই লিখেছে 'Universal Brotherhood'"।

দুটো লোককে আপনি শান্তি দিতে পারেন না, দুজনকে আপনি খুশি রাখতে পারেন না, আপনি চাইছেন ঈশ্বরের মন ভজাতে? 'ভাববার কথা'তে স্বামীজী এই কথাই লিখেছেন। আপনার মধ্যে সেই শক্তি নেই যে, আপনি চারজনকে প্রভাবিত করতে পারবেন? আপনি নাকি প্রকৃতি জয় করবেন? আপনার মধ্যে সেই ক্ষমতা নেই যে, আপনাকে দেখে আরও পাঁচজন অনুপ্রাণিত হবে। ঠাকুর রেগেমেগে এদের নামে বলতেন – ড্যামনা শালা। আমাকে একজন বললেন, এটা খুব বাজে গালাগাল। আমি আর কি বলব, ঠাকুর নিজে বলছেন। স্বামীজীর পুরো বাণী ও রচনাতে একটি কথা –ফ্রীডম। ফ্রীডমের জন্য দরকার শক্তি। ঠাকুরও এখানে এটাই বলছেন – মনে বল নাই। তোমার মনে শক্তি নেই তুমি কি করবে। 'প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ করব না'। শুধু বুদ্ধি থাকলে হয় না। রাবণেরও শক্তি ছিল, হিটলারেরও শক্তি ছিল, কিন্তু 'আমি' ছাড়া কিছু বোঝে না।

গঙ্গাস্নানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে? লোকে বলে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে তখন ওই পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। (সকলের হাস্য)। ঠাকুরের এই বৈশিষ্ট্য, ভগবত কথা বোঝানর জন্য গল্প বলছেন, ওই গল্পের মধ্যে সেই ঈশ্বরতত্ত্বই আছে। কোন কিছু আড়াল করার কিছু নেই, কোন চালবাজি নেই, রয়েছে শুধু শক্তির প্রকাশ। **সেই পুরানো পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্নান করে দু-পা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে**।

তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে-সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন, টাকা, মান, দেহের সুখ; তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।

উনুনের উপর একটা বড় হাড়ি চাপানো আছে। আপনি সেই হাড়ির ভিতর একটা হাতা ডোবাচ্ছেন আর বার করছেন। আপনি যেটা বার করতে চাইছেন, সেটা হাড়ির ভিতরে আছে কি? ডাল, সব্জি, পায়েস, যেটাই হোক কিছু আছে কি? নাকি খালি হাতা ডোবাচ্ছেন আর বার করে যাচ্ছেন? জপে অনুরাগ না হলে হয় না। শ্রীশ্রীমা বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি। জপাৎ সিদ্ধি খুব নামকরা কথা, সেখানে কিন্তু অনুরাগটা ধরে নিয়েই এই কথা বলছেন। আপনার অনুরাগ আছে, এটা ধরাই আছে। ঠাকুরের কাছে যে কেউই এলে তিনি কথার ছলে একটা কোন কথা আগুন্তকের মুখ থেকে বার করে নিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে ওটা ঠিক করে দিতেন। যে নেওয়ার নিলো, যে না নিলো তো না নিলো। কিন্তু মাস্টারমশাইর জন্য এই কথাগুলো যে থেকে গেল, যার জন্য আজকে আমি আপনি বুঝতে পারছি, ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। ঠাকুর গোস্বামীকে সেইজন্য বলছেন –তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর।

কিসের জন্য প্রার্থনা? ঈশ্বরের প্রতি যেন অনুরাগ হয়। অনুরাগ যদি না হয়, সমস্ত জপধ্যান, তপস্যা এগুলো মেকানিক্যাল হয়ে যাবে। আমরা যে রামচরিতমানসের কথা বললাম, রচনাতে যদি একটুও বুদ্ধি এসে যায়, লেখাটা মেকানিক্যাল হয়ে যাবে। কিন্তু যেখানে অনুরাগ, সেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার বাস। তখন যে শব্দগুলো বেরোবে, প্রত্যেকটি শব্দে আলাদা সুগন্ধ। শব্দে যদি সেই সুগন্ধ না আসে, ততক্ষণ ভক্তিশাস্ত্র হয় না। শুধু ভক্তিশাস্ত্রই না, কোন শাস্ত্রই হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) –**আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়**। এর আগে ঠাকুর দুটি বাক্য বললেন –তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয় আর জগতের জিনিসগুলির প্রতি ভালবাসা যেন কমে যায়; আর সেখান থেকে এবার বলছেন – আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

ধর্ম জীবনে তিনটি সমস্যা। এই দুটি কথার মধ্যে ঠাকুর তিনটে সমস্যারই কথা আনছেন। প্রথম সমস্যা –লোকেরা বলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাব প্রচণ্ড বেড়ে গেছে আর তার সাথে তাল দিয়ে ভোগবাদ এত বেশি বেড়ে গেছে যে, ভোগের বিষয় ছাড়া মানুষ অন্য কোন বিষয়ে কিছু বললে সন্দেহ করে। সন্ন্যাসীরা ভারতের চিরদিনের আদর্শ। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে, সংসারী এক আনা ত্যাগ করবে। ইদানিং যত তথাকথিত নামকরা মহাত্মারা আছেন, বাবাজীরা আছেন, এনাদের এক-একজন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। মানুষ কোথা থেকে ত্যাগের কথা শিখবে? ত্যাগের কথা শেখা হয় না, অনুকরণ করা হয়; বাচ্চারা যেমন বাবা-মার অনুকরণ করে। ঠিক তেমনি ত্যাগের অনুকরণ করা হয়, ত্যাগ বলে শেখানো যায় না। মূল্যবোধও বলে শেখানো যায় না। আমরা আমাদের সময়ে শিক্ষকদের দেখতাম, শিক্ষকরা এত উচ্চমানের সৎচরিত্রের মানুষ ছিলেন যে, ওনাদের দেখেই ভিতরে একটা শক্তি আসত। সন্ন্যাসীদের ত্যাগ দেখলে লোকেদের ইচ্ছে হয়, আমিও একটু ত্যাগ করব। এখন সন্ন্যাসীরাই ভোগে নেমে গেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনে কড়াকড়ি আছে, এখানে কড়া অনুশাসনের জন্য ডানদিক বামদিক অনেক কম হয়। কিন্তু বাইরের সন্ন্যাসীদের সুযোগ আছে, একটু সামান্য সুযোগ পেলেই ভোগে নেমে পড়েন। ফলে যারা ধর্মের নিন্দুক, যাদের ঈশ্বরদর্শন হয়নি, সাধুসঙ্গ যারা করেনি তারা কি করে ঈশ্বরকে মানবে। আমাকে অনেক ইয়ং ছেলেরা এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আমি তাদের বলি, যাকে দেখেনি কি করে বিশ্বাস করব, বাকি সব তো কথার কথা। তুমিও যখন বলছ, আমি ঈশ্বর মানি না, তুমিও এটা কথার কথা বলছ। আর আমি যদি বলি, আমি ঠাকুরকে মানি, আমিও কথার কথা বলছি। কিন্তু আমি যাঁদের বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি, তাঁরা বলে দিয়েছেন ঠাকুর ঈশ্বর, আমিও মেনে নিয়েছি ঠাকুর ঈশ্বর। তুমি যাঁকে শ্রদ্ধা বিশ্বাস কর, তিনি বলেছেন ঈশ্বর নেই, তুমিও মেনে নিচ্ছ ঈশ্বর নেই। একবার তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা আমার কাছে এসেছিল। আমাদের ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমাকে বলতে শুরু করেছে –আমি আর যাব না, ভূত আছে। আমি যত বোঝাচ্ছি সে মানছে না। বাচ্চাটা আমাকে বিশ্বাস করছে না। কিন্তু ওর মা-বাবা যখন ওকে বলছেন, এসো কিছু নেই, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করছে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর নেই; এটা পুরোপুরি বিশ্বাসে চলে।

আমি পশমিনা চাদরের কথা শুনেছিলাম, ওই চাদর খুব গরম হয়। আমার একটু শীত বেশি করে। অনেক আগে একবার অমরনাথ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় অমৃতসরে একটা উলের দোকানে চাদর কিনতে গিয়েছি। দোকানের মালিক আমাকে একটা পশমিনা চাদর দেখালেন। আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি করে চেনেন এটা পশমিনা'? উনি বললেন, 'আমাদের যিনি সাপ্লাই দিচ্ছেন, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি; সাপ্লায়ার যার থেকে কিনছেন তিনি তাঁকে বিশ্বাস করেন। আর যে মূল ক্রেতা সে যে পশমিনা নামে বিশেষ ভেড়ার লোম কেটেছে তাকে বিশ্বাস করে। এর মধ্যে কোন এক জায়গায় যদি বিশ্বাস ভেঙে যায়, পুরো চেইনটা উপর থেকে নীচে ভেঙে যাবে। ঈশ্বরীয় কথা পুরোপুরি বিশ্বাসে চলে। এখন বেশির ভাগ লোকেরাই বিচিত্র বিচিত্র নানান রকমের প্রমাণ নিয়ে আসছে –ঈশ্বর নেই। আমি বললাম, হে প্রভু আজকে বৃষ্টি হোক; বৃষ্টি হয়নি, তাই ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর নেই বলার জন্য এই ধরণের লজিক চলছে। এই হল প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

এই যে ঠাকুর বলছেন –নাম কর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। যতক্ষণ আপনার ঈশ্বরে অনুরাগ না হয় ততক্ষণ আপনি কি করে বুঝবেন ঈশ্বর কি, ঈশ্বরে অনুরাগ কি জিনিস? কারণ আমরা সবাই মুখের কথা বলছি। অনেক আগে আমাকে একজন আচার্য বলেছিলেন –'তোমার ঈশ্বরের ব্যাপারে কোন ধারণা নেই'। আমার তখন বয়স কম ছিল বলে শুনে ভিতরে ভিতরে রাগ হল। কিন্তু অনেক পরে বুঝতে পারলাম, উনি ঠিকই বলেছিলেন। মুখের কথার উপর আমরা চলছি। যতক্ষণ আপনি প্রচুর জপধ্যান না করছেন, কম করে ছয়-সাত মাস দিনে ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা করে জপধ্যান না

করে থাকেন, ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা যদি প্রার্থনা না করে থাকেন, কি করে আপনার ঈশ্বরে অনুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস হবে। এটা হল প্রথম সমস্যা।

ধর্ম জীবনে দ্বিতীয় যে সমস্যা আসে, সেটা হল কোন রকমে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু জীবনে ওটাকে নামানো যাচ্ছে না। এটা ভয়ঙ্কর সমস্যা। অল্প একটু দু-পয়সার বিশ্বাস হয়েছে, জীবনে নামানো যাচ্ছে না। ঠাকুর এটাই বলছেন, অনুরাগ হলে প্রার্থনা যখন করা হয়, তখন যে জিনিস দু-দিনের জন্য, এই জিনিসগুলোর উপর ভালবাসা যেন কমে যায়, এই প্রার্থনা করতে হয়। এই দুটো হল ধর্ম জীবনের বড় সমস্যা।

তৃতীয় আর-একটা সমস্যা হল, হয়ত বিশ্বাস হয়েছে, হয়ত জীবনে একটু নামিয়েছে, কিন্তু তারপরেই আসে –আমার পথটাই ঠিক; কারণ সে সেটাই জানে। যাঁরা গোঁড়া, অন্যান্য ধর্ম তো গোঁড়া না, ওরা ধর্মান্ধ; যে কোন আদর্শবাদ নিয়ে, পলিটিক্যাল ইডিওলজি হতে পারে, একটা যে কোন আদর্শবাদ হতে পারে, ধর্মও হতে পারে; সব ক্ষেত্রে যুক্তিবাদীরা ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণু, তার আদর্শবাদের বাইরে আর কাউকে সহ্য করতে পারে না। এই যে আমার মতটাই ঠিক, আমার ঈশ্বরই ঠিক –এটা হল তৃতীয় সমস্যা।

ধর্ম জীবনে এই তিনটে বড় সমস্যা। প্রথম বিশ্বাসের অভাব, দ্বিতীয় জীবনে নামানোর অভাব আর তৃতীয় হল আমার মত ঠিক, তুমি ভুল। তোমার ঈশ্বর যদি সৃষ্টি করে থাকেন, আমি যদি তাঁকে না মানি, তাহলে কেন তুমি আমাকে মারতে আসছ? আমার ঈশ্বরের আদেশ আছে তোমাকে মারার। তোমার ঈশ্বর কি এতই দুর্বল যে, তোমার সাহায্যে তিনি তাঁর ধর্ম চালাবেন? দুজন আহাম্মক নিয়ে যদি ধর্ম চালানো হয়, সেই ঈশ্বর কেমন হতে পারে, এই নিয়ে আর কি কথা বলার আছে! পুরো বিশ্বের ধর্ম-ইতিহাসে দেখবেন এটাই চলছে। এগুলো নিয়ে কত আর আলোচনা করব; সব কিছুর দোষ ধর্মের উপর চলে আসে।

ঠাকুর যে বলছেন, আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; তাহলে যে কোন ধর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের কি একই অনুভূতি হবে? সবারই কি একই ধরণের জ্ঞান হবে? কক্ষণ তা হবে না। সব ধর্ম দিয়ে একই অনুভূতি হয় না, ঠাকুর একবারও এই কথা বলছেন না। এই যেমন গীতায় বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব ভজাম্যহম্,* যে ভাব নিয়ে আমরা কাছে ভক্ত আসে আমি তাকে সেই ভাব অনুসারেই সব কিছু দিই। ফলে, আপনার মনটি যেমন, আপনার অনুভূতি তেমনটি হবে। যে কৃষ্ণভক্ত সে কৃষ্ণেরই দর্শন পাবে। যে কালী ভক্ত সে কালীরই দর্শন পাবে। আর যে ভাব নিয়ে, যেমন যে টাকা-পয়সার ভাব নিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করছে, সে সেটাই পাবে। সেইজন্য সবাই একই জিনিস পাবে না। আপনি কৃষ্ণমন্ত্রে সাধন করে কৃষ্ণ ভাবে এগিয়ে কালীর দর্শন কোন দিন পাবেন না। তার সঙ্গে লেগে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যখন তিনি দেখলেন আমার এই ভক্ত পুরোপুরি শরণাগত, তারপর তিনি হঠাৎ তাকে কি দিয়ে দেবেন বলা খুব মুশকিল।

এর খুব সুন্দর উদাহরণ হল ধ্রুবোপাখ্যান, যদিও পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু খুব সুন্দর কাহিনী। আমরা যখন ভক্তের কথা বলি, তখন সবাই ধ্রুবের কথাই বলি। ধ্রুব সাম্রাজ্য ফেরত পাওয়ার জন্য তপস্যায় বসে গিয়েছিল। ভগবান ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাম্রাজ্যও দিলেন আবার দর্শনও দিলেন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন –কাঁচ কুড়োতে এসে যদি হীরে পেয়ে যাই তাহলে ছাড়ব কেন। ভগবান ধ্রুবকে সাম্রাজ্যটা দিলেই পারতেন, কিন্তু না, তিনি ধ্রুবকে নিজে দর্শন দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত বানিয়ে দিলেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা একটা জিনিস করতে গেলাম, দেখা গেল সেটা না হয়ে আর-একটা হয়ে গেল। ঠাকুর মা কালীর সাধনা করলেন, মা কালীর দর্শন করলেন, মা কালীকে ব্রহ্ম রূপে জানলেন। সব তো হয়েই গেল। কিন্তু মা কালীর ইচ্ছা অন্য রকম ছিল। তিনি বিভিন্ন গুরু পাঠিয়ে ঠাকুরকে দিয়ে অনেক রকমের সাধনা করিয়ে নিলেন। কিন্তু সেখানেও যে সাধনার যে অনুভূতি

হওয়ার কথা ঠাকুরের সেই অনুভূতিই হয়েছে। আর মা ঠাকুরকে দিয়ে সেই সাধনাগুলোই করিয়েছেন, যে সাধনাগুলোর কথা তিনি জানতেন। যেমন জুহুদি ধর্ম, ঠাকুর জুহুদি ধর্মের কথা জানতেন না। আমরাও কোথাও উল্লেখ পাই না যে, ঠাকুর জুহুদি ধর্মের সাধনা করেছিলেন।

ঠাকুর যে যে সাধনার কথা জানতেন, তার মধ্যে একটা হল অদ্বৈত, যেটা মনের পারে। কিন্তু অদ্বৈত অবস্থা থেকে এই জগতে যখন প্রবেশ করেন, তখন তিনি পুরোপুরি মনের নিয়মে বাঁধা। যিনি ঈশ্বর তিনি মনের যে কাঁচ, তার মধ্য দিয়েই আসবেন। কিন্তু পুরোটা আসে না; যেমন ধরুন যিনি কৃষ্ণ জানেন তিনি কালীও জানেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাছে কালী রূপে আসবেন না, এলেও তিনি মানবেন না। কিন্তু ঠাকুরের মনের বিস্তার এমন যে, তিনি সবটাই পরিষ্কার vision পান। সেইজন্য ঠাকুর যে বিভিন্ন ভাবের সাধনা করেছেন; শক্তি সাধনা করেছেন, ভক্তি সাধনা করেছেন, অদ্বৈত সাধনা করেছেন; ফলে যে ধরণের ভক্ত আসছে, সবার ভাব অনুযায়ী তিনি কথা বলতে পারছেন। এই যে আমরা ধর্মের তিনটি সমস্যার কথা বললাম – ধর্মে অবিশ্বাস, ধর্মকে জীবনে না নামাতে পারার দুর্বলতা আর ধর্মান্ধতা; তিনটের উপরই তিনি একসাথে আক্রমণ করেছেন। পুরো কথামৃতে দেখা যায় এই তিনটে জিনিসই ঘুরঘুর করছে।

আমাদের মঠের সাধুরা কথামৃতের ব্যাখ্যা প্রথম থেকে করে আসছেন। অনেক গৃহস্থরাও করে যাচ্ছেন। কথামৃতেরও যে ব্যাখ্যা হয়, এই জিনিসটা প্রথম আমি একজন গৃহস্থের মুখেই শুনেছিলাম। আমি তখন জয়েন করে দেওঘরে ব্রহ্মচারী ছিলাম। দেওঘর সেন্টারটা স্কুল কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য স্কুলে প্রচুর কাজকর্ম থাকত। সেইজন্য কথামৃতের ব্যাখ্যা করা ব্যাপারটা আমরা জানতামই না। সেই সময় আমাকে ভিতরে বাইরে প্রচুর কাজ করতে হত। একবার সিমেন্ট আনার জন্য আমাকে সিন্ধ্রি যেতে হয়েছিল। কয়লা আনা, সিমেন্টা আনা আমার কাজ ছিল, তার সঙ্গে স্কুলে ক্লাশও নিতাম। ওই সময় সিন্ধ্রিতে একটা আমাদের প্রাইভেট আশ্রম ছিল, জানি না এখনও আছে কিনা। আমি আশ্রমে উঠেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা দেখছি একজন ভক্ত আশ্রমে কথামৃত পাঠ করছেন। আমাকে ব্রহ্মচারী দেখে বললেন কথামৃত পাঠ করতে। আমি জানিও না যে কথামৃত কিভাবে পাঠ করা হয়। ওই দিনেই আমি প্রথম জানলাম, কথামৃতের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। আপনাদেরও যদি সুযোগ হয় নিয়মিত কথামৃত পাঠ করবেন, বাড়ির লোকদের শোনাবেন। কথামৃত শুধু তো সন্ন্যাসীদের জন্য না। আর এই যে তিনটে জিনিস – ধর্মকে অবিশ্বাস, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং*, স্বামীজী বলছেন; ঈশ্বরের প্রতি সংশয়, এটাকে নাশ করছে। জীবনে ধর্মকে নামানো যাচ্ছে না, এটাকে নাশ করছে। ধর্মান্ধতা, নাশ করছে। কথামৃত এই তিনটেকে নাশ করছে।

তাহলে ঠাকুর এতগুলো কথা কেন বলছেন। কারণ একটা জায়গায় গিয়ে ধর্মগুলো সমান হয়ে যায়। প্রথম –এই যে জগতের প্রতি আকর্ষণ, এটা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকটি ধর্মের এটা হল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জগৎকে আমরা খুব বেশি সিরিয়াসলি নিই। সিরিয়াসলি নেওয়া মানে, আমরা এমন ভাবে এর সাথে এঁটে রয়েছি যে, একটু কিছু হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। আমাদের একাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, সেই সময় দু-বছর আমি বেলুড় মঠে ছিলাম। পরে অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, কিন্তু নিয়মিত আসতাম। একদিন দেখছি, একজন মহিলা মহারাজের কাছে হাউহাউ করে কাঁদছেন আর বলছেন –'বাবা, আমার নাতির বড় অসুখ, কোন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না'। গম্ভীরানন্দজী মহারাজ নামেও গম্ভীর স্বভাবেও গম্ভীর লোক ছিলেন। উনি বললেন –'ডাক্তার দেখাও'। মহিলা কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি'। মহারাজ আবার একই কথা বলছেন –'ডাক্তার দেখাও'। আমার তখন বয়স কম, ভিতরে মিশ্র ভাব চলছে –আহা মহারাজ যদি দুটো মিষ্টি কথা বলে দিতেন। কিন্তু পরে বুদ্ধিটা একটু বাড়ার পর মনে হল, মহারাজ কিসের মিষ্টি কথা বলবেন! লোকেরা মনে করে সাধুবাবা যদি একটু মিরাক্যাল করে দেন। গম্ভীর মহারাজের নিজের শরীরেই হাজারটা সমস্যা। চোখে দেখতে পান না ভাল করে। নিজের উপর তিনি

তো কোন দিন মিরাক্যাল লাগালেন না। আপনার নাতির উপর কি মিরাক্যাল করবেন? মহিলার কথাও ভাবি, এনারা হলেন আধ্যাত্মিক গুরু, ঘরোয়া সমস্যাগুলো কেন এনাদের কাছে নিয়ে আসছেন? আর কতদিন নাতির প্রতি, জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবেন?

আমরা যদি আমাদের আসক্তির দিকে তাকাই, অবাক হয়ে যাব। সকাল বিকাল এক ঘন্টা করে যদি জপধ্যান করেন, দেখবেন এই অবাক করা আসক্তির বহর অনেক কমে যাবে। গীতায় বলছেন, *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, নিজের প্রতি আসক্তি, আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদের প্রতি আসক্তি, জপধ্যান করলে এটা কমে। ঠাকুর আমাদের সব –তিনি ইষ্ট, তিনি গুরু, তিনি বাবা, তিনি মা। তিনি আমাদের সর্বদা নানা ভাবে বুঝিয়ে যাচ্ছেন, তুমি কষ্ট পাচ্ছ, সংসারের অগ্নিকুণ্ডে জ্বলেপুড়ে মরছ –আগুন থেকে বেরিয়ে এসো। কিন্তু আমরা শুনতে চাই না। একবার যদি জগৎ থেকে একটু উপরে উঠে আসেন, বাকিটা ঈশ্বর আপনাকে নিজেই দেখিয়ে দেবেন।

ঠাকুর যখন বলছেন, আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তখন এটাই বলতে চাইছেন, জগতের উপরে চলে যাওয়া মানে, পৃথিবীর মাটি ধরে আপনি যত জোরেই দৌড়ান আপনার অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু একটা সবে উড়তে শেখা পাখি যখন ডানা ছড়িয়ে আকাশে উড়ে গেল, অর্থাৎ মাটি ছেড়ে দিল, সে তো পুরো একটা আলাদা জাতের হয়ে গেল, একটা নূতন জগৎ তার জন্য খুলে গেল। বাকিটা তিনি দেখিয়ে দেবেন। আপনার যেমন দরকার, আপনার যেমন মন, যেমন কর্ম, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, তিনিই আপনাকে দেখিয়ে দেবেন।

তবে এই বিষয়টা এসেছে বলে বলছি –হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে পুরো আলাদা। কারণ হিন্দু ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সমুদ্র। ঠাকুর অনেকবার বলছেন –আমরা সাকার মানি, নিরকার মানি, অবতার মানি। অন্য কোন ধর্ম এভাবে সব কিছু এক সঙ্গে মানতে পারে না, পারবেও না। নিরাকার মানলে সাকার মানে না, সাকার মানলে নিরাকার মানে না। অবতার তো কোন মতেই না, অসংখ্য অবতার কেউ মানে না। তার থেকেও বেশি, যখন আরও উপরে যাবেন, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তে –যেখানে জীবনমুক্তির কথা বলা হয়। জীবনমুক্তির ধারণা করা এত কঠিন যে, যাঁরা আমাদের দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনারাও মানতেন না। স্বামীজী অদ্বৈতকে বলছেন –মুকুটমণি, চূড়ামণি। যুক্তিতর্ক দিয়ে মাধ্বাচার্য, রামাননুজরা যাই করে থাকুন, অন্যান্যরাও যাই করে থাকুন, খোল-করতাল নিয়ে বৈষ্ণবরা যাই করে থাকুন –হিন্দুদের শেষ কথা জীবনমুক্তি। হিমালয়ে অনেকেই যান, কিন্তু মাউন্ট এভারেস্টে সবাই যেতে পারেন না। কাশ্মীর থেকে অরুণাচল পর্যন্ত হিমালয় বিস্তৃত, যত খুশি আপনি ঘুরতে থাকুন, কিন্তু মাউন্ট এভারেস্ট হল মাউন্ট এভারেস্ট। জীবনমুক্তি হল সেই মাউন্ট এভারেস্ট। ওই জায়গা সবার জন্য নয়। জীবনমুক্তি হিন্দু ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তবে যে ঠাকুর বলছেন, সব ধর্ম সমান? এটাকে নিয়ে আমরা অনেকেই ভুল ভাবি। একেবারেই সমান না। মত পথ, জগতের বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আপনি জীবনমুক্তি মেনে নেবেন, তা কখনই সম্ভব না। তাই বলে আপনি অবতার তত্ত্ব মেনে নেবেন, তা কখনই সম্ভব না। তাই বলে আপনি নিরাকারও মানবেন আবার সাকারও মেনে নেবেন, তা একেবারেই না। হিন্দু ধর্ম একেবারে আলাদা ধর্ম। তবে হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এখানে সবারই স্থান আছে। অন্যান্য যতগুলো ধর্ম আছে, সব ধর্মই হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে কি আমরা বলতি পারি, ওটা হিন্দু সম্প্রাদায়? না, তাও বলতে পারি না। কারণ তারা বলে, আমার ঈশ্বর বাদে অন্য কোন ঈশ্বর নেই। হিন্দুরা এটা মানবে না। হিন্দুরা বলবে –মত পথ, তোমার মনের যেমন গঠন, তুমি সেই অনুরূপ যাবে। একটা সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

তারপর ঠাকুর বলছেন –**বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে**। সবাই ঈশ্বরকে পাবে, আর ঈশ্বরকে যখন

পাচ্ছে, তিনি জাগতিক নন, ঈশ্বর ঈশ্বরই। মিছরির রুটি সোজা করেই খাওয়া হোক আর বাঁকা করেই খাওয়া হোক, মিষ্টিই লাগবে। আপনি জেনে গেলেন, যে তত্ত্ব পৌঁছে গেলাম, এটা জাগতিক তত্ত্ব নয়।

আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, 'আমাদের মা-কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'। 'আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না। ঠাকুর এখানে মুসলমানদের কথা বলেননি। সবাই মনে করে, আমিই শ্রেষ্ঠ। জনসমক্ষে বলতে চায় না, কারণ এই কথা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। এটাকেই ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, আমার শহর শ্রেষ্ঠ, আমার ভাষা শ্রেষ্ঠ। আমি কত লোকের মুখে শুনতে পাই বাংলা ভাষা সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা। যদি জিজ্ঞেস করেন আপনি কটি ভাষা ভাল ভাবে জানেন? পাশের মৈথিলী ভাষা আপনি জানেন? সিয়াদের বলা উর্দু ভাষা শুনেছেন কখন? পার্সি ভাষা কখন শুনেছেন? ফ্রেঞ্চ ভাষা শুনেছেন কখন? এটা আমাদের বিরাট বড় সমস্যা। মানুষ ওই একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, শুধু ভাষাকে নিয়ে না, সমস্ত কিছুতে। যেমন আমি হিন্দু ধর্মের, আমার কাছে হিন্দু ধর্ম মহৎ ধর্ম। অন্য ধর্মের লোকেরাও একই কথা বলবে। ঠাকুর বিভিন্ন মতে সাধনা করেছেন, সাধনা করেছেন বলে তিনি এই কথা বলতে পারছেন।

তাহলে রক্তপাত কেন হয়? রক্তপাত কি শুধু ধর্মের জন্য হয়? ভারতবর্ষে কি কখন শুনেছেন যে, শাক্তরা বৈষ্ণবদের সঙ্গে কাটাকাটি করেছে? দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু ঘটনা আমরা শুনেছি; সেখানে বৈষ্ণব আর শৈবদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। কিন্তু শুধু ধর্মের নামে মারামারি করেছে, এক অপরের গলা কেটেছে, ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় না। শাক্তরা তো শক্তির পূজা করে, তারা কি কখন বৈষ্ণবদের গলা কেটেছে? শৈবরা কি কখন রামায়ৎদের গলা কেটেছে? ধর্ম গলা কাটে না, গলা কাটে টাকা। লোহা অর্থাৎ স্টীল গলা কাটে, কাটার পিছনে যে শক্তি কাজ করে, তা হল সোনা। সোনা বিচিত্র জিনিস, হয় নারীর অঙ্গে লেপ্টে থাকে, তা নাহলে বাক্সে বন্দী থাকে। বাক্সে শুয়ে থাকা আর গলায় বসে থাকা ছাড়া সোনার আর কোন কাজ নেই, অন্তত আগেকার দিনে যা হত। ইদানিং কালে তাও মাইক্রো চিপে একটু সোনা লাগে, আগে তো তাও লাগত না। অথচ এই সোনা স্টীল বা লোহার তৈরী তলোয়ারকে দিয়ে মানুষের গলা কাটিয়ে বেড়াচ্ছে, কি ক্ষমতা সোনার। বিভিন্ন ধর্ম যদি পড়েন দেখবেন, বলছে, তোমার লোকেরা যদি আমাদের ট্যাক্স দিয়ে দেয় ছেড়ে দেবে, তা নাহলে গলা কেটে দেবে। কিন্তু তোমার ধর্ম যদি আমি গ্রহণ করে নিই, তাহলে তো আর গলা কেটে নেওয়া যাবে না। কেন? তার পিছনে আবার বিরাট রাজনীতি রয়েছে। তাই বলে কি কাটে না? কাটে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের কাটছে। হিন্দুদের মধ্যে এই সমস্যা কখন দেখা যায় না। এই যে হিংস্র ভাব, এই হিংস্র ভাব মানুষের স্বভাবেই থাকে।

আসলে সব কিছুতে রয়েছে স্বার্থ। স্বামীজী বলছেন, খ্রীশ্চানিটি যেভাবে রক্ত বইয়েছে, আর কেউ এভাবে রক্ত বইয়ে দেয়নি। খ্রীশ্চানরা যখন সারা বিশ্বে লুটপাট করতে শুরু করল, ওরা তখন ধর্মকে সামনে রেখেই সব করত। যে কম্যুনিস্ট চীন আজ সম্প্রসারণবাদ আদর্শকে সামনে রেখে একটার পর একটা দেশের সীমা রেখাকে লঙ্ঘন করছে, সেই কম্যুনিস্ট চীনের চেয়ারম্যানের নামে এক সময় কলকাতায় কিছু যুক্তিবাদী, সমাজসংস্কারকরা আওয়াজ তুলেছিল চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এরা নাকি ইন্টেলেকচুয়াল, বুদ্ধিজীবি, যুক্তিবাদী; বলছে চীনের চেয়ারময়ন আমাদের চেয়ারম্যান। নিজের ধর্ম, নিজের দেশ, নিজের মাটি, নিজের সংস্কৃতি, নিজের ভাষা, নিজের ঐতিহ্যের প্রতি সেই সম্মান নেই, সেই ভালবাসা নেই। ধর্মের নামে নিজের দেশের ভাই-বোনের গলা কাটা যাচ্ছে, সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই এদের, কোন সহানুভূতি নেই। কিছু বললে ওরা সামনে ইডিওলজি রেখে দিচ্ছে। তিব্বতে চীন ঢুকে এটাই করল; তোমরা পশুর মত, আমরা তোমাদের শিক্ষা দেব। সেখানেও ওরা ইডিওলজিকে রাখছে। ঠিক তেমনি যারা দুষ্ট লোক তারা ধর্মকে রাখে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে কখন সম্প্রসারণবাদ জিনিসটা ছিল না। কায়দা করে অপরের সম্পদ লুট করব, হিন্দুরা এই জিনিস কখনই করত না।

এ-সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ-বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়।

যীশু দেখছেন তাঁদের মন্দিরে যারা মাতব্বর ছিল, তারা সেখানে ব্যবসা করছে, তাদেরকে তিনি মেরে তাড়িয়ে দিলেন। যীশু বলছেন –আমার বাবার যে স্থান, তাকে তোমরা অপবিত্র করছ। যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শন করেছেন, কদাচিৎ কখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটু রাগ আনতে পারেন, কিন্তু সেই রাগ তাঁর বেশিক্ষণ থাকবে না। যার জন্য যীশুকে যখন ক্রুশিফাই করা হচ্ছে তখন তিনি বলছেন, প্রভু তুমি এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি করছে। তাঁর শরীরকে ক্রুশের মধ্যে ঠুকে দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও তিনি ক্ষমায় প্রতিষ্ঠিত থাকছেন। সেখানে মতুয়ার বুদ্ধি কি করে চলবে যে, আমার মত ঠিক, তোমারটা ভুল! অজ্ঞতার জন্যই এগুলো হয়।

আমাদের সীমিত একটু জ্ঞান, ওইটুকু জ্ঞানের বাইরে অন্যান্য দিকে আমাদের exposer অত্যন্ত কম। Exposer হওয়ার জন্য মানুষকে নিজের গণ্ডীর বাইরে একটু বেরোতে হয়। বেশির ভাগ মানুষ নিজের ধর্মের কথাই পড়েনি, নিজের ধর্মকে জানে না, অপরের ধর্মের কথা কি বলবে! ছোট্ট একটা গণ্ডির মধ্যে মানুষ পড়ে আছে। আপনারা জানবেন আমেরিকার লোকেদের জ্ঞান সবচেয়ে কম। বলা হয়ে থাকে আমেরিকানরা যে খবরগুলিকে international news বলে, ওদের শহরের বাইরের যে খবর হয় সেগুলোই ওদের কাছে international news। কারণ ওরা নিজেরটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না। টাকা-পয়সা হয়েছে, এ্যটম বোমা আছে, আরও অনেক কিছু আছে; কিন্তু জ্ঞানের পরিধিটা অত্যন্ত কম। আমাদের বাচ্চারা তার থেকে বেশি জানে। কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকাটাই মানুষকে ধীরে ধীরে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। গণ্ডীতে বদ্ধ হওয়া থাকা মানে বুঝে নিন, আপনার বিনাশ কেউ আটকাতে পারবে না। আপনি ধর্মেরই হন, ইডিওলজিরই হন; গণ্ডীবদ্ধ হলেন মানে বাইরের জ্ঞান আহরণের জানালাটা বন্ধ করে দিলেন, এরপর আপনার নাশ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই বলে আবার ঝগড়া। যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

কারণ আপনি যেটাকে ধর্মগ্রন্থ বলে মেনে নিয়েছেন, ওই গ্রন্থের কথাই আপনার কাছে শেষ কথা হয়ে গেল। আমাদের কাছে একজন এসেছিলেন, উনি বিপাসনা করান, বয়স্ক ভদ্রলোক। আমি বুঝতে পারলাম না, বিপাসনা আবার ধর্ম কবে থেকে হল? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শেখাচ্ছেন, বসা শেখাচ্ছেন; ঠিক আছে, তাই বলে এটা ধর্ম কেন হতে যাবে। যুক্তিতর্কে না পেরে বয়স্ক ভদ্রলোক আমার উপর রেগে গেলেন। এত রেগে গেলেন দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ইনি শেখাচ্ছানে বিপাসনা! আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখাচ্ছেন, কিন্তু যুক্তিতর্ক করতে এসে অল্প একটু হাওয়াতেই উড়ে গেলেন, এক সেকেণ্ড দাঁড়াতে পারলেন না। ওনার বক্তব্য হল, রামকৃষ্ণ মিশনের যে ধর্ম দর্শন, এটা পুরো ভুল। কিন্তু এমন রেগে গেলেন যে, সঙ্গে স্ত্রী এসেছিলেন তিনি স্বামীকে আটকাচ্ছেন, তোমার হার্টের প্রবলেম আছে, বাইরে বেরিয়ে এসো। নিজের বাইরে কি আছে তিনি দেখছেন না, আর তাঁদের কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। একটু বৌদ্ধ থেকে, একটু যোগ থেকে, একটা ওখান থেকে নিয়ে একটা জগাখিচুরি বানিয়ে সেটাকে একটা পথ বলে চালাচ্ছেন। কিন্তু যাঁরা ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করছেন, এনারা আরও জঘন্য, ওই একটা বইকে নিয়ে চলছে। ওই বইটাকে নিয়ে যখন চলছে তখন বলছে, ‘এটা আমাদের ভগবানের দেওয়া জিনিস, এর উপর আপনি কি করে আঙুল তুলছেন। আঙুল তুলেছেন বলে আপনার হাত কেটে দেওয়া হবে’।

যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরও তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না।

এটাও একটি খুব ইন্টারেস্টিং বাক্য। ধর্মের ব্যাপারে যাঁরা কেবলই যুক্তি যুক্তি করেন, এই একটি বাক্য যদি ঠিক ঠিক বোধগম্য করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন, ধর্ম কিভাবে চলে। মানুষের মন বোঝে আকার আর আকারবিহীন। আমরা যে সাকার-নিরাকার বলছি, আমরা আমাদের মনের একটা অবস্থা থেকে বলছি, কারণ সেটার ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল। আমাদের এই জ্ঞানটা আছে যে, আমাদের মন এই রকম হওয়াতে আমরা জানি জিনিসটা ত্রিমাত্রিক –লম্বা, চওড়া আর উঁচু; হয় এর ভিতরে আছে, নয় বাইরে আছে। হয় একটা তার ফর্ম আছে, নয় তার ফর্ম নেই। এর বাইরেও তো কিছু হতে পারে। কি হতে পারে? আমরা কি করে বলব, মনের জগতে কর রকমের মন আছে আমরা কি করে জানব। ফিজিক্সে মাল্টি ডাইমেনসানের কথা বলছে। মাল্টি ডাইমেনশান বলতে কি বোঝায় ভগবান জানেন। তার মধ্যে আবার একটা স্টিং থিয়োরি এসেছে। স্টিং থিয়োরি এমন বিচিত্র বিচিত্র আইডিয়াস দিচ্ছে, এখন এগুলো যদি সত্য হয়, তাহলে মনের গঠনটাই পুরো পাল্টে যাবে।

আজকে আমরা যে সাকার-নিরাকারকে নিয়ে বলছি, সাকার-নিরাকার না হয়ে আরও তো অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু আমরা সেসব কি করে জানব? এই যে ঠাকুর এখানে বলছেন –আরও তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না; এটাই ঠিক ঠিক কথা যেখানে যুক্তি গিয়ে দাঁড়ায়। যদি আপনি বলেন হয় তিনি সাকার, নয় নিরাকার; নাহলে যদি বলেন, যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার –এভাবে এখানে ইতি করা যাবে না। কারণ মনের পারে যেটা আছে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা যায় না। আর মনের পারে যিনি অনন্ত, তাঁর কত রকমের আরও মন হতে পারে আমাদের কোন আইডিয়াই নেই, আমরা জানি না। এটাই হল তত্ত্ব। এই কথা বলে ঠাকুর নামকরা হাতির গল্প বলছেন।

হাতির এই গল্প অরিজিন্যালি জৈন ট্রাডিশান থেকে এসেছে, আর অনেক জায়গায় এই গল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকজন অন্ধকে একটা হাতির কাছে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধরা হাতিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, আর বিভিন্ন অন্ধ ব্যক্তি হাতির ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আইডিয়া দিচ্ছে। জৈন ধর্মে সিয়াদবাদ আছে, সেখানে বলা হয় সিয়াদ অস্তি, সিয়াদ নাস্তি। সিয়াদবাদ হল, probalistic; অঙ্কে যে probalistic হয়, এটাও হতে পারে, নাও হতে পারে। জৈনদের সিয়াদ অস্তি, সিয়াদ নাস্তি এই রকম করে সাত খানা শর্ত আছে। কিন্তু এই কাহিনীটা খুব সুন্দর জনপ্রিয় কাহিনী। মন দিয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখবেন, সীমিতই দেখবেন। চিন্তা ভাবনা করে, বই পড়ে নিজের মত একটা ভাবনা হয়ে গেছে, তার বাইরে আর কিছু সম্ভব না।

এরপর ঠাকুর আবার গিরগিটির কথা বলছেন। গিরগিটি আপনারা জানেন গাছে থাকে, আর যেমন পরিবেশে থাকবে সেই পরিবেশ অনুযায়ী তার রঙ হয়ে যায়। ওদের গলার কাছে কিছু colour elements থাকে, যার ফলে ওদের রঙ পাল্টে যায়। খুব নামকরা গল্প। আগেকার দিনে লোকেরা মাঠে ঘাটে বাহ্য করতে যেত। একজন একটা গিরগিটি দেখে এসে বলছে, লাল রঙের গিরগিটি দেখলাম। আরেকজন বলছে, না ওটা সবুজ; একজন বলছে নীল, আরেকজন বলছে হলদে। তখন একজন বলছে, '**আমি ওই গাছতলাতেই থাকি; আর ওই জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি, –কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রঙ হয়। আবার কখন দেখি একেবারে কোন রঙ নাই। নির্গুণ**'।

আমেরিকার একজন প্রফেসার উনি কম্পারাটিভ রিলিজিয়ান পড়ান। অনেক আগেকার কথা, আমি দেরাদুন গিয়েছিলাম, সেখানে তিনি এটাকে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। 'রামকৃষ্ণ যে গিরগিটির কথা বলছেন, তার মানে তিনি ঠিক আর অপরে ভুল, এটারই বা কি প্রমাণ আছে'? উনি লজিক্যালি জিনিসটাকে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি ওনাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এই জিনিসটা যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না। এখানে Sri Ramakrishna is the authority। উনি তখন বলছেন, তাহলে What about Jesus? আমি ওনাকে আবার বোঝানর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু উনি কিছুতেই

বুঝতে রাজি হচ্ছিলেন না। ওনার বক্তব্য হল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেটা বলছেন, এটা self contradictory। কারণ একদিকে আপনি বলছেন যে, তুমি যেটা বলছ সেটা ঠিক না। তাহলে যিনি বলছেন তিনি ঠিক বলছেন না, কিন্তু আপনি যে ঠিক তার কি প্রমাণ? ওনার ওটা সত্যিকারের প্রশ্ন ছিল, তর্ক করার জন্য আসেননি।

যুক্তিতে এটাকে বলে অনবস্থা দোষ। আপনি যুক্তি করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাবেন, যেখানে দাঁড়ানোর আর কোন জায়গা থাকবে না। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটাকে ধরেছিলেন, যুক্তিতে একটা জায়গায় গিয়ে অনবস্থা দোষ হয়ে যায়। বৌদ্ধদের এই সমস্যা হয়ে যায়, অনবস্থা দোষ হয়ে যায়, বৌদ্ধরা তাই নিয়ে এলেন শূন্যবাদ। স্বামীজী এক জায়গায় সেইজন্য খুব সুন্দর বলছেন, ঠিক ঠিক যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে যান, তাহলে আপনাকে হয় শূন্যবাদে চলে যেতে হবে, আর তা নাহলে সেই এক ছাড়া কিছু নেই, এতে চলে যেতে হবে। স্বামীজীর এই কথা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্ম জীবনে যদি একটা কোন আধার না করা হয়, তাহলে ধর্ম জীবন হবে না, কারণ শুধু যুক্তিতর্ক দিয়ে চলা যায় না। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটা খুব সুন্দর বুঝেছিলেন, সেইজন্য তিনি বলে দিলেন, বেদ হল প্রমাণ। আজও বেদান্তের সব রকম যুক্তিতর্ক যখন চলে তখন ওনারা এটাকে মেনে নিয়ে চলেন, বেদ হল প্রমাণ।

ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ। কার জন্য? আমার জন্য; যার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এটা তার কাছে প্রমাণ। আজ আমার ঘনিষ্ট একজন পরিচিত ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন, কানপুরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই করোনায় আক্রান্ত। উনি আমাকে মেসেজ করে যাচ্ছেন, স্বামীজী আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, এবারও একটু কৃপা করুন। কি আর বলব, আপনি একটা বিশ্বাসকে জুড়ে নিয়েছেন। আমি সবাইকে ভালবাসি, সবারই প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। আমার মাথায় ঘুরছিল, স্বামীজী এক জায়গায় খুব সুন্দর কথা বলছেন I have no fear of death। হিমালয়ে নদীর ধারে বসে আছেন, আর একটা পাথর নিয়ে পাথরটাকে আর-একটা পাথরের উপর ঠুকছেন, ঠুকে ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর বলছেন, I have no fear of death, because I have seen God। আবার বলছেন, it has the feet of the God। সেখান থেকে আমার মাথায় কেবলই এটা ঘুরছিল, নরেন্দ্রনাথকে এই পথে আনার জন্য ঠাকুরকে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ওই দুর্দান্ত ঘোড়ার মত শক্তি। তাঁকে ঠাকুর বারবার দেখাচ্ছেন –দেখ আমি ঈশ্বর। তারপরেও গুডউইন মারা যাওয়াটাকে মন থেকে নিতে পারছেন না, বলছেন –যে ঈশ্বর আমার গুডউইনকে কেড়ে নিয়েছেন তাঁর সাথে লড়াই করব। কেন? কারণ এই জগতে স্বামীজীর কাজ যাঁর মাধ্যমে হচ্ছিল, সেই গুডউইন আর নেই। কিন্তু স্বামীজী মৃত্যুকে কোন পরিস্থিতিতেই ভয় পাচ্ছেন না।

এই দুটো আলাদা জিনিস, লোকেরা প্রায়ই দুটিকে গুলিয়ে ফেলেন। আমি যদি আপনাকে ভালবাসি, নিয়মিত আমি যদি আপনার সাথে কথা বলি, তার মানে আপনার সাথে আমার একটা ইমোশানাল বণ্ড রয়েছে। আপনি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যান, আমার জীবনে স্বাভাবিক ভাবে একটা শূন্যবোধ অবশ্যই আসবে। ঠিক সেই ভাবে আপনি যদি আমাকে ভালবাসেন, আমি যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যাই, আপনার জীবনেও একটা শূন্যবোধ অবশ্যই হবে। তাই বলে মৃত্যুকে ভয় পাবেন কেন। দুটো আলাদা জিনিস। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, একজন গত হয়ে গেলে যে পড়ে থাকবে তার শূন্যবোধ অবশ্যই হবে, তাই বলে মৃত্যুকে ভয় পাবেন কেন? স্বামীজীর ওই কথাটাই ভাবছিলাম, সত্যিই স্বামীজী কি আনন্দে বলছেন –I have no fear of death, because I have seen God।

ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস পর্যন্ত যদি কারুর হয়, তাতেই তার মৃত্যুকে তুচ্ছ বলে বোধ হবে। এখানে ঠাকুর যাঁদের সামনে এই কথাগুলো বলছেন, তাঁদের মনের উপর কেমন ছাপ পড়ছে! ঠাকুর কখন কাউকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, শুধু একটা কি দুটো কথা বলে তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছেন, চাউনি

দিয়ে শক্তি সঞ্চার করেছেন আর তার মনটাকে সেই জায়গায় তুলে নিয়ে আসছেন। যাদের পাত্রতা আছে তাদেরকেই করছেন, যাদের পাত্রতা নেই তাদের কথা বাদ দিন। ঠাকুর যাঁদের সামনে এই কথাগুলো বলছেন, সবাই অবাক হয়ে শুনছেন। তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ। কিন্তু একজন খ্রীশ্চান প্রফেসার, আমেরিকাতে অধ্যাপনা করেন, তাঁর কাছে এটা প্রমাণ হবে না। আমরা হিন্দুরা অনেক খোলা মনের, আমরা খ্রীশ্চানদের বই পড়ি, বৌদ্ধদের বই পড়ি, মুসলমানদের বই পড়ি, অন্যরা খোলা মনের লোক না। ফলে হিন্দুদের শক্তি অনেক বেশি। যার জন্য এত মার খাওয়ার পরেও আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পার্সি মার খেল, দাঁড়াতে পারল না। জহুদিরা মার খেল, দাঁড়াতে পারল না। হিন্দুরা মার খেল, আর এখনও মার খেয়ে যাচ্ছে, বিধর্মীদের হাতে মার তো খাচ্ছেই নিজের লোকেদের কাছ থেকে আরও বেশি মার খাচ্ছে, রোজ হিন্দু মরছে। কেন মরছে? একমাত্র এইজন্য মরছে, কারণ সে হিন্দু। এমনি না, বিভিন্ন কারণে হিন্দু মরছে, সারা দেশেই এটা চলছে। লুটপাট করছে, বাড়ির মেয়েদের তুলে নিচ্ছে, কেন? শুধু হিন্দু বলে। তাও আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ঠাকুর গোস্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে যাচ্ছেন।

(গোস্বামীর প্রতি) –তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ করে আসেন, এও সত্য। এই যে আমরা বললাম, এটা হল হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য; যেমন জীবনমুক্তি বৈশিষ্ট্য, ঠিক তেমনি অবতারতত্ত্ব আমাদের বৈশিষ্ট্য। অন্য ধর্মে এটা মানা তো দূরের কথা নিতেই পারবে না, তাদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। খুব দামী কথা –শুধু অবতাররূপ না, নানারূপ ধারণ করে তিনি দেখা দেন। ঠাকুরের জীবনে আমরা কত দেখছি, নানান রূপ ধারণ করে তিনি ঠাকুরের সামনে আসছেন, বলছেন, মা রতির মার বেশে এলো। কখন দিগম্বরী মেয়ে, কখন মুসলমানের মেয়ে রূপে আসছেন। বিভিন্ন রূপে দেখা দেন। আমি মজা করি বলি –ঠাকুর এই জীবনে তো দর্শন হল না, মৃত্যুরূপে যদি দর্শন হয়, তাই হবে। যদি হৃদয়ে আমার এতটুকু বিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে মৃত্যুরূপেও আপনি আসেন। কিন্তু বাস্তব হল, ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে এসে দর্শন দেন। যার জন্য এটাকে নিয়ে অনেক কাহিনী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, বিভিন্ন ভাষায় বানানো হয়েছে। **আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে**।

কিরকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। বরফটা যে শেষ কথা, বলা যাবে না; জলটা যে শেষ কথা, তাও বলা যাবে না। প্রথমে বরফ দেখলে বরফটাই সত্য বলে মনে হবে; প্রথমে জল দেখে থাকলে জলটাই সত্য বলে মনে হবে। **অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে –ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে**। কথামৃতে এই ভাব অনেকবার এসেছে।

তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন কোন কোন ভক্ত আছেন, তাঁরা ঈশ্বরকে সব সময় সাকার রূপেই দেখেছেন, তাঁদের কাছে ঈশ্বর নিত্য সাকার। যেমন মহাবীর হনুমান, তাঁর কাছে শ্রীরামচন্দ্র হলেন নিত্য সাকার, নির্গুণ-নিরাকার রূপে তিনি নেবেন না। **এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে**। কিছু কিছু ভক্ত আছেন, যাঁরা বলেন, আমার রূপটুপ লাগবে না। যারজন্য ভক্তিশাস্ত্রে যে মুক্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ইত্যাদি মুক্তির কথা বলছেন। কিন্তু সাযুজ্য, যেখানে ঈশ্বরের সাথে সমানতা হয়ে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান, এটাকে বৈষ্ণবরা মানবেন না। যাঁরা জ্ঞানী বা জ্ঞানমার্গী, সাযুজ্য তাঁদের জন্য। ঠাকুর এই কথাগুলো এখন বলছেন, আর আমরা এই পরম্পরায় বড় হয়েছি, তাই এই

কথাগুলো আমাদের কাছে নূতন বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই সময়ে যাঁরা ঠাকুরের মুখে এই কথাগুলো শুনছিলেন, তাঁদের কাছে সাংঘাতিক কথা। আর অন্যান্য ধর্মের দিকে যদি তাকান, তখন বুঝতে পারবেন এই কথার কি দাম।

কেদার –আজ্ঞে, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস তিনটে দোষের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্! তুমি বাক্য মনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা –তোমার সাকাররূপ –বর্ণনা করেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন। কথামৃতে (পৃঃ ১৫২) নীচে ভাগবতের শ্লোকটাও মাস্টারমশাই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি সব জায়গায় আছেন, অথচ আমি তীর্থে তাঁকে দর্শন করতে গেছি, এই ধরণের অপরাধের কথা বলছেন। হিন্দুরা মনে করেন, যিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাঁকে আমি সাকার রূপে বর্ণনা করলাম, এতে আমার অপরাধ হয়েছে; প্রভু আমার এই অপরাধ মার্জনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না। মন বুদ্ধি দিয়ে আমরা কি করে তাঁকে বলতে পারি তিনি কি। ঈশ্বরের ব্যাপারে একটিই কথা বলা যায় –তিনি অনন্ত, অনন্ত বলে তাঁর ইতি করা যায় না। সপ্তম পরিচ্ছেদ এখানে শেষ হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য

১১ই মার্চ, ১৮৮৩, ঠাকুরের জন্মদিন, দক্ষিণেশ্বরে উৎসব হচ্ছে। অনেক ভক্ত ও লোকজনের সমাগম হয়েছে। ভক্তদের সাথে অনেক কথা হয়েছে। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন, **রাখালের বাপ বসিয়া আছেন**। এই sectionটা খুব interesting। **রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরানীর পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন**। ইত্যাদি বর্ণনা করার পর রাখালের পিতার ব্যাপারে বলছেন –**ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা করিতে হয়**।

রাখালের পিতা বসিরহাটের কাছে সিকরা কুলিন গ্রামের লোক, ভক্তরা অনেকেই হয়ত সেখানে গেছেন। সেখানে তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। রাখাল ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র। পরবর্তিকালে রাজা মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন। স্বামীজী বলতেন, *গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু*, গুরুর যিনি পুত্র তাঁকে গুরুর মতই দেখতে হয়। খুব নামকরা কথা। সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের সন্তান, সেইজন্য সন্ন্যাসীদের সবাই প্রণাম করেন, সম্মান দেন। অন্যান্য সম্প্রদায়েও সন্ন্যাসীকে নারায়ণ রূপে দেখেন, কারণ এটাই; সন্ন্যাসীরা নারায়ণের সন্তান। অথচ রাজা মহারাজের জন্ম এমন এক পরিবারে, যাঁরা অত্যন্ত বিষয়ী।

মাস্টারমশাই বলছেন, **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি আসেন। রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন**।

বাইশ তেইশ বছরে আমি ব্রহ্মচারী হয়ে গেছি, ওই বয়সে এই দুটি লাইন পড়ে তখনই আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর সর্বত্যাগী, সেই সর্বত্যাগীর যিনি মানসপুত্র, আধ্যাত্মিক সন্তান যিনি, তিনি হলেন রাজা মহারাজ। সেই রাজা মহারাজের পিতা আসছেন ঠাকুরের কাছে এই সুযোগ নিতে যে, ঠাকুরের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসে, যাতে এদের কাছে বিষয়কর্মের সাহায্য নেওয়া যায়। আমি দেওঘরে ব্রহ্মচারী হয়ে জয়েন করেছিলাম। আমার তখন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, সন্ন্যাসীরা যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে সবাই ছেলের ভর্তি বা এই ধরণের সুযোগ নেওয়ার জন্যই আসেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ, অনেক বছর আগে গত হয়েছেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার বই 'The World of Religion'ওনার

নামে উৎসর্গ করেছি। একদিন দেখছি, একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সাথে মহারাজ আধ্যাত্মিক চর্চা করছেন। দেখে অবাক হলাম, এই রকম লোকও আছে যাঁরা আমাদের সন্ন্যাসীর কাছে এসে ধর্মচর্চা করেন। ইদানিং ইউনিভার্সিটি হওয়ার পর অনেকেই এসে ধর্মচর্চা করেন, দেখে ভাল লাগে। ঠাকুর নিজেই বলতেন, অনেকে সাধুসঙ্গ করে যাতে গাঁজা খেতে পারে। চোরের মন বোঁচকার দিকে থাকে। সাধু-সন্ন্যাসীদের যাওয়ার আগেই প্ল্যান করে রাখে, ওনার কাছে এই এই সাহায্য নিতে হবে। আসার পরে মন যদি পালটায় সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু আগে থেকেই ঠিক করে রাখছে। কথামৃতের এই কথাটা পড়ে তখন আমার হাসি পেয়েছিল, এখনও পড়লে হাসি পায়। সত্যিই কি আশ্চর্য, রাজা মহারাজ ওই বংশেরই লোক; যেন দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ।

এই পরিচ্ছেদে এই টপিকটা চলবে। এখন নানান রকম কথা উঠবে, ওনার ঠাকুরমা ওই রকম ছিলেন, দিদিমার বংশও এই রকম ছিল, যাই থাকুক। এখানে পরিষ্কার বলছেন, রাখালের বাবা কেন ঠাকুরের কাছে আসতেন। ওনার কোন চেতনাই হল না। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন, বেশির ভাগই সাহায্য নিতে আসেন। ছেলেকে ভর্তি করাতে হবে, রোগী ভর্তি করাতে হবে। আমরা সন্ন্যাসী, আমরা কাজকর্মে আছি। ঠাকুর সব সময় সমাধিতে থাকছেন, কোন কিছুতেই নেই, তাতেও লোকেরা আসছে ওই ভাব নিয়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা –রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান।

ভেবে অবাক লাগে, প্রত্যেক মানুষকে কিভাবে মহৎ কোন কাজের জন্য একটা কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ঠাকুর বুঝে গেছেন রাখাল কি, তিনি চাইছেন রাখাল যেন এখানে তাঁর কাছে থাকে। বুঝতে পারছেন, ঠাকুরের যে আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য হতে যাচ্ছে, সেই সাম্রাজ্যের প্রথম রাজা ইনিই হবেন। আর এই রাজা মহারাজ পুরো সঙ্ঘকে একটা বাস্তব আকার দিয়ে গেলেন। রাজা মহারাজ না থাকলে সঙ্ঘের জন্মলগ্নে যে সমস্যাগুলো মাথা চাড়া দিয়েছিল, সেগুলোকে কেউ সামলাতে পারত না। স্বামীজী তো মঠ বিক্রিই করে দিতে চাইছিলেন। স্বামীজী যদি প্রথম প্রেসিডেণ্ট হতেন, কি যে করে বসতেন ভগবান জানেন। স্বামীজীর শিবের ভাব, দাও সব কিছু দিয়ে দাও, যা হবে দেখা যাবে। রাজা মহারাজের কৃষ্ণের ভাব, তিনি সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন। স্বামীজী এটা বুঝেছিলেন, তাই রাজা মহারাজকেই প্রথম প্রেসিডেণ্ট করলেন। অথচ নির্বিকার, ভগবান কৃষ্ণ যেমন সব সময় নির্বিকার, সব কিছুতে পুরো নিষ্কাম। রাজা মহারাজও সেই রকম পুরো নির্বিকার, পুরো নিষ্কাম, খুব কম কথা বলতেন। অন্য দিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

ঠাকুর রাখালের পিতার স্বভাব সব বুঝতেন, কিন্তু রাখালের কথা ভেবে সব সহ্য করছেন। অন্য কোন বিষয়ী লোক হলে, ঠাকুর যে ভাষায় গালাগাল দিতেন, ওই ভাষায় গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। রাখালের বাবা, ঠাকুরও সহ্য করছেন। তাই না, রাখালের যখন বিয়ে হল; বিয়ের পর পুত্রবধূ এসেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বললেন, টাকা দিয়ে বউমার মুখ দেখতে। কারণ তিনি রাখালকে সন্তান রূপে দেখছেন। আমরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জিনিসগুলি দেখি, আর সত্যিই এগুলোই আসল। কিন্তু এই যে সংসারের আচরণ, বউমার মুখ দেখবেন, হিন্দুদের প্রথা টাকা দিয়ে মুখ দেখতে হয়; সব বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। ঠাকুর রাখালের সুখ্যাতি করছেন, কিন্তু বাড়িয়ে কিছু বলছেন না, যেটা আসল সেটাই বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি) –আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ –দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা, তাই ঠোঁট নড়ে।

বাণী চার স্তরে চলে –পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী; এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। আমরা সাধারণ অবস্থায় যে কথাবার্তা বলি, এটাকে বলে বৈখরী। বৈখরীর পিছনে থাকে মধ্যমা, আরও সূক্ষ্ম। ঠাকুর যখন বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে; একই জিনিস, যখন প্রসঙ্গ আসবে তখন আমরা আবারও বিস্তারে আলোচনা করব। একজন শ্রোতা আমাকে লিখলেন, আপনি এত করে বলেছেন দিনে দশ হাজার করে জপ করতে, আমারও খুব ইচ্ছে যে একদিন দিনে দশ হাজার বার জপ করি। ট্রেনিং না থাকল, সেই রকম পরিবেশ না হলে দশ হাজার বার জপ করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সমাজে থাকলে দিনে দশ হাজার করে জপ করা মুশকিল। যখন আপনার সেই সময় আসবে, ঠাকুর তখন নিজেই আপনার সুযোগ সুবিধা করে দেবেন।

ঠাকুরের ভাবে, রামকৃষ্ণ পরম্পরায় যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁদের বলা হয় মন্ত্র জপ করার সময় যেন ঠোঁট না নড়ে, জিহ্বা পর্যন্ত যে না নড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সাধনা-পদ্ধতি, এই পদ্ধতি ধ্যানের দিকে নিয়ে যায়। ভক্তি সাধনে যেমন কীর্তন করা, নৃত্য করা; এই জিনিসের ভাব আমাদের কম। আমাদের মধ্যে বেদান্তের ভাবটা বেশি। বেদান্ত ভাবে ধ্যানের প্রাধান্য। ধ্যানের প্রাধান্যে যেতে হলে প্রচুর জপ যাঁরা করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হল পুরো শরীর-মনকে সেই অবস্থায় চলে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু জপ করাটা উদ্দেশ্য না, যদিও শ্রীশ্রীমা বলছেন জপাৎ সিদ্ধি। আমরা আমাদের অনেক মহারাজদের দেখেছি যাঁরা সারাদিনে প্রচুর জপ করতেন। আমাদের ছিলেন স্বামী গীতানন্দ, মঠের সহাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁকে দেখতাম সারাদিন জপ করছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যটা হল জপের মধ্য দিয়ে শরীর আর মনকে ওই উচ্চ চেতনার ভাবে নিয়ে চলে যাওয়া। ওই ভাবে নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ধ্যানের গভীরে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু যে মহারাজদের প্রচুর জপ করতে দেখেছি, তাঁরাও কিন্তু যে জপ করতেন সেটা বোঝা যেত জপের মালাটা নড়ছে বলে। মালা নড়াটা কতটা মেকানিক্যাল বলা খুব মুশকিল, কারণ এনারা খুব গভীরে ঢুকে যেতেন। জপ করতে করতে গভীরে যদি না ডুবে যান, যেখানে আপনার হুঁশ নেই যে পাশে কি হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার জপে কিছু গোলমাল আছে।

যদি প্রচুর জপ করেন, কাউন্টিং না করে দিনে সাত আট ঘণ্টা করেন, একভাবে না বসেও, আসনে বসে, চেয়ারে বসে, চলতে-ফিরতে, পায়চারি করতে করতে, বিছানায় দেওয়ালে হেলান দিয়েও করা যায়, কোন অসুবিধা নেই। গুরু যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন সেটা করে বাকি নিজের মত করা যায়। কারণ আপনাদের বেশির ভাগেরই বয়স হয়েছে, এই বয়সে আসনে অতক্ষণ বসতে পারবেন না, সেইজন্য চেয়ারে হেলান দিয়ে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বা পায়চারি করতে করতে জপ করতে পারেন। অনেক জপ করে মন যদি অন্তর্মুখী হয়ে যায়, তখন যদি চারজনের মাঝখানে বসে, যেমন রাখাল বসে আছেন, তখন কি হয়, ভিতরে যে জপ হচ্ছে, থেকে থেকে ওই ভাবটা ঠোঁটে বেরিয়ে আসে। আমি যদি দেখি আমার কাছে বসে ঠোঁট নাড়ছেন, দুটো কটূ কথা আপনাকে আমি বলে দেব, কারণ ওটা পরিষ্কার ঢং বাজি।

ভক্তিমার্গে এটা বিরাট সুবিধা, লোকেরা এত ঢং ঢাং করে, এত ধাপ্পাবাজি করে, এই করেই দেশটার সর্বনাশ হয়ে গেল। স্বামীজী যে বারবার বেদান্তের উপর জোর দিলেন, তার প্রধান কারণ এটাই, এই ধাপ্পাবাজি বন্ধ করা। ভক্তিমার্গে লোকেদের ঠকানো যায়, বেদান্তে ঠকানো যায় না। বেদান্তে কেউ যদি ঠকাতে যায় সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে। বেদান্ত একটুও ডানদিক বামদিক করতেই দেবে না। সেইজন্য দেশের জন্য দরকার বেদান্ত। চৈতন্য মহাপ্রভু দু-বাহু তুলে নৃত্য করেছিলেন, তখন ওরও দরকার ছিল। কারণ মুসলমানদের তখন অত্যাচার চলছে, উপায় নেই, লোকেদের বাঁচাতে হবে। এখন তো নিজের সাম্রাজ্য, এখন আর কিসের সমস্যা। এখন শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। শক্তি বেদান্ত দিয়ে আসে। বেদান্ত বলতে মূল বেদান্ত; স্বামীজীও বারবার বলছেন, Go back to Upanishads। উপনিষদ পড়ুন, গীতা পড়ুন, মনটাকে উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যান, আর জানুন আপনি কে।

আপনি হয়ত ছয় ঘণ্টা, আট ঘণ্টা ধরে জপ করেছেন, তারপর আপনাকে যদি পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হয়, আপনি চুপচাপ আছেন আর অন্যরা কথা বলছেন, ঠোঁট তখন নিজে থেকে নড়ে যায়। এটা মধ্যমা থেকে বৈখরী অবস্থায় চলে আসে বা এমনকি পশ্যন্তি থেকেও, মনটা অনেক ডুবে আছে। আপনি বাইরে আছেন, কিন্তু ভিতরে পুরোদমে জপ চলছে। ওটাকে চেপে রেখেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে যায়। চুপচাপ বসে আছেন, হঠাৎ মাঝে মাঝে ঠোঁটটা নড়ে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় যে ভিতরে জোর জপ চলছে, জপও প্রচণ্ড স্পীডে চলে। প্রথম প্রথম একশ আটবার জপ করতে পাঁচ মিনিট লেগে যাবে, কিন্তু রাজা মহারাজ এনারা যে স্টেজে জপ করছেন, তিরিশ সেকেণ্ডে একশ আটবার তাঁদের জপ হয়ে যায়। কারণ তখন ভোকাল কর্ডগুলো শান্ত হয়ে যায়। এগুলো অনেক জপধ্যান অনেকদিন ধরে করলে বুঝতে পারা যায়। এখানে এই জিনিসটাকে উল্লেখ করা হয়েছে বলে একটু ব্যাখ্যা করে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে জপ চলতে থাকলে নিজে থেকেই কুম্ভক হয়ে যায়। কুম্ভক অবস্থা থেকে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস আবার বেরিয়ে আসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত। দেখলেই বোঝা যায়, দমটা ভিতরে বন্ধ ছিল, নিজে থেকেই আবার বেরিয়ে এসেছে।

এ-সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঠাকুরের আগমনের পর থেকে নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি এই শব্দগুলো এত পরিচিত হয়ে গেছে যে, ঠাকুরের সময়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বংশধররা এখন প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন, উনি ঈশ্বরকোটির ছিলেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ ছিলেন। একবার একজন ভক্ত আমাদের জিজ্ঞেস করছেন –'আচ্ছা মহারাজ আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়, আমি কোন থাকের'? ঠাকুর থাকলে প্রথমে বলতেন, ঢ্যামনা; তারপর একটা দুটো কথা বলতেন। খুব উচ্চমানের গভীর তপস্যায় যখন যায়, তখন এই দেহকে ভুলে গিয়ে তার আমিত্বটা চলে যায় সূক্ষ্ম শরীরে। সূক্ষ্ম শরীর মানে, যে শরীর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে তৈরী। এই সূক্ষ্ম শরীরের পারেও যখন যায়, তখন সেটা যায় কারণ শরীরে। এটা আমরা আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে –বেদান্তে তিনটে শরীরের কথা বলা হয় –স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। ঠিক তেমনি তিনটে জগতের কথা বলছেন – স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ। এই তিনটে জগতের পারে হলেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যিনি অখণ্ড; এই অবস্থার বর্ণন করা যায় না, বোঝান যাবে না জিনিসটা কি। অবতাররাও বোঝাতে পারেন না, সেখানে আমি কি বোঝাব; আর আমারও নিজের ধারণা নেই, একটা ভাসা ভাসা ধারণা।

সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপর একটা অজ্ঞান আবরণ পড়ে; অজ্ঞান আবরণ মানে, আমি এক আমি বহু হব; 'আমি বহু হব', এটাই অজ্ঞান। অজ্ঞান শব্দটা ঠিক না, এটাকে বলে *সকাময়ত*, কামনা। যে অর্থে আমরা অজ্ঞান শব্দের ব্যবহার করি, সেই অর্থে এখানে অজ্ঞান বলাটা ঠিক হবে না, এটা হল কামনা। নাসদীয় সূত্রেই বলছেন, সর্বাগ্রে কাম ছিল। এই কাম যখন আসে তখন যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, সেখানে যেন মনের এক জগৎ সৃষ্টি হয়ে যায়। এই জগৎটাই কারণ জগৎ। এখানে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখতে পান, তবে মাঝখানে যেন একটা আবরণ থাকে। ঠাকুর লণ্ঠনের উপমা দিয়ে বলছেন, যেমন কাঁচের ভিতর আলো, দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না, কারণ সেখানে কাঁচের একটা ব্যবধান রয়েছে, এটাই কারণ জগৎ। এই কারণ জগতের যাঁরা বাসিন্দা, যদিও খুব কম লোক হন; এনারা হলেন নিত্যশুদ্ধ। এনারা সব সময় ঈশ্বরকে দেখতে পান, চাইলেই দেখতে পান। এখন কারণ জগতে অনেক স্তর আছে, যেমন এই পৃথিবীতে অনেক শহর আছে, কলকাতাও আছে, দিল্লিও আছে, মুম্বাইও আছে আবার লণ্ডন, নিইয়র্কও আছে। তারও তারতম্য আছে।

সেখান থেকে জিনিসটা আরও যখন স্থূলের দিকে যায়, সেটাকে বলা হয় সূক্ষ্ম জগৎ। সূক্ষ্ম জগতে মনের প্রাধান্য বেশি, চৈতন্যের প্রাধান্যটা এবার কমে গেল। যতগুলো স্বর্গলোক আছে, এগুলো সব হল সূক্ষ্ম জগতের –পিতৃলোক, অপ্সরা লোক, গন্ধর্বলোক, নাগলোক সব সূক্ষ্ম জগতের। মৃত্যুর পর আমরা সবাই সূক্ষ্ম জগতে যাই, কারণ জগতে আমরা যেতে পারি না। সূক্ষ্ম জগতের লেয়ারস আরও অনেক বেশি। আজকের দিনে আমাদের কলকাতাতে অনেকেই আছেন যাঁরা কেউ দেবলোক থেকে

এসেছেন, কেউ উচ্চমানের ঋষিদের সিদ্ধলোক থেকে এসেছেন, কেউ অপ্সরা লোক থেকে এসেছেন, যক্ষলোক থেকে এসেছেন। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রেতলোক থেকে এসেছেন। কিন্তু কারণ জগৎ থেকে যাঁরা আসেন তাঁরাই একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে আসেন। সেইজন্য দেখা যায়, অবতার যখন আসেন তখন সাঙ্ঘাতিক একটা আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত হয়। এখনও আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই যে রাখাল, নরেন, হরি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শশী মহারাজ; এ-রকম লোক পাওয়া যাবে না, সম্ভবই না। নূতন জয়েন করার সময় আমাকে একজন বলছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের এতদিন হয়ে গেল, আরেকটা স্বামী বিবেকানন্দ কি হয়েছে? তখন তো আমি জানতাম না কি উত্তর দিতে হবে, এখন হলে বলে দিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হয় না, স্বামী বিবেকানন্দকে আনতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের মত অবতারকে আসতে হবে। এলেও তিনি স্বামী বিবেকানন্দ রূপে থাকবেন না, তিনি আরেকটা রূপে থাকবেন, কিন্তু শক্তিটা সেই রকমেরই হবে। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যেমন মহাবীর হনুমান, ওই শক্তিটাকে নিয়ে আসবেন। যাঁরা এই কারণ জগৎ থেকে আসেন, যাঁরা অবতারের সঙ্গী তাঁদের কথাই ঠাকুর বলছেন –এ-সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক, আবার অনেককে ঈশ্বরকোটিও বলছেন।

যদিও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এগুলো বেদান্ত থেকেই আসে, তবে বেদান্তের যে ভক্তিভাবের দিকটা আছে সেখান থেকে এটা বেশি আসে; কারণ বেদান্ত বেশি জোর দেয় মুক্তিতে –জীবনমুক্তি আর মুক্তি। ভক্তি বেদান্তরই একটা দিক, ওনারাও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ আর নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি এগুলোর উপরেও জোর দেন। তবে মন্দের ভালো বলাটাও ঠিক না, কারণ পরে ঠাকুর বলবেন –আপনি যখন ওই আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে চলে গেলেন, তারপরে যা হওয়ার সেটা ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি আপনাকে মুক্তি দেবেন, নাকি নিত্যসিদ্ধ করে রাখবেন, নাকি ঈশ্বরকোটি করবেন; তাঁর ইচ্ছা, ওটা আমাদের হাতে নেই।

ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। কারণ জগতের যাঁরা বাসিন্দা, ঈশ্বরজ্ঞান তাঁদের কখন বিস্মৃত হয়ে যায় না, সব সময় থাকে। **একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই**।

এই কথা বলে ঠাকুর হোমাপাখির কথা বলছেন। হোমাপাখি একটা মিথলজিক্যাল ব্যাপার। ঠাকুর হোমাপাখির কথা খুব বলতেন। কোথায় হোমাপাখির কথা আছে জানা নেই। ঠাকুর বলছেন, বেদে আছে। কেউ হয়ত বলেছেন, ঠাকুর শুনেছেন, তিনি তো আর এগুলো পড়ে দেখেননি। বেদে 'সুপর্ণ' শব্দটা আছে, যেখান থেকে গরুড়ের কথা আসে, ওখান থেকে কেউ হয়ত এই গল্প বানাতে পারেন। আমার ক্রতু বইতেও আমি এই জিনিসটা নিয়েছি। পাখি আকাশের অনেক উঁচুতে ডিম পাড়ে, এত উঁচুতে ডিম পাড়ে যে, সেই ডিম পড়ছে তো পড়ছেই, কত দিন ধরে পড়েই যাচ্ছে। পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। বাচ্চাও পড়তে থাকে। তারপর যখন দেখে আরে নীচে পৃথিবী! এর উপর এসে পড়লে আমি তো শেষ। তখন সে আকাশে মায়ের দিকে চোঁচাঁ দৌড় দেয়। ঠাকুর বলছেন – যাতে মার কাছে পৌঁছাতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া। আমার ক্রতু কাহিনীতে যখন হোমাপাখি পড়ছে তখন পৃথিবীতে ঝড় উঠেছে, সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ে হোমাপাখির ছানা ফেঁসে গেছে।

এ-সব ছোকরারা ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা –কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।

যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি –এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? টপিকটা রাখালকে নিয়ে চলছে; শুধু রাখালকে নিয়েই না, আমাকে নিয়ে চলছে, আপনাকে নিয়েও চলছে। মে মাসের গ্রীষ্মকাল, গরমে হাঁসফাঁস করছি, এর মধ্যে সব কিছু ছেড়ে কথামৃতের এই ক্লাশ শুনছেন। কত পূণ্য থাকলে মানুষের মনে এই শুভ ইচ্ছা জাগে! কি রকম চেতনা হলে মানুষের মনে কথামৃতের আলোচনা শোনার আগ্রহ জাগে। সেইজন্য ঠাকুর যে বলছেন, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি –এমন জ্ঞান হয় কেমন করে, এটা আপনাদের উপরেও খাটে।

আপনি যে সমাজে আছেন, আপনার বাড়ির আশেপাশে যাঁরা আছেন, সবাই ঘোর বিষয়ী মানুষ। করোনা আসার পর সবারই চিন্তা, আমি কি করে বাঁচব। পাড়ার লোক মরুক বাঁচুক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষের দুটি আদর্শ –ত্যাগ ও সেবা। আজকে ভারতে না আছে ত্যাগ, না আছে সেবা। আমি লুটেপুটে খাই, আমি বেঁচে থাকি। কিন্তু মৃত্যু তাকেও ছাড়ে না, তাও চেতনা নেই।

ঠাকুর বলছেন, **তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তাহলে তাতে ছোলা গাছই হয়**। আমি আপনি সবাই তাই, এই সমাজটা বিষ্ঠাকুড়ে, শুনলে ঘিনঘিন লাগে, আপত্তিজনক মনে হয়; অনেকে বলতে পারেন সমাজকে নিয়ে আপনি এটা কি ধরণের কথা বলছেন! কিন্তু কিছু করার নেই, এটাই সত্য। সত্য কথা বললে লোকেরা রেগে যায় ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। সমাজটা একটা গারবেজ, পাঁকে যেমন পদ্মফুল হয়, যাঁরা কথামৃত শুনছেন, আপনারা তাই। পদ্মফুলের জন্ম পাঁক থেকে, নামটাই তাই পঙ্কজ। তবে পাঁক না হলে পদ্মফুল হবে না। ঠাকুর সেটা বলছেন না, ঠাকুর বলছেন বিষ্ঠাকুড়ে। বিষ্ঠাকুড়েতে যদি ছোলা বা কোন ভাল বীজ পড়ে, সে কিন্তু নিজের আইডেন্টিটি বজায় রাখে। **সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি আর অন্য গাছ হবে?**

টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং। পরের বাক্যটা হল –**আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য) যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে**।

এখানে ঠাকুর দুটো বাক্য দু-রকম বলছেন। প্রথম বাক্যে বলছেন, বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তাহলে তাতে ছোলাগাছই হয়। পরের বাক্যে বলছেন –ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের হিসাবে আমার তখন বয়স খুবই কম; আমি তখন ব্রহ্মচারী, বয়স সাতাশ কি আঠাশ। দেওঘর বিদ্যাপীঠে তখন একজন খুব জ্ঞানী মহারাজ ছিলেন। একদিন উনি মজা করে এই দুটো লাইন বলছিলেন। বলার পর খুব হাসছেন। ভাল অর্থে তিনি বলছিলেন, 'দেখ ঠাকুরের কি বুদ্ধি। প্রথমে রাখালের বাপকে বিষ্ঠাকুড়ে বানিয়ে দিয়েছেন, রাখাল যেন ছোলা, পড়েছে বিষ্ঠাকুড়ে। তারপরে আবার বাপের প্রশংসা করে বলছেন, ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়'। ওই বয়সেও আমার কিন্তু মনে হয়েছিল জিনিসটা আরও গভীর, যত সহজে মহারাজ বলছেন, জিনিসটা তত সহজ না। কিন্তু তখন বুদ্ধি তত পাকেনি, এখনও পাকেনি তবে আগের থেকে একটু ভাল হয়েছে। ওই মহারাজ অত্যন্ত সম্মানীয়, এখনও আমি সম্মান করি। তখন মহারাজের কথাটা আমার মনে জোর একটা ধাক্কা লেগেছিল।

পরপর দুটো বাক্যে ঠাকুর দু-রকম কথা বলছেন, প্রথমটা বিষ্ঠাকুড়ে ছোলা, দ্বিতীয়টাতে বলছেন, ভাল ওল। প্রথম বাক্যে যেন বলতে চাইছেন, রাখাল নিত্যসিদ্ধ, তিনি যে বংশেই জন্ম নিন সেখান থেকেই তাঁর সব আধ্যাত্মিক লক্ষণগুলি বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয় বাক্যে বলতে চাইছেন, সাধারণ ভাবে আমরা যে ডিএনএ বা জেনেটিক্যালির কথা বলি, সেই অর্থে বলছেন। পরে আমার মনে হল; না, জিনিসটা অনেক গভীর, জিনিসটা অত সহজ না।

একটু আগে কারণ শরীরের কথা বলা হল। আমি, আপনি কে? কেনই বা আমি ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হলাম? যেদিন ঘরবাড়ি ছাড়লাম কি শান্তি, যেন মুক্তির নিঃশ্বাস পেলাম। তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। বাবা-মা কান্নাকাটি করছেন দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। চিরদিনই পরিবারের সবার সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, কান্নাকাটির ঢং ঢাং কেন করছেন? এখনও যখন ফিরে ওদিকে তাকাই, আমার আতঙ্ক মনে হয়। কুড়ি বছর ওখানে কি করে ছিলাম, কি করে সব সহ্য করেছি? আপনাদেরও সেই একই জিনিস।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যোগভ্রষ্টের কথা বলছেন। অর্জুন প্রশ্ন করছেন, যাঁরা যোগ সাধনা করছেন এবং তাঁদের সিদ্ধিলাভ যদি না হয়, তাহলে তাঁদের কি গতি হবে? ভগবান তখন বলছেন, *ন হি*

কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি, এদের কখন দুর্গতি হয় না। ছোলা যদি বিষ্ঠাকুড়েতে এসে পড়ে তাহলেও ছোলগাছই হবে। ভগবান তারপরে বলছেন –*তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*; খুব ইন্টারেস্টিং শ্লোক, এই শ্লোকের যতই ব্যাখ্যা করা হোক, তত কম হবে। পুরোদমে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁরা যোগ সাধনা করছিলেন, এটা হল একটা থাক। দ্বিতীয় হল যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, যেমন রাখাল, নরেন; এনাদের যে চেতনা, আমি কে, এই চেতনাটা একেবারে স্থির –আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সন্তান রূপে হোক, সেবক রূপে হোক, জুড়ে রয়েছি।

আমরা একটা কল্পনা করতে পারি, তিনি এবার চলছেন, চলতে চলতে ধীরে ধীরে তাঁর মন জগতের দিকে বেশি আসছে। কি রকম? কারণ জগতের যে কথা বলা হল, শুদ্ধ আত্মার উপর একটা অজ্ঞান আবরণ; এই অজ্ঞান আবরণটা কতটা ক্ষীণ বা কতটা মোটা; সেটার উপর নির্ভর করবে আপনার বিষয়বুদ্ধি কত হবে, আপনি জগতের দিকে কত বেশি আসবেন। যাঁদের আবরণটা খুব ক্ষীণ, তাঁরা হলেন নিত্যসিদ্ধ; যেমন নরেন, রাখাল আদি ছোকরারা। যাঁদের আবরণে আরেকটু বেশি নোংরা পড়ে আছে, তাঁরা হলেন ভাল সাধু। যাদের উপর আবরণটা আরও গভীর ঘুটঘুটে কালো, তাঁরা হলেন বিষয়ী। তত্ত্বের দিক থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে যে অত্যন্ত বিষয়ী মানুষ আর অন্য দিকে উচ্চমানের সাধু, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু বস্তুতঃ তফাৎ আছে, এই জগতে তফাৎ আছে। এই তফাৎটা আবরণের উপর নির্ভর করে। এখন নরেন, রাখাল এনারা যদি জন্ম নিতে চান, এমনকি ঠাকুর, যিনি অবতার, তাঁকেও অবতার রূপে আসার জন্য একটা আবরণ নিতে হয়। গীতায় ভগবান বলছেন, তিনি নিজেরই শক্তিকে নিজের উপরে আবরণ রূপে নিয়ে নেন। কিন্তু অবতারের জ্ঞান অক্ষুণ্ণ; ঠিক তাঁর পরেই আছেন নিত্যসিদ্ধরা। কারণ নিত্যসিদ্ধের উপর যে আবরণ, এটা বাস্তবিক আবরণ; অবতারের উপর যে আবরণ এটা আসল না। আমাদের মত মানুষের উপর যে আবরণ, এই আবরণটা আসল আবরণ।

আমরা সবাই সেই সূক্ষ্ম জগতের লোক। যখন সূক্ষ্ম জগৎ থেকে স্থূল জগতে প্রবেশ করে তখন ক্ষীণ, স্থূল ভেদে আবরণের প্রভাব বেশি পড়তে শুরু হয়। আমি কে, এই চেতনা ভগবানের রয়েছে – আমি সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ ভগবান। কপিলমুনি যেমন ছিলেন, তিনিও ছিলেন নিত্যসিদ্ধ। যেমন স্বামীজী, এনাদের চেতনা রয়েছে –আমি ঈশ্বরের সঙ্গী। কিন্তু সেখানে ছোট্ট একটা আবরণ আছে। ওই ছোট্ট আবরণটাকে ছিঁড়ে দিলে আবার তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। আমাদের উপর আবরণটা আরেকটু বেশি। উদ্দেশ্য হল এই আবরণকে ছিঁড়ে যাতে আমরা আরও উপরে যেতে পারি।

এখন কি হয়, জীবাত্মা যখনই মায়ের গর্ভে আসেন তখন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম। কিন্তু অবতার যখন গর্ভে আসেন, গর্ভেও তিনি ভগবান। যাঁরা নিত্যসিদ্ধ তাঁদের উপর বাবা-মায়ের জেনেটিক ছাপ অল্প একটু পরে। এটাকে পার্সোনা বলা হয়, পাতলা মুখোস, এই মুখোস থাকবে। নিত্যসিদ্ধের বাইরে আমাদের মত যাঁরা তাঁদের উপর মুখোশটা আরেকটু যেন বেশি। আর যারা এমনি সাধারণ, তারা পুরোপুরি জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরী। কিন্তু তার ভিতরেও সূক্ষ্ম আর কারণটা রয়েছে। শুধু আবরণের তফাৎ থাকে। ফলে কি হয়, রাখাল জন্ম নেওয়ার পর তাঁর মধ্যে তাঁর বাবা-মায়ের একটু স্বভাব থাকবে, থাকতে বাধ্য। নরেনের মধ্যেও তাঁর বাবা-মায়ের একটু স্বভাব থাকবে, থাকতে বাধ্য। নরেনের ওকালতি বুদ্ধি, ওনার যত আইন-কানুনের কাজকর্ম রয়েছে সেখানে তাঁর ওকালতি বুদ্ধি বোঝা যায়। রাজা মহারাজ জমিদারের ছেলে, তাঁর মধ্যে সব সময় রাজার ভাব। এমনকি ঠাকুর, ঠাকুর ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশের, ওনার ভিতর ব্রাহ্মণের স্বভাব চিরদিন থেকে গেল, কোন দিন গেল না। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আমরা কত বড় বড় কথা বলি। কথায় কথায়, যখন তখন, যেখানে সেখানে মায়ের এই বিখ্যাত উক্তিকে আমরা ব্যবহার করি –'শরতও আমার ছেলে আমজাদও আমার ছেলে'। কিন্তু মায়ের শেষের দিকে, যখন তিনি শয্যাগ্রস্ত, সেখানে নার্সরা আসত, মা নার্সদের উদ্দেশ্যে কি বলছেন? একদিন মা খুব রেগে গিয়ে বলছেন –আমার ঘরে এই মেমগুলো জুতো পরে খটখট করে চলাফেরা করবে, এটা চলবে না। মাকে পাঁউরুটি দেওয়া হয়েছে, মা বলছেন, শেষে আমাকে আর মুসলমানি রুটি খাইয়ো না। মা

নিলেন না। এগুলো যায় না, একটু থাকবে। কিন্তু এর সাথে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোকে আমরা বড্ড বেশি ছড়িয়ে দিই, কিন্তু না, ওটা অল্প একটু থাকবে।

এখন ঠাকুর যখন বিষ্ঠাকুড়ের কথা বলছেন, যাঁর চেতনা কারণ শরীরের রয়েছে, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন; তিনি যেখানেই গিয়ে পড়ুন, এই চেতনা তাঁর সব সময় থাকবে। কিন্তু যাঁরা যোগভ্রষ্ট হয়ে জন্ম নিচ্ছেন, তাঁদের এই চেতনাটা থাকে না। তাঁদের ওই চেতনাটা অনেক পরে আসে, হয়ত দু-চার জন্ম পরে আসে। *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্,* আগেকার তাঁর যে শরীর ছিল, যে শরীর দিয়ে তিনি যোগ সাধনা করেছিলেন, সেই দেহটা জুড়ে যায়। তার মানে স্থূল শরীরের যে ভাব, তাঁর বাবা-মা যে সংস্কারগুলো দিয়েছেন, সেই ভাব, আস্তে আস্তে হঠাৎ কোন ভাবে আগের যোগ সাধনার ভাবের সঙ্গে জুড়ে যায়। এই শরীরটাতো আর পাল্টাবে না, আপনি যদি আজ আমার ডিএনএ টেস্ট করেন, আপনি ওটাই পাবেন, যেটা বাবা-মার থেকে পেয়েছি।

আমিত্বের চেতনাটা অন্য দিকে চলে যাবে, চলে যাবেই। ফলে এই যে দুটো, ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে আর তার সাথে ভাল ওল, এই দুটো কথাই দরকার পড়ে। আমার আপনার উদ্দেশ্য হল ওলের ভাবটাকে ভুলে গিয়ে বিষ্ঠাকুড়ের ভাবটাকে জাগানো। আমাদের এক মহারাজ খুব মিষ্টি করে বলতেন – 'আমার মা জগজ্জননী। জগজ্জননীকে আপনি সারদা মা নিন, মা-কালী নিন, মা দূর্গা নিন। আমাকে সংসারে আসতে হবে, সংসারে না এলে সাধনা ও সিদ্ধি হবে না, একটা গর্ভ আমাকে তাই নিতে হবে, নিয়েছি; ওখানেই শেষ। যতদিন সংসারে ছিলাম, মা-বাবাকে প্রণাম করেছি; ওখানেই কাহিনী শেষ। যদি পূণ্য কিছু হয়, তাঁরাও পেয়ে যাবেন'। একটা কোথাও গিয়ে আমাকে পড়তে হবে; এখন সে বিষ্ঠাকুড়েই পড়ি, পাঁকে পড়ি, সার দেওয়া জমিতেই পড়ি, হবে ছোলাই। আমার জন্ম যেখানেই হত, কাঙালী বাড়িতে হলেও সন্ন্যাসী হতাম আবার রাজবাড়িতে জন্ম হলেও সন্ন্যাসীই হতাম। সিদ্ধার্থ যেখানেই জন্ম নিন, তিনি বুদ্ধই হবেন, ওটা ওনার বাবা-মার উপর নির্ভর করে না। তবে কিছু সংস্কার, কারণ স্থূল শরীর যেহেতু ধারণ করতে হয়েছে, বাবা-মার কাছ থেকে যেটা পেয়েছেন, সেটা থাকবে।

এখানে এই দুটো কথা কোন হাসির কথা না, পুরো সিরিয়াস কথা; পুরো সৃষ্টিতত্ত্ব এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। অবতারের কথাগুলো বিনোদনের নয়। আমাদেরও উদ্দেশ্য এটা, বাবা-মার কাছ থেকে বাহ্য যে আকৃতি পেয়েছি, এটাকে ভুলে আমার নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর যেটা, যেখানে আমার বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে, সেটাকে একাগ্র করে সেটারও পিছনে যে কারণ শরীর রয়েছে সেখানে গিয়ে মনটাকে লাগাতে হবে। যেখানে পৌঁছানর পর বুদ্ধবৃত্তিটা আরও কমে যাবে, চৈতন্যের প্রকাশ আরও বাড়বে।

মাস্টার (একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি) –সাকার-নিরাকারের কথাটি ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবরা বুঝি কেবল সাকার বলে? আগে এই আলোচনা হয়েছে।

গিরীন্দ্র –তা হবে। ওরা একঘেয়ে। চিরদিনই বৈষ্ণবদের নামে বলা হয়, ওরা একঘেয়ে। কিছু কিছু ধর্মের লোকেরা প্রচণ্ড গোঁড়া, বৈষ্ণবরাও খুব গোঁড়া। যাঁরাই পার্সোনাল গডকে নিয়ে আসে, সাকার রূপকে নিয়ে চলে, যেখানে একেশ্বরবাদ, কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর যারা বলে, দিনে দিনে এরা প্রচণ্ড গোঁড়া হয়ে যায়। আপনি কৃষ্ণকে সরিয়ে আল্লাকে বসিয়ে দিন, আল্লাকে সরিয়ে গডকে বসিয়ে দিন, গোঁড়ামি ওই থাকবে। সেইজন্য মাধ্বাচার্য এত বড় একজন ধর্মগুরু ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ ওনার মত নিল না। একজনও যদি ওনার অনুগামী থেকে থাকে, খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্রচণ্ড গোঁড়া। এনারা সবাই ঈশ্বরের শক্তিতে এসেছেন, আমাদের অধিকারই নেই যে এনাদের সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু এনারা কেউই পুরো ছবিটা নেন না। হিন্দু ধর্ম ছেড়ে এনারা যদি অন্য ধর্মের হয়ে যেতেন, তখন আরেকটা ফ্যানাটিক রিলিজিয়ান তৈরী হয়ে যেত। বৈষ্ণবরা মারামারি করেন না, অন্যরা মারামারি করে। ঠাকুরও বারবার বৈষ্ণবদের একেঘেয়েকে নিয়ে বলছেন। এটা হিন্দু ভাব নয়। হিন্দু ভাব পুরো ছবিটাকে নেয়।

মাস্টার –‘নিত্য-সাকার’, আপনি বুঝেছেন? স্ফটিকের কথা? আমি ওটা ভাল বুঝতে পারছি না। আমরা এর আলোচনা আগে করে দিয়েছি। মাস্টারমশাইর না বোঝারই কথা, প্রথমের দিকে মাস্টারমশাইর ব্যাকগ্রাউণ্ড, স্পিরিচুয়াল ট্রেনিং তেমন কিছু ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) –হ্যাঁগা, তোমরা কি বলাবলি কচ্ছ?

মাস্টার ও গিরীন্দ্র একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বৃন্দে ঝি (রামলালের প্রতি) –ও রামলাল, এ-লোকটিকে এখন খাবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও। ঠাকুর ঘাবড়ে গিয়ে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই? বৃন্দে একটু খিটখিটে ছিল, ঠাকুর বৃন্দেকে অসন্তুষ্ট করতে চাইতেন না। বৃন্দের বেশ কিছু কাহিনী আছে। একবার ওর খাওয়া রাখা ছিল, সেটা কেউ খেয়ে নিয়েছে, বৃন্দে তাতে খুব রেগে গিয়ে বলেছিল –এরা আবার ভদ্রলোকের ছেলে, আমার খাবার খেয়ে নিয়েছে। ঠাকুর বৃন্দেকে নিয়ে একটু সাবধানে থাকতেন।

নবম পরিচ্ছেদ
পঞ্চবটীমূলে কীর্তনানন্দে

পঞ্চবটীমূলে কীর্তন হচ্ছে। ঠাকুরকে নিয়ে ওখানে পর পর অনেকগুলো গান হচ্ছে।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহারা একটু থামিলে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরে ও আশেপাশে এখনও অনেকগুলি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) –পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না একবার –

ত্রৈলোক্য –আমি গিয়ে কি করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেন, বেশ একবার দেখতে।

ত্রৈলোক্য –একবার দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, আচ্ছা বেশ। ঠাকুর আর ত্রৈলোক্যকে কিছু বললেন না। যেখানে ঈশ্বরীয় নামগান হয় সেখানে যেতে হয়। এটা হল মাস্টারমশাইর নৈপুণ্য, তিনি ছোট ছোট জিনিসগুলিকে আমাদের জন্য রেখে দিলেন। এতে মানুষের যে বিভিন্ন রকমের ভাব, বিশেষ করে অবতারের সঙ্গে; খুব সুন্দর বোঝা যায়। দুপুরের পর আস্তে আস্তে এবার বিকেল হতে শুরু হয়েছে। এরপরের বিবরণ দশম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছেন।

দশম পরিচ্ছেদ
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থধর্ম

প্রায় সাড়ে পাঁচটা-ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি) –সংসারত্যাগী সাধু –সে তো হরিনাম করবেই। তার তো আর কোন কাজ নাই। কাজ থাকা বা না থাকা এটা ঠাকুর না যত বলেছেন, স্বামীজী এই কথা খুব বলতেন। কাজ না থাকলে মানুষ তামসিক হয়ে যায়। আমি আগে উত্তরকাশীতে অনেকবার গেছি, তিন-চারবার ওখানে ছিলাম। সেখানে দেখতাম সাধুদের প্রধান কাজ হল অন্নসত্র থেকে ভিক্ষা নিয়ে আসা। আমেরিকায় আমাদের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, স্বামী স্বহানন্দজী মহারাজ, খুব পণ্ডিত ছিলেন। এক সময় উনি অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন, আমি তখন সেখানে ব্রহ্মচারী ছিলাম। উনি চা খেতে খুব ভালবাসতেন। খুব সাধারণ জীবন ছিল তাঁর, কিন্তু এই একটাই, চা খুব ভালবাসতেন। যখন তখন চা পেলে তিনি খুব খুশি হয়ে যেতেন। তপস্যা করতে উনি অনেকবার উত্তরকাশী গেছেন। ওনার কাছে উত্তরকাশীর কথা শুনে শুনে আমারও উত্তরকাশীর প্রতি বিরাট আকর্ষণ জন্মেছিল। উনি একদিন ওনার একটা ঘটনার কথা বলছেন। একদিন অন্নসত্রে একটা নোটিশ পড়ল – আজ বিকাল চারটের সময় অমুক আশ্রমে চা দেওয়া হবে। যেখানে ওনার কুঠিয়া ছিল, রামকৃষ্ণ কুঠিয়া, সেখান থেকে পাহাড়ি রাস্তায় তিন কিলোমিটার দূরে সেই আশ্রম। হেঁটে হেঁটে তিনি গেলেন আশ্রমে। উনি ভেবেছিলেন একশ কি দুশো গ্রাম চা-পাতা দেওয়া হবে। গিয়ে দেখেন সবাইকে এক কাপ করে চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটা উনি খুব মজা করে বলতেন –দেখ, লোকেরা উত্তরকাশী যায় সাধনা করবে বলে, তপস্যা করবে বলে। এক কাপ চা খাওয়ার জন্য আসা-যাওয়া মিলিয়ে ছয় কিলোমিটার পায়ে হাঁটা। সাধুদের এটা কিন্তু মেজর কাজ।

আমি দেওঘরে ছিলাম, ওখানে একজন সাধুকে দেখেছিলাম, উনি জয়েন করে শেষ দিন পর্যন্ত দেওঘরেই ছিলেন, হীরালাল মহারাজ। বাগান, গোশালা দেখাশোনা করতেন। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের মধ্যেই একটা কুঠিয়া করে নিজের মত থাকতেন। যখন খাওয়ার সময় হত, উনি ভাণ্ডারে এসে নিজের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে চলে যেতেন। টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে দুপুরের খাবার রাত্রে খেতেন, রাত্রের খাওয়া পরের দিন দুপুরে খেতেন। ফলে ওনাকে খাবার গরম করতে হত। যখনই কেউ যেতেন দেখতে পেতেন উনি ব্যস্ত; হয় এখন খাবার গরম করছেন, নয় খাচ্ছেন, নয়তো এখন বাসন মাজছেন। যখন দেওয়া হত তখন খেয়ে নিলে ঝামেলা অনেক কমে যেত। কিন্তু পরে খাচ্ছেন বলে খাবার গরম করতে হয়। কোন ভাবে ওনার সিডিউলটা ওলটপালট হয়ে গেছে, সেইজন্য রাত্রের খাওয়া দুপুরে, দুপুরের খাওয়া রাত্রে খাচ্ছেন।

সময় থাকতে যে কাজে লাগাবে না, সে তামসিক হয়ে যাবে। স্বামীজী হরিদ্বার, ঋষিকেশে সাধুদের দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন। সেইজন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করে বলে দিলেন, সাধুরা এখানে কাজ করবে। এই যে এক কাপ চা খাওয়ার জন ছয় কিলোমিটার আপডাউন, এটা থেকে সময় যেটা বাঁচবে, সেই সময়টা সঙ্ঘের সেবার জন্য যাবে। কারণ সমাজ এটা দিচ্ছে। ঠাকুর এখানে বলছেন, সংসারত্যাগী সাধু, সে তো হরিনাম করবেই। তার তো আর কোন কাজ নাই।

সে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে তো, আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে তাহলে বরং সকলে নিন্দা করবে।

সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরি আছে। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ হত, সেখানে আমি ক্লাশ নিতাম। আমার আর কি, আমি তো এখানেই থাকি, দু পা হেঁটে ক্লাশে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আপনারা কত দূর দূর থেকে ক্লাশে আসছেন ধর্মের কথা শুনতে। বেলুড় মঠের মহারাজরা মজা করে আমাকে বলতেন, 'আপনার তো এখানে কিছুই নেই, মঠে খাবেন, এখানেই বিশ্রাম করবেন, বিশ্রাম করে দু পা হেঁটে গিয়ে ক্লাশ নেবেন, ধন্য তো যাঁরা শুনছেন'। সাধারণ ভাবে যাঁরা পড়ান তাঁরা ধন্য, আমাকে বলতেন, 'যাঁরা শ্রোতা তাঁরাই ধন্য'। কোথায় সেই চন্দননগর, কোথায় সুভাষনগর, কোথায় জয়নগর, বেহালা ওই গরমের সময় লোকাল ট্রেনে করে আসছেন ঈশ্বরীয় কথা শুনতে। সত্যি এনারাই

ধন্য। এনাদের পিছনে কত পূণ্য রয়েছে, কত সৎকর্ম রয়েছে, ভিতরে কেমন যোগীর ভাব যার জন্য এনারা ক্লাশ শুনতে এতদূর আসছেন।

দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। এক দিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর-একদিকে সংসারের কর্ম করছে। সংসারে কর্ম তখনই ঠিক ঠিক হয় যখন পূর্ণ জ্ঞান থাকে। সন্ন্যাসীদের পক্ষে সেইজন্য সেন্টারগুলো চালানো খুব সহজ হয়ে যায়। কারণ আমরা সন্ন্যাসীরা অনাসক্ত।

নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে। ঠাকুর অবতার, ঠাকুর ত্যাগী সন্ন্যাসী, ঠাকুরের মন সর্বদা ঈশ্বরের দিকে, অথচ ঠাকুর কোথা থেকে, কিভাবে যে এই কথাগুলো জানতেন, রীতিমত গবেষণার বিষয়। আমরা এভাবে ভাবতে পারি –আমিও জীবনের প্রথম কুড়ি বছর সংসারেই ছিলাম, সমাজেই ছিলাম, কিন্তু কোন দিন জানতাম না নষ্ট মেয়ে কি জিনিস। ঠাকুর বলছেন, নষ্ট মেয়েরা সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে –এখন তো সংসারের কাজ কেউ খুঁটিয়ে করলে আমার সন্দেহ হয়, এত খুঁটিয়ে কাজ করছে কেন, কিছু গোলমাল নিশ্চয় আছে। বাড়ির বাচ্চা যদি অনেকক্ষণ শান্ত থাকে, তখন বুঝতে হয় ওর কিছু গোলমাল চলছে। বাচ্চারা চুপচাপ থাকে না, হুড়ুম-দাড়ুম না করলে বুঝতে হবে ওর কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে। সংসারীদের জন্য ঠাকুর এটাই বলছেন –সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে, নষ্ট মেয়ের মত থাকবে। উপপতি হলেন ভগবান, মনটা কিন্তু তাঁর দিকেই থাকবে।

সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন। সাধুসঙ্গ করলে মনে একটা ভাব আসে, ওই ভাবকে ধরে মানুষ ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে যায়। মনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালবাসা জাগে, সাধুও তখন ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

কেদার –আজ্ঞে হ্যাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন রেলের এঞ্জিন, পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ, কত জীবের পিপাসা শান্তি করে।

একটা খুব সুন্দর দোঁহা আছে, তাতে বলছে, গাছের ফল পাওয়ার জন্য ঢিল মারতে হয়; কিন্তু মহাপুরুষ এমনিই করুণা প্রদান করেন। মাখনকে গলাতে গেলে একটু আগুন দিতে হয়, কিন্তু ঠিক ঠিক সাধু এমনিই করুণায় বিগলিতে হয়ে থাকেন।

এবার রাত হচ্ছে, ভক্তদের এবার ফেরত যেতে হবে। **একে একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভবনাথকে দেখিয়ে ঠাকুর বলিতেছেন, 'তুই আজ আর যাস নাই। তোদের দেখেই উদ্দীপন'। ভবনাথের বয়স ঊনিশ-কুড়ি, ঠাকুর তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন**।

এই হল **১১**ই মার্চ, ১৮৮৩ সালের ঠাকুরের জন্মোৎসবের বর্ণনা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে কথোপকথন

আমরা এখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবের কিছুদিন পর ফাল্গুনের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার, **১৬**ই চৈত্র, ইংরেজী **২৯**শে মার্চ, **১৮৮৩** খ্রীষ্টাব্দ, ওই দিনের বর্ণনা শুরু করতে যাচ্ছি ((পৃঃ **১৫৭**)। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বেলা দুটো হয়েছে, ভক্তেরা কেউ কেউ এসেছেন। রাখালের অসুখ, কি অসুখ তার বর্ণনা নেই। রাখালের অসুখের কথা ঠাকুর ভক্তদের বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

রাখালের অসুখ হয়েছে। ভক্তরা বসে আছেন, ভক্তদের বলছেন, কি হবে বাপু। রাখালকে ঠাকুর খুব স্নেহ করেন। পরে মাস্টারমশাই বর্ণনা করবেন, ঠাকুরকে বলা হয়েছিল, নরেন, রাখাল এরা কায়েতের ছেলে, দিনরাত এদের কথা আপনি কেন ভাবেন? ঠাকুর বলছেন, এদের আমি নারায়ণ দেখি; আমার মনকে নামিয়ে ওদের উপর যদি না রাখি, তাহলে আমার মন সমাধিতে লীন হয়ে যাবে। এই কথা বলার পর বলছেন –এই দেখ আমি ওদের উপর থেকে মন তুলে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চুল, লোম সব সজারুর কাঁটার মত সোজা দাঁড়িয়ে গেল, তিনি সমাধিতে ডুবে গেলেন।

যে কোন সাধু-সন্ন্যাসীর জন্য শুধু শাস্ত্র পঠন-পাঠন নিয়ে থাকাটা অতি সৌভাগ্যের। এর থেকে বেশি সৌভাগ্য কোন সন্ন্যাসীর হতে পারে না। গীতায় অর্জুনকে যেমন ভগবান ক্ষত্রিয়দের নিয়ে বলছেন, *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌,* ক্ষত্রিয় যদি ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ পায় সে একজন সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয় হয়। সন্ন্যাসী যদি সৌভাগ্যবান হয়, তিনি শাস্ত্রচর্চা করার সুযোগ পান। আমার এমন কপাল যে, বিগত পনের ষোল বছর একশ ভাগ এটাতেই আছি। ফলে যত হিন্দুশাস্ত্র আছে, সেগুলো সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা হয়ে গেছে। ওই ধারণাকে আধার করে আমি আজকে বলতে পারছি যে, ঠাকুরের কথামৃত পড়লে তবে শাস্ত্র বোঝা যায়, নাহলে শাস্ত্র বোঝা যায় না। আপনি বেদ, উপনিষদ, ভাগবত যত পড়ুন; আমি এর মধ্যেই আছি বলে জানি যে, কথামৃত না পড়লে শাস্ত্র বোঝা যাবে না। কারণ শাস্ত্র যে কথাগুলো বলেছেন, তাতে সব দিক দেখানো হচ্ছে না। জিনিসটাকে একটু বোঝা দরকার।

জিনিসটাকে বোঝার জন্য এখানে আমরা ঠাকুরকে কিছুক্ষণের জন্য অবতার রূপে না দেখে একজন আত্মজ্ঞানী রূপে দেখব। অবতার যখন নিজের আসল অবস্থান থেকে নিচে নেমে এসে মানুষের মধ্যে বিচরণ করেন, যে অবস্থাকে আমরা অবতারের সবচেয়ে নিচের অবস্থা বলে জানি, সেটাই আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। মানুষ শ্রেষ্ঠতম হয় জীবনমুক্ত হওয়াতে বা আত্মজ্ঞান লাভে। অবতার নিচে নামতে নামতে সবচেয়ে যে নিচে নেমে আসছেন, ওটাই আত্মজ্ঞানীর অবস্থা। শাস্ত্রে, বিশেষ করে গীতাতে যে বর্ণনাগুলো রয়েছে, এগুলো হচ্ছে শান্ত ভাবের বর্ণনা। ভগবান বুদ্ধ, তিনি শান্ত ভাবের ঋষি, যীশু শান্ত ভাবের ঋষি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে শুধু একটি ভাব দেখা যায় না, অনেক প্রকার ভাব দেখা যাবে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কত রকম ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে। আর মহাভারতের যুদ্ধের সময় তিনি পুরোপুরি শান্ত স্থির ভাব নিয়ে চলছেন। এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে জীবনমুক্ত ঠিক ঠিক কেমন থাকেন। যদি বুঝতে হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হলে কেমন হন, তাহলে মহাভারতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে হবে। সবই করছেন, সবই করাচ্ছেন, অথচ নির্লিপ্ত। ঠাকুরের জীবনে আমরা যখন নামি সেখানে গিয়ে পুরো বোঝা যায় আধ্যাত্মিক জীবন ঠিক এই রকমটিই হয়। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, সংসারে কি তার কোন আসক্তি থাকবে? অবাশ্যই থাকবে। রাখাল ঠাকুরের মানসপুত্র, দেখুন কিভাবে ঠাকুর রাখালের জন্য বিচলিত হচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্রের যে সীতার জন্য ক্রন্দন, একই জিনিস। অবতার এ-ভাবেই ব্যবহার করেন। অর্জুনকে ভীষ্ম আক্রমণ করেছেন, অর্জুন প্রতিরোধ করতে পারছেন না দেখে, শ্রীকৃষ্ণ রেগে গেছেন, বলছেন, 'ছাড়ো, তোমাকে আর যুদ্ধ করতে হবে না, আমিই আজ পিতামহকে শেষ করে দিচ্ছি'।

তাঁদের যে রাগ হয় না, ক্রোধ হয় না, তা না, সবই হয়। এরপর আপনি ব্যাখ্যা করতে থাকুন –এ-সব লোকশিক্ষা, এ-সবই মায়া, সবটাই নাটক, লীলা। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখছি, কেন এত সব বড় বড় কথা নিয়ে আসছেন? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে যেটা বোঝা যাচ্ছে, সেটার জন্য বড় ব্যাখ্যার কিসের দরকার। রাখালের উপর ঠাকুর মন রেখেছেন, রাখালের যদি কিছু হয় ঠাকুরের মন চঞ্চল হবেই। এক্ষুণি দেখবেন, এই রাখালকে নিয়ে কথা বলতে বলতেই আবার তাঁর মন

সেই ভাবরাজ্যে চলে যাচ্ছে। যিনি জীবনমুক্ত, এটাই তাঁর ঠিক ঠিক ব্যবহার। সবারই বাড়িতে যার যার আপনজন আছে, সন্তান আছে, নাতি-নাতনি আছে, কিন্তু সমস্যা হল, মনটা একবার ওখানে চলে গেলে ওর থেকে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবনমুক্ত তা নন, তিনি যখন সংসারে মন দেন তখন সংসারীর মত। তারপর মনটা যখন তুলে নিয়ে সেখান থেকে পুরো আলাদা হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি আর কোন কিছুতে নেই। সন্ন্যাসীদের জীবনধারা অনেকটা এই রকম হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের সবই আছে; এটা ভাল লাগে, ওটা ভাল লাগে না; এর উপর রাগ, তার উপর রাগ; কিন্তু কোন কিছুতে বাঁধা নেই, নির্লিপ্ত।

তার থেকেও বেশি –রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা। লোকেরা বলবে, এ কি ধরণের অবৈজ্ঞানিক কথা! যার করোনা হয়েছে, জগন্নাথের প্রসাদ খেলে তার করোনা ভাল হয়ে যাবে কি? তার আগে বলছেন, সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? ঠাকুর জানেন না কি করতে হবে। সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে একটা জিনিস সবারই বোঝা খুব দরকার, বিশেষ করে এখন যে রকম দিনকাল চলছে তাতে একটু বোঝা দরকার।

শরীরে বিকার যখন হয়, অসুখ-বিসুখ আদি যখন হয়, এগুলো তিনটে কারণে হয়, যেটাকে তিনটে তাপ বলা হয় –আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অসুখ হওয়া মানেই যে তাপ হবে তা না, অসুখ এক ধরণের বিকার; তাপ হতেও পারে, তাপ নাও হতে পারে। কিন্তু বিকার বিকারই, এই বিকার তিন জায়গা থেকে আসে। আমাদের ভিতর থেকে কিছু আসছে, বাইরে জীবজন্তু থেকে কিছু আসছে, আর দেবতাদের থেকে কিছু আসছে। যেমন করোনা, ভাইরাস থেকে করোনা আসছে; এটা হল আধিভৌতিক। অনেক সময় কি হয়, মনে যদি অনেক দুঃখ আদি থাকে, সেখান থেকে শরীরে কিছু কিছু রোগ হয়। অনেক দিন মনে কোন কষ্ট জমা থাকলে বিভিন্ন ধরণের রোগ হয়, ব্যাক পেইন আদি রোগ সেখান থেকেই আসে। কোন কারণে দেবতারা অসন্তুষ্ট হলে বা রুষ্ট হলে সেখান থেকে যে দুঃখ আসে, এই দুঃখকে বলে আধিদৈবিক। সেইজন্য এখনও দেখা যায়, চিকেন পক্স আদি হলে মানুষ শীতলা মন্দিরে যায়। ঠাকুর তিনটেকে নিয়েই চলতেন। ঠাকুরের নিজের অসুখ হলে তিনি ডাক্তার দেখাচ্ছেন। তার সঙ্গে বলছেন, এখন হয় সবাইকে বিশ্বাস করতে হয়, আর তা নাহলে কাউকেই বিশ্বাস নেই। ঠাকুর ডাক্তারকে ডাক্তার রূপে দেখছেন না, ডাক্তারকে তিনি নারায়ণ দেখছেন, ওষুধ নিচ্ছেন নারায়ণ থেকে। এগুলোকে বোঝা, বুঝে একটা বিশ্বাস করে সেইভাবে চলা খুব মুশকিল। কিন্তু এখানে সব থেকে বেশি হল, জগন্নাথের প্রসাদ খেলে রোগ সারবে, এটাকে নিয়ে অনেকে তর্কবিতর্ক করবে।

আমাদের জীবনে সব সময় দুটো দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। একটাকে বলে হোলিস্টিক এ্যাপ্রোচ, যেখানে সম্পূর্ণকে নিচ্ছে। আরেকটা হল রিডাকশানিস্টিক এ্যাপ্রোচ, যেখানে জিনিসটাকে টুকরো টুকরো করে দেখা হয়। যেমন একটা মোটর গাড়ি, মোটর গাড়ির যে বিভিন্ন টুকরো রয়েছে তার সব কটাকে মিলিয়ে একটা মোটর গাড়ি। মানুষের যে বিভিন্ন অঙ্গগুলি আছে, যেমন মাথা, হৃদয়, হাত, পা, চোখ, নাক সব মিলিয়ে একটা মানুষ। এখন প্রশ্ন ওঠে, আমাদের যে জীবন, এটা কি রিডাকশানিস্ট নাকি হোলিস্টিক? ফিলজফিতে এটা একটা বিরাট বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। মানুষকে কখন মনে হয় হোলিস্টিক, কখন মনে হয় যেন রিডাকশানিস্ট। আমাদের বর্তমান যে চিকিৎসাবিজ্ঞান, যেটাকে আমরা এ্যালোপ্যাথি বলি, এই পদ্ধতি রিডাকশানিস্টিক এ্যাপ্রোচ নিয়ে চলে। রিডাকশানিস্টিক এ্যাপ্রোচ মানে, আপনার যদি এই অসুখ হয়ে থাকে, তাহলে তার নিরাময়ের জন্য এই ওষুধ। ভারতে আমরা এ-ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতাম না, আমাদের এ্যাপ্রোচটাই হল সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হলেই সমস্যা কি হয়, যিনি ডাক্তার, তাঁর যে চিন্তা-ভাবনা, তাঁর যে জ্ঞান; এগুলোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, এবং সেখানে গিয়ে অনেক গোলমাল হয়ে যায়। রিডাকশানিস্ট আর অবজেক্টিভিজম, যেখানে বস্তু রূপে দেখা হয়, সেখানে দুটোতে অনেক মিল আছে। আমরা ভারতবাসীরা হোলিস্টিক এ্যাপ্রোচ নিয়ে চলি।

এখনে আমরা হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা এ্যালোপ্যাথি নিয়ে কথা বলছি না, আমরা কথা বলছি ফিলজফি নিয়ে। আমার এক বন্ধু একজন বড় সাইকিয়াট্রিস্ট, দেশ জুড়ে ওনার নাম। উনি একটা ঘটনা বলছিলেন, বাড়িতে ওনার বাবার ক্রোধটা খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। নিজে একজন বড় ডাক্তার, বাবাকে ওষুধ দিলেন, বাবা ঠিক হয়ে গেলেন। বেশ কিছু দিন পর ওনার বড় ছেলেরও সেই একই সমস্যা দেখা দিল, এ্যগ্রেসান। উনি ওষুধ দিলেন সেরে গেল। কিছু দিন পর ডাক্তারের দ্বিতীয় যে ছেলে, তারও ওই একই সমস্যা দেখা দিল। উনি ওষুধ দিলেন, ছেলেটার রোগ বেশি মাত্রায় বেড়ে গেল। ডাক্তারবাবু আমাকে বলছিলেন –'স্বামীজী সত্যি সত্যিই আমরা জিনিসটা বুঝি না। একই পরিবার, একই জেনেটিক কোড, পরিস্থিতি এক, একই রোগ, একই ওষুধ, সব কিছু এক। দুজনের উপর এক রকম কাজ করল, তৃতীয়জনের উপর পুরো বিপরীত। কেন হয়, আমার জানা নেই'। উনি মেডিক্যাল সাইন্স পড়ে এই রকম কথা বলছেন। ঠাকুর তো মেডিক্যাল সাইন্স পড়েননি।

অনেক আগেকার কথা, আমাকে একজন খুব সিনিয়র মহারাজ বললেন –স্নানের পর রোজ মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধির মন্ত্র পড়বেন, *ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা* ইত্যাদি। আমিও রোজ গঙ্গারজল ছিটিয়ে দিই। জান্তা অজান্তায় চিন্তা-ভাবনাতে, কর্মে যা কিছু অপবিত্র করেছি, সেটা যেন পবিত্র হয়ে যায়। কারণ তা নাহলে এটাই ভবিষ্যতে আধিদৈবিক বিকার হয় তাপ সৃষ্টি করবে। এগুলো একটা চিন্তা-ভাবনা, কেউ করলে ভাল, না করলে না করল। কারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা সমান হয় না, একই মানুষের চিন্তা-ভাবনা পাল্টাতে থাকে।

তবে এই কথাটি –রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা; রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসীকে আমি জানি, যাঁরা নিয়মিত স্নানের পর মহাপ্রভুর আটকে প্রসাদ খান, আমি নিজেও খাই। ঠাকুর বলছেন, রাখালের অসুখ, সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? এই কথা বলতে বলতে ঠাকুর ভাবে চলে গেলেন আর দেখছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহধারণ করে এসেছেন। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –

একদিকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালকভক্ত রাখাল, অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু –সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। সেখান থেকে ঠাকুর মনের গভীরে গিয়ে সমাধিতে ডুবে গেলেন। **ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?**

একাদশ পরিচ্ছেদ, ২৯শে মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এটা খুব সুন্দর একটা অংশ। একজন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ির কারুর শরীর খারাপ করলে গৃহস্বামী কিভাবে দুশ্চিন্তা করবেন; এই ডাক্তার নিয়ে এসো, এই ওষুধের ব্যবস্থা কর, এটা কর, সেটা কর; ঠাকুর রাখালের অসুখে এ-সবই করছেন। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে অসুখ আর ওষুধ দুটোই পড়ে থাকল। থেকে গেলেন শুধু রাখাল। রাখালও না, রাখালকে তিনি যেভাবে দেখেন সেই নারায়ণে মনটা ডুবে গেল, ঠাকুর সমাধিস্থ। আপনারা যাঁরা এখন শুনছেন, আপনারা ঠাকুরের ভক্ত, তা নাহলে কেন কথামৃতের কথা শুনবেন। এটাই হল জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন কিভাবে চলবে, সেটাকে পরিষ্কার দেখানো। কোন ইঙ্গিত ইশারা নেই, পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছেন। অনেক জায়গায় ঠাকুর অনেক ভাবে বলছেন। ঢেকিতে ধান ভানছে, কথা বলছে, সব করছে কিন্তু মনটা ঢেকির উপর, হাতের উপর যেন ঢেকি এসে পড়ে আঘাত না লাগে। আসল যে জিনিসটা, সেখান থেকে কিন্তু মন সরছে না।

রাজা মহারাজ পরে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হন, তিনি বলতেন –চোদ্দ আনা মন ভগবানে রেখে দু-আনা মন সংসারে দিলে হেউঢেউ হয়ে যায়। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের মন মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কোন ফোকাস নেই। যে কাজ দু-মিনিটে হয়ে যাওয়ার কথা, সেই কাজ করতে কুড়ি মিনিট লেগে যাবে। আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব হোয়াটসআপ, ফেসবুক ইত্যাদিতে কিছু ভিডিও পাঠান আর বলে দেন, এটা খুব ভাল লেকচার। আজ পর্যন্ত আমি একটাও চালিয়ে দেখিনি। কেবল কোন আপনজন যদি গান গেয়ে থাকে, নিজের কোন প্রোগ্রাম বা বাজনা বাজিয়ে থাকেন, সেটা শুনি তাঁর সম্মানে। বিশেষ করে ধর্ম, ফিলজফি এই জিনিসগুলো কাগজে পড়তে গেলে আমার এক পাতায় কি লেখা আছে পড়তে যেখানে দশ থেকে পনের সেকেণ্ড লাগবে; সেখানে ওনারা লেকচারই দেবেন আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা, এত সময় বৃথা নষ্ট করতে কেন যাব? মূল বক্তব্য সংসারে অল্প একটু মন রাখলে অনেক কিছু হয়ে যায়।

মনের শক্তির ব্যাপারে আমরা একেবারেই সজাগ না। মনের যে কি সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা আমরা ধারণাই করতে পারব না। ধরুন আপনাকে যদি দারোয়ানগিরি করতে হয়, সেখানে তো তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, আপনার আট ঘণ্টা ডিউটি, আট ঘণ্টাই আপনাকে বসে বসে কাটাতে হবে। কিন্তু আপনার মনে যদি শক্তি থাকে, সেই সময়েও আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। আমি দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা করতাম। ক্লাশ ফাইভ, ক্লাশ সিক্স ও ক্লাশ সেভেন, পুরো তিনটে বছর জীবনে আমার স্বপ্ন ছিল, পাশ করার পর আমি এখানকার দারোয়ান হব। ডিউটির সময় বেশি কাজ থাকবে না, বসে বসে বই পড়ব; ডিউটির বাইরেও বই পড়ব। মনের শক্তি যদি থাকে তাহলে সময় নষ্ট না হতে দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। ঠাকুর এখানে এটাই দেখাচ্ছেন। নরেন, রাখাল, লাটু এদের জন্য ঠাকুরের মন কত ছটফট করত; এখানে এখন রাখালকে নিয়ে ঠাকুরের সেই রকম হচ্ছে; অথচ মনটা চলে যাচ্ছে গভীরে। আমার আপনার, এর ওর তার, সবারই এটাই হল জীবনধারা, মানে মনকে সর্বদা একটা উচ্চভাবের সাথে বেঁধে রাখতে হবে, সবাইকে এটাই করতে হবে। আর যতদিন এটা না করা হয়, ততদিন এই সংসারচক্রে ঘুরতে থাকবেন। আজ হোক, কাল হোক, সবাইকে যেতে হবে এই স্তরে; আপনিও যাবেন, আমিও যাব, আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

এই সময়ে গেরুয়া কাপড়-পরা অপরিচিত একটি বাঙালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী –অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয়

ঠাকুরের সমাধি ক্রমে ভাঙছে। **ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতেছেন**। ঠাকুর যখনই ভাবস্থ হয়ে কথা বলতেন, অর্থাৎ অর্ধবাহ্যদশায় যে কথাগুলো বলতেন, সেই কথাগুলো একেবারে ঈশ্বরীয় কথা। কারণ তখনও মনটা জুড়ে রয়েছে সেই সমাধির সাথে। ঠাকুরের কথা, অবতারের কথা; এভাবে বিচার হয় না। তবে যখন বাহ্যদশায় আছেন, তখন তাও হয়ত একটু আধটু বিচারাদি করছেন; যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যাচ্ছেন, মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, আমার জামার বোতাম ঠিক আছে কিনা। কিন্তু অর্ধবাহ্যদশায় চলে গেলে এগুলো এক পাশে পড়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুয়াদৃষ্টে) –আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন এই লোকটির আধার নেই। রাখালকে নিয়ে কথা, সমাধি, সেখান থেকে আরেকজনকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সংসারীরা এটা কখনই পারবে না। সন্তানকে নিয়ে যদি থাকে, সারাটা দিন ওই সন্তানকে নিয়েই পড়ে থাকবে –আমার সন্তান এই করেছে, সেই করেছে। সন্তান হল একটা উপলক্ষ মাত্র, উদ্দেশ্য হল মনকে কুড়িয়ে নিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

একজন বলেছিল, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী"। –আগে চণ্ডীর গান গাইত, এখন ঢাক বাজায়। (সকলের হাস্য)। ঢেকী যদি স্বর্গে যায় কি করবে? ধান ভাঙবে, আর কি করবে। আপনি যা, আপনি যাই পাল্টে নিন, আপনি তাই থাকবেন; খুব সুন্দর একটা কথা আছে –যাবে তুমি নেপাল, সঙ্গে যাবে কপাল। আপনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে যান, গেরুয়া কাপড় পরে নিলেন, তাতে যে আপনার সংস্কার পাল্টে যাবে তাতো না। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে, এখানে যে ডিসিপ্লিন আছে, ডিসিপ্লিনে থাকতে থাকতে একটা পরিবর্তন অবশ্যই হবে। কিন্তু তখনকার দিনে তো এ-রকম কোন সঙ্ঘ ছিল না, একা একা থাকতেন। আর সন্ন্যাসী হলে অহঙ্কার বেড়ে যায়, নিজেকে মনে করে আমি জগৎগুরু, মনে করে আমি সবজান্তা। বলছেন, আগে চণ্ডীর গান গাইতাম, এখন ঢাক বাজায়। একই জিনিস, কোন পরিবর্তন নেই।

তিন-চার রকম বৈরাগ্যের কথা বলা হয়। ঠাকুরও এই কথা বারবার বলতেন। এখন এই প্রসঙ্গটা বেশি চলবে। ঈশ্বরে যে ভক্তি, ওই ভক্তিটা যেন শুদ্ধ থাকে; বৈরাগ্য আর ভক্তি দুটো মিলেমিশে রয়েছে। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে –সেই বৈরাগ্য বেশিদিন থাকে না। অনেকের অনেক সময় এই রকম হয় যে, সংসারে যখন প্রচুর কষ্ট পায়, তখন বৈরাগ্য এসে যায়। এই বৈরাগ্য মানুষকে উপরে নিয়ে যায়। আমরা মনে করব, এই তো বৈরাগ্য হল দেখলাম, কিন্তু আবার তো সংসারেই ফিরে এলে। ঠিকই, ফেরত এলো, কিন্তু ছাড়ল তো। এটাই ক্রমে ক্রমে সংস্কার তৈরী হতে থাকবে। একটা সময় এমন হবে যখন পুরো সংসার ছেড়ে দেবে। তবে কি, গেরুয়া পরলে কি হয়, ওটাই বলছেন। ঠাকুর পরম আচার্য কিনা, এমনি সাধারণ কিছু না; তিনি কথা যখনই বলবেন উচ্চতম অবস্থা থেকে বলবেন।

হয়তো কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিনমাস পরে ঘরে পত্র এল, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না'। এটা এক ধরণের বৈরাগ্য, ঠিকই এটাও বৈরাগ্য, অভাবে বৈরাগ্য এসেছে তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ এটাই পরের কোন জন্মে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, ঠাকুর এই জিনিসগুলিকে এ-ভাবে অনুমোদন করার জন্য আসেননি; অবতার এসেছেন আসল জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সেইজন্য বলছেন, **আবার সব আছে, কোন অভাব নেই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য**।

আমাদের ইউনিভার্সিটির যেখানে আমি বর্তমানে আছি, এখানে আমাদের সাত থেকে আটজন নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজ আছেন, যাঁরা অক্সফোর্ড, হার্ভাডের মত বিশ্বের নামকরা নামকরা সব ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ ফিজিক্সে, কেউ এ্যস্ট্রো ফিজিক্সে, কেউ কম্প্যুটারে পিএইচডি করেছেন, পোস্ট ডক্টরেট করেছেন। একজন মহারাজ অক্সফোর্ড থেকে এ্যপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে পোস্ট ডক্টরেট করা। সব ছেড়ে ঈশ্বরের পথে বেরিয়ে এসেছেন। অথচ ভারতের যুবকরা যারা সারাদিন প্রশ্ন করছে –Is it scientific? যাঁরা বিজ্ঞানের উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছে, যেটা সব যুবকের স্বপ্ন, সেখানে পৌঁছে, উপলব্ধি করে, ওগুলোকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে চলে এসেছেন। কোন পর্যায়ের ট্যালেন্ট ভাবা যায় না। আইআইটি থেকে পাশ করে, বিদেশে গিয়ে এত বড় বড় ডিগ্রি অর্জন, পৃথিবীর যে কোন ইউনিভার্সিটি তাঁদেরকে প্রফেসার করার জন্য লুফে নেবে, যে কোন কোম্পানি তাঁদেরকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে লুফে নেবে। অথচ সব ছেড়ে এই ইয়ং ছেলেগুলো সন্ন্যাসী হতে চলে এসেছেন। আমাদের এখানে একজন দুজন না, সাতজন আটজন আছেন।

ঠাকুর এনাদের জন্যই বলছেন। ঠাকুর জানতেন, একদিন সময় হবে যখন এই ধরণের ছেলেরা আসবে। আমার এক পরিচিত একজন কদিন আগে বলছিলেন, ওনার এক বাচ্চা ছেলে আছে, 'আমার খুব স্বপ্ন মহারাজ আমার সন্তান যেন এনাদের মত হয়, একদিকে বিরাট scientific outlook, অন্য

দিকে ভারতীয় সংস্কৃতি, এই যে হিন্দু ধর্ম, এর মধ্যে যেন গভীর ভাবে ঢুকে থাকে'। স্বামীজীর এটাই স্বপ্ন; একদিকে সব কিছু আছে, অন্য দিকে বৈরাগ্যবান। হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য, দুটো এক সঙ্গে চলে, উপলব্ধি ও বৈরাগ্য দুটো একসাথে চলে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এভাবে চলে না। আমাদের এখানে সংসার আর ঈশ্বর আলাদা কিছু না। সংসার তো ঈশ্বরের আর-একটি রূপ, সেইজন্য উপলব্ধিতে কোন দোষ নেই।

যারা এগুলো নিষেধ করে, ঠাকুরের ভাষায় এরা হলো ঢ্যামনা। নিজে কিছু পারেনি, অপরকেও তাই বলে তোমাকে কিছু করতে হবে না। যাঁরা নিজেরা পেরেছেন, ক্ষমতা আছে, তাঁরা বলেন বৈরাগ্য যেন থাকে। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। আসলে এখানে যিনি গেরুয়াধারণ করে আছেন, এটা মিথ্যা ধারণ। আমরা দেখেছি, গরমের সময় হরিদ্বার, হৃষিকেশ, গঙ্গোত্রীর ওদিকে প্রচুর লোক পার্টটাইম সন্ন্যাসী হয়ে যায়, চার মাসের জন্য সন্ন্যাসী। বাকি সময় ক্ষেত মজুরের কাজ করে। শুনতে খারাপ লাগে ঠিকই, কিন্তু আমি নিজেও প্রচুর এই রকম দেখেছি। ভারতবর্ষের মানুষ সন্ন্যাসীদের কিছু তো দান দেবেই, ওই লোভে কয়েক মাসের জন্য পার্টটাইম সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে আসে। ঠাকুর বলছেন, মিথ্যা কিছুই ভাল নয়, মিথ্যা ভেক ভাল না। বৌদ্ধ ধর্মে এটা আছে, ওরা অনেক সময় সাতদিনের জন্য, কি এক মাসের জন্য বা এক বছরের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন নেবে, তখন একশ ভাব ওই ভাবের প্রতি সমর্পিত থাকবে। ওদের এটাকে মিথ্যাচার বলা যাবে না। একজন সন্ন্যাসী লড়াই করে করে এগোচ্ছে, কোন কারণে স্লিপ করে গেল, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু এখানে ঠাকুর যে জিনিসটাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, আসলে এই লোকটির গেরুয়াধারণটা পুরোপুরি মিথ্যা।

মনুস্মৃতিতে আছে, *যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে, স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ*। যে মানুষ এক রকম করে কিন্তু দেখায় অন্য রকম, আর মিথ্যা কথা বলে। নিজেকে সৎ দেখাবার জন্য *সৎসু ভাষতে*, মিষ্টি করে করে কথা বলবে। *স পাপকৃত্তমো*, এরা হল একেবারে *পাপকৃত্তমঃ*। *লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ*, যে চোর সে দুটো টাকা চুরি করে; যে জালিয়াতি করে সে জালিয়াতি করে আরও বেশি টাকা চুরি করে। কিন্তু যারা এই ঢপবাজি করে, এই যে বলছেন, *যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে* অর্থাৎ যে আছে এক রকম, কিন্তু দেখাচ্ছে আর-এক রকম। ঠাকুর বলছেন মিথ্যা কিছুই ভাল না। মনু বলছেন, এরা আত্মার চুরি করছে, এরাই সবচেয়ে বড় পাপী। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, সবাই একই কথা বলে। মনু তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে যেটা বলেছেন, ঠাকুরও একই কথা এখানে বলছেন। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলা হয়, মিথ্যা আচরণ, মিথ্যা আচরণে কি হয়, যে চুরি করছে, সে পরিষ্কার আমি চোর, আমি চুরি করি; ডাকাতি করছে, আমি ডাকাত ডাকাতি করছি। কিন্তু যখন ঢপবাজি করছে, আছে এক রকম কিন্তু দেখাচ্ছে অন্য রকম, তখন *স্তেন আত্মাপহারকঃ*, আত্মাকেই চুরি করে নিচ্ছে; এর থেকে বড় চুরি আর হয় না।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, **মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙে যায়**। যার আছে ভয়, সেই রয়। যদি ভয় থাকে তবেই সে বাঁচে। ভয়টা যদি চলে যায়, তখন কি হয়, রাবণের যেমন, যে নারীকে ভাল লাগছে, মনে লাগছে তাকেই তুলে নিচ্ছে, অপহরণ করে নিচ্ছে। এই করতে করতে এমন জায়গায় রাবণ হাত দিল, আর সে বাঁচল না, ভয় চলে গেছে কিনা। যার ভয় চলে গেছে, আজ হোক কাল হোক সর্বনাশ তার হবেই।

তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া। বড় ভয়ঙ্কর। লোকেরা মনে করছে, আপনি কত বড় একজন ত্যাগী। রাবণ ঠিক এটাই করেছিল, ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ভিক্ষা নিতে এসেছে, সীতা মনে করছেন, উনি একজন ভাল মানুষ। তারপরের ইতিহাস তো সবার জানা।

এমনকি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা খারাপ কাজ করা ভাল নয়। এখানে বলতে হচ্ছে, যাঁরা সিনেমাতে অভিনয় করেন, যাঁরা নাটকে অভিনয় করেন, এনারা তো তাহলে আর অভিনয়ই করতে পারবেন না। আর তাই যদি হয় তাহলে তো নাট্যকলা, চলচ্চিত্র শিল্পটাই থাকবে না। অভিনয় মানেই পুরো জিনিসটা মিথ্যা। তাহলে যাঁরা অভিনয় জগতে আছেন, অভিনয় যাঁদের পেশা, তাঁরা তো আর ধর্ম জীবনে আসতেই পারবেন না, যদিও আসেন খুব কঠিন জীবন হয়ে যাবে। এখন চাকরি হিসাবে, পেট চালানোর জন্য আছে, সেখান পর্যন্ত ঠিক আছে। সোহরাব মোদি তাঁর নিজের সময়ে সিনেমা জগতের খুব নামকরা অভিনেতা ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাংলা সিনেমার খুব নামকরা নায়িকা, তিনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিলেন। আমাদের পূজ্যপাদ ভরত মহারাজ ছিলেন, একদিন কোন একটা কথায় তিনি সেই নায়িকাকে এই কথা বললেন। সেইদিন থেকে তিনি পুরোপুরি ভাবে অভিনয় করা ছেড়ে দিলেন; ওই জগৎটাকেই চিরদিনের মত সম্পূর্ণ ভাবে বিদায় জানিয়ে দিলেন। ঠাকুরের কথাটা হল, যারা সৎ, তারা এটাও করবে না। তাহলে যাঁরা অভিনয় জীবনে আছেন আবার ঈশ্বরের দিকেও যেতে চাইছেন, তাঁরা কি করবেন? কিছু না, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, হে ঠাকুর কৃপা কর যাতে অভিনয়ে মিথ্যা কথা বলতে না হয়, খারাপ কাজ করতে না হয়, দুষ্ট চরিত্রের অভিনয় করাটা আমার যেন বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যাবে অভিনয়ে তার চরিত্রগুলো হয়ত অন্য রকম আসতে শুরু হয়ে যাবে।

কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছলাম। এই ঘটনাকে নিয়ে ঠাকুরের খুব রাগ ছিল। আমরা দিনরাত ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে গলা ফাটিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুর কোথাও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেননি। স্বামীজীও কোথাও বলেননি সর্বধর্মসমন্বয় করতে হবে। কথামৃতে কোথাও ঠাকুর একবারও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলছেন না, ঠাকুর শুধু বলছেন মত পথ। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন সহ কয়েকজন ব্রাহ্মনেতাদের প্রভাবে পড়ে পুরো ব্রাহ্মসমাজের ফলোয়ারসরা সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু বিরোধী কাজ করে গেছে। আদৌ এনারা হিন্দু ধর্ম বুঝতেন কিনা জানিনা, কতটুকু বুঝতেন ভগবান জানেন।

ঠাকুর কি শব্দ ব্যবহার করছে দেখুন – **একটা আনলে ক্রস (cross)**। এর থেকে তাচ্ছিল্য আর কি হতে পারে। ক্রশ এনেছে আর তার সঙ্গে জল ছড়াতে লাগল, বলে শান্তিজল। এটা কি ধরণের ধর্ম? একদিকে আপনি ক্রশ নিয়ে ঘুরছেন, যেটা কিনা পুরোপুরি খ্রীশ্চান পরম্পরার জিনিস। এগুলো হল এদের খ্রীশ্চানদের মোসায়েবি করা। সাহেবদের সঙ্গে থাকছে, কুইনের সঙ্গে দেখা করছে, আর দেখাচ্ছে আমাদের ধর্মেও খ্রীশ্চান ভাব আছে।

আমার এক বন্ধু ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসার ছিলেন, একদিন আমাকে বলছেন, Don't use 'H' in your writings। হিন্দু শব্দটাও বলছেন না, বলছেন হিন্দুর 'H' word। বাংলা, দিল্লী সব জায়গায় এখন যে একটা আপার ক্লাশ সোসাইটি এসেছে, এদের কাছে 'হিন্দু' শব্দটা বলে ফেললে মনে করবে যেন একটা ডাইনিকে দেখে ফেলেছে। এগুলো সব হাইব্রীড জাতি। একদিকে ক্রশ নিয়ে আসছে অন্য দিকে শান্তিজল ছড়াচ্ছে। এই কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে পুরো কলকাতা তখন উন্মত্ত। ওই পরম্পরায় খুব নামকরা সব লোকের আবির্ভাব হয়েছে। *মহাজনো যেনো গতাঃ স পন্থা,* মহাপুরষ যে পথে যান সেটাই পথ। সেই সময় কেশবচন্দ্র সেনের কত নামডাক, কত বড় বিখ্যাত লোক। তাঁরা যেখানে এই জিনিস করেন, তখন অন্যরাও সেটাকেই অনুসরণ করবে। এরাই হিন্দু ধর্মের নামে অপপ্রচার করবেন, শিবলিঙ্গের নামে অপব্যাখ্যা করবেন। কথায় কথায় বলবে, এটা কি বিজ্ঞানসম্মত, এটা কি যুক্তিসম্মত? আরে ভাই তোমরা আগে বিচার করে দেখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাগুলি কি লজিক্যাল? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলি কি বিজ্ঞানসম্মত? এগুলোকে নিয়ে কখন তো প্রশ্ন করো না? ধর্মকে নিয়ে এত প্রশ্ন কেন? কবিতা একটা এ্যপ্রোচ, সাহিত্য একটা এ্যপ্রোচ; ধর্মবিজ্ঞান অন্তর্জগতের একটা এ্যপ্রোচ। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি, Religion is higher than science।

ঠাকুর একটু ভদ্র সেজে থাকতে চাইতেন। কিন্তু কতক্ষণ আর ভদ্র সেজে থাকবেন। ছোট বাচ্চাকে যদি চুপ করে বসে থাকতে বলা হয়, কতক্ষণ আর চুপ করে বসবে। খুব জোর এক মিনিট কি দেড় মিনিট, তারপরই নিজের রূপ ধারণ করে নেবে। ঠাকুরও নিজের রূপ ধারণ করে নিতেন। কেশবচন্দ্র সেনকে এত ভালবাসেন, তাঁর চিন্তা কেশবের যদি কিছু হয়ে যায় তখন কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব। কিন্তু এবার শুরু হয়ে গেল, কি একটা ক্রশ আনলে। পরে আবার ঠাকুর বলবেন। ঠাকুর হিপোক্রেসি একেবারেই পছন্দ করতেন না। যেটা মনুও বলছেন, আত্মার অপহরণ করছেন – শান্তিজল আর ক্রশ সব মিলিয়ে কি একটা হাইব্রীড ধর্ম দাঁড় করিয়েছেন; বাংলার পুরো সর্বনাশ করে দিয়ে চলে গেলেন। **একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে**। ওই নাটকের মধ্যেই হচ্ছিল।

ব্রাহ্মভক –কু – বাবু। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল না।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, স্বপ্নও যদি দেখতে হয়, তাহলে চিরন্তন মুক্তি, পবিত্রতা এসবেরই স্বপ্ন দেখতে হয়। এই জগৎটা যদি মিথ্যাই হয়, এই জগৎটা যদি স্বপ্নই হয়, তাহলে বাজে জিনিসের স্বপ্ন আমি কেন দেখব। আমাদের একজন মহারাজ খুব মজা করে গল্প করতেন। তখন আমাদের বয়স কম ছিল, ওই বয়সে এই ধরণের গল্প শুনতে খুব ভাল লাগত। বলছেন, দুজন বন্ধু জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। রাত্রিবেলা দুজনে গাছের তলায় চুপচাপ পড়ে আছে। এক বন্ধুর খিদে পেয়েছে, বলছে, 'এই সময় যদি লুচি আর আলুরদম পাওয়া যেত, কি ভালই না হত'। আরেকজন বলছে, 'লুচি সবজি বলিস কি; এই সময় যদি মটন বিরিয়ানি, মণ্ডা-মিঠাই হত, কি মজাই না হত'। তখন ওই বন্ধু বলছেন, 'রুটিই জুটছে না আর তুই বিরিয়ানির কথা বলছিস'? বন্ধুটি বলছে –'ভাবতেই যদি হয় বড় কিছু ভাব'। এই মিথ্যা জগতে স্বপ্নও যদি দেখতে হয়, তাহলে একটা চোরের অভিনয়, একটা মাতালের অভিনয়, ডাকাতের অভিনয় কেন করবে? সে তো রাস্তাঘাটে হরবকৎ দেখা যায়।

এই কথাগুলো যাঁরা সৎ হতে চান, ধর্মজীবন যাপন করতে চান, তাঁদের নিয়েই বলা হচ্ছে, সবার জন্য নয়। জগতে যে কোন কথা সবার জন্য নয়। গীতা, উপনিষদ কজন পড়ে আর কজনই বা শোনে। তাই বলে আবার সবাই যে সিনেমার গান শুনছে, সিনেমা দেখছে, তাও না। জগতের কোন জিনিস কক্ষণ সবার জন্য নয়। যারা সৎ, যারা ভাল, যাদের ভিতর আধ্যাত্মিক বৃত্তি রয়েছে, এটা তাদের জন্য। যখনই কোন কিছু ভাববেন, বড় কিছু ভাবুন –আমি জীবনমুক্ত হতে চাই, মৃত্যুর পর আমি মুক্তি চাই। ওর নীচে কেন আপনি ভাববেন? আমি মরে ছাই হয়ে যাব, এই ধরণের কথা কেন ভাবতে যাবেন? মরে কি হবে কেউ জানে না। যারা বস্তুবাদী, যারা কোন কিছু বিশ্বাস করে না, তারাও জানে না আর আমি, আপনিও জানি না। শাস্ত্র এক রকম বলছে, বস্তুবাদী দর্শন আর-এক রকম বলছে। আমাকে যদি মেনে নিতে হয়, বিশ্বাসই যদি করতে হয়; তাহলে বড় কিছুকে কেন বিশ্বাস করব না। আমি মুক্তির উপর বিশ্বাস করব; পবিত্রতাকে বিশ্বাস করব, যেটা খুব কম লোকের হয়।

ইদানিং নূতন একটা হয়েছে, চাকরি করতে কেউ যখন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যায়, তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে –তোমার speciality বল। আপনাকে এখন ভাবতে হবে, আপনি কিসে স্পেশাল। আমার বিশেষকে নিয়ে যদি ভাবতেই হয়, তাহলে কেন আমি এটা চিন্তা করব না যে, আমি স্পিরিচুয়ালি গ্রেট। কারণ বাকি সব কিছু অনেকেরই হয়ে যেতে পারে। টাকা-পয়সা অনেকেই আয় করে নিতে পারে, বাকি যা কিছু অনেকেই হতে পারে কিন্তু চাইলেই কেউ জীবনমুক্ত হতে পারবে না। স্বপ্নও যদি আপনাকে দেখতে হয় –think big, think rare। স্বপ্ন যদি সত্য না হয় তাহলে কারোরই হবে না, আপনারও হবে না। আর যদি স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়, আপনি রাজা। ম্যাথামেটিক্সের প্রোবাবিলিটি থিয়োরি যদি লাগান, দেখবেন সবটাই আপনার অনুকূলে যাচ্ছে। একটা বিয়ে করব, একটা ছেলে হবে, সংসার পাতব; এগুলোই যদি ভাবতে হয়, একটু বড় ভাবুন, আমি জীবনমুক্ত হব। অভিনয় যদি করতে হয়,

রাজার অভিনয় করুন; মাতালের অভিনয় কেন করতে যাবেন। আপনি বলবেন, তাহলে তো সিনেমাই বন্ধ হয়ে যাবে। এখনে সিনেমার কলাকুশলীদের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে বলা হচ্ছে যাঁরা সৎ হতে চাইছেন। কথামৃতে যদিও অনেক ধরণের কথা আছে, কিন্তু মূলতঃ এটা তাঁদের জন্য ধর্মজীবনে যাঁরা মহৎ হতে চান।

বলছেন, **ও-সব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়**। দিনরাত ভাবতে ভাবতে ও-রকম হয়ে যায়। **মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে**।

অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, যাত্রাতে যারা মেয়ে সেজে অভিনয় করে, আমি দেখেছি, দাঁত মাজা ও আরও অনেক কিছু ব্যবহার মেয়েদের মতই হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি খুব ভালবাসা থাকে দেখবেন, তাদের কথা বলা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা সব এক রকম হয়ে যায়। এক অপরকে ভাবতে থাকে বলে ও-রকম হয়ে যায়। ভাবতেই যদি হয়, একটা কিছু জীবনে যদি হতে হয়, তাহলে বাড়ির চারিদিকে স্বামীজীর ছবি লাগিয়ে রাখুন। Be strong and free, ভাবতে যদি হয়, এই লাইনে ভাবতে হবে। পেট চালানোর জন্য চাকরি করতে হবে, চাকরি করার পর সেখানেই শেষ, এই সাদামাটা জীবন আপনার স্বপ্ন কেন হবে। স্বপ্ন আবার realistic কি করে হবে, স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বামীজী বলতেন, মারিত গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার। শিকার যদি করতে তাহলে বড় গণ্ডার শিকার করুন, আর যদি লুট করতে হয় তাহলে বড় ভাণ্ডার লুট কর। ছিঁচড়ে চোর হয়ে কি হবে, পকেটমার হয়ে কি হবে।

আর-একদিন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখতে গিছিলাম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলি খোশামুদি শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি'! ভাল লোকদের বরবাদ করার জন্য এটা হল মোক্ষম। তাকে শুধু বলতে হয়, 'আহা! আপনার মত আর দেখিনি'। **কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন'? আমি বললুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু'। কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল**। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, কেশবের ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে তার এত লোকমান্য। সব মানুষের ভিতর লোকমান্য হওয়ার একটা ইচ্ছা থাকে। তবে আপনার লোকমান্য হওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে ঠাকুরের মত হওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার নামে পুরো একটা সঙ্ঘ যেন দাঁড়িয়ে যায়। ওটা যদি না হয়, তাহলে স্বামীজীর মত হতে চেষ্টা করুন। নিজের সময়ে জগতে পুরো আলোড়ন সৃষ্টি করে দেবেন। ওর নিচে আর কি স্বপ্ন দেখবেন, স্বপ্ন দেখতে হলে এই রকম স্বপ্নই দেখতে হবে। স্বপ্ন যদি সফল না হয়, তাতে আপনার মন খারাপ করার কিছু হবে না। বেশির ভাগ স্বপ্ন এভাবেই নষ্ট হয়।

তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, মনে যে কোন একটা চিন্তা যখন আসে, আমি এ-রকমটি হব, আমি এ-রকমটি করব; বুঝবেন সেই রকমটি হতে আপনার আর দেরী নেই বা সে রকমটি করা হয়ে গেছে। আমাদের যে মন, একটা জিনিস বাস্তবে হয়েছি কি হয়নি বা মনে মনে হয়েছে কি হইনি; এই দুটোকে মন তফাৎ করতে পারে না। মনের কাছে সবটাই বৃত্তি, স্মৃতিটাও একটা বৃত্তি, প্রত্যক্ষ হচ্ছে এটাও একটা বৃত্তি। বাস্তবে যেটা হচ্ছে সেটার থেকে মন তফাৎ করতে পারে না, মনের কাছে সব সমান। মনে মনে আপনি ভাবতে লাগলেন যে, আমি সাধু হব, আমি এই হব; সঙ্কল্প যখন শুরু হল, তখন এটাকে বাস্তবায়িত করাটা আর অসম্ভব থাকে না। আজ হোক, কাল হোক, এটা বাস্তবায়িত হবে; বিশেষ করে আপনার মনের ব্যাপারটা যেখানে আছে। তবে আপনি যদি বলেন, আমি পুরো জগৎকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব, এটা করা যাবে না, কারণ এখানে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এটাও হয়ে যেতে পারে, আপনি যদি জন্মজন্মান্তর ধরে শুধু এটাই ভাবতে থাকেন, কোন জন্মে গিয়ে আপনি এ্যটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে গোটা বিশ্বকে ছাই করেও দিতে পারেন। কিন্তু যে কোন জিনিস বাস্তবে হওয়ার আগে মনেই হয়, পরে বাহ্য জগতে হয়। আমরা বাস্তব বাস্তব বলি বটে, বাস্তব বলে কিছু

হয় না। মন বাস্তব অবাস্তব বলে জানে না। মন জানে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ। ওর কাছে অন্তর্জগতও যা বহির্জগতও তাই। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ওগুলোকে আলাদা করে রেখেছি। তাই ভাবতেই যদি হয়, পবিত্রতাকে নিয়ে ভাবব; ভাবতেই যদি হয় মুক্তির কথাই ভাবব।

(অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি) –নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল এই সব ছোকরা, এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত।

আগে আগে আমরা নিত্যসিদ্ধ জিনিসটা কি, এর উপর বিরাট আলোচনা করেছিলাম। তিনটে শরীরের কথা বলা হয় –স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। কারণের পর মহাকারণ। স্থূল হল আমাদের পঞ্চভূতের এই শরীর, আমাদের বহির্জগৎ; সূক্ষ্ম শরীর হল মন ইন্দ্রিয়ের জগৎ। স্বপ্ন আদি এই সূক্ষ্ম জগতেই হয়। কারণ জগৎ হল, যেখানে সেই শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মার উপর আমিত্বের একটা অজ্ঞান আবরণ। যখন ওই আবরণটাও চলে যায়, তখন ওটা হয়ে যায় আত্মার জগৎ; এটাকে মহাকারণ বলা হয়। যাঁর ধ্যান করতে করতে যেমন চিন্তা-ভাবনা হয়, যেমন ধ্যানের গভীরতা হয়, সেই অনুসারে একজন মানুষ স্থূল জগতের বাসী হন বা সূক্ষ্ম জগতের বাসী হন। কারণ জগতের বাসী সবাই হতে পারে না। সেখানে তাঁরাই বাসী হন যাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ ভক্ত। বৈষ্ণবরা এটাকেই সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য আদি বলে। ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন, এনারাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসেন।

অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব –বসানো শিব নয়। শিবলিঙ্গ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়, এখন পাতাল ফোঁড়া শিব কোথায় আছে আমার জানা নেই। ঠাকুর যখন বলছেন, অবশ্যই কোথাও না কোথাও থাকতে হবে। পাতাল ফোঁড়া শিব বলতে যেটা বোঝায়, তিনি স্বাভাবিক, স্বয়ম্ভূ। শিব মানে স্বয়ম্ভু তিনি নিজেই হয়েছেন, পাতাল ফোঁড়া শিব। আমি আপনি যদি চেষ্টা করি ওই একটু ভক্তি হতে পারে, বাকিটা ঠাকুর দেখবেন। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ অন্য জগতের বাসিন্দা। এনারা আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, মানুষের উদ্ধারের জন্য।

নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়, টিয়াপাখির যেমন ঠোঁট বাঁকা। **এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।**

সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়। ঠাকুর এখানে পর পর যাঁরা নিত্যসিদ্ধ আর যাঁরা সাধারণ মানের সাধকদের তফাৎগুলো বলছেন। আগে আমরা এক জায়গায় বলেছিলাম, সাধকরা সাধনা করে যে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন; অবতার বা নিত্যসিদ্ধ নামতে নামতে সেখানে আসেন। এনারা নিম্নতম যেখানে আসতে পারেন, সাধকরা শ্রেষ্ঠতম রূপে সেখানে পৌঁছাতে পারেন। ঠাকুর এখানে অনেকগুলো উপমা দিচ্ছেন। আমাদের সবাইকে কোন না কোন সময় সেই নিত্যসিদ্ধই হতে হবে। অনেক জন্ম তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে। এই নয় যে আমরা হব না। একবার নিত্যসিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি আর কোনদিন সাধারণ হবেন না।

পাতাল ফোঁড়া শিবের কথায় হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ল। একবার দুজন ইয়ং ছেলের সাথে পরিচয় হয়। দুজনেই স্বামীজীর ভক্ত। ওরা নিজেদের মধ্যে একটা কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি করছিল। আমার কাছে এসেছে জিজ্ঞেস করবে বলে। আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম। একজন বলছে, আমি যদি চেষ্টা করি, সমস্ত রকম সাধনা করি, তাহলে আমিও স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারি। আরেকজনের মত হল, যত সাধনাই কর স্বামী বিবেকানন্দ কোনদিন তুমি হতে পারবে না। আপনাদের মনেও হয়ত এই ধরণের প্রশ্ন এসেছে বা এখানে সেখানে এই ধরণের আলোচনা শুনে থাকবেন। যত শুনবেন তত এই জিনিসগুলো confusing লাগবে। ঠাকুর বলছেন শক্তি; আধ্যাত্মিক জীবনটাও একটা শক্তি। এই শক্তি কি অর্জন করা যায়? দেববাণীতে স্বামীজী বারবার বলছেন, তোমাকেই বুদ্ধ হতে হবে, তোমাকেই যীশু

খ্রীষ্ট হতে হবে। যাঁরা বেদান্তের একটা দুটো কথা জানেন, তাঁরাও ভাববেন, কেন হওয়া যাবে না; কারণ সবই তো আত্মা।

এখানে সাধারণ একটি কথা যদি মনে রাখা হয় তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে – শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে যাওয়ার কয়েকদিন আগে নরেন ঠাকুরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর মনে মনে ভাবছেন –এই অবস্থাতেও তিনি যদি বলেন, আমি অবতার। অবতার, এই জিনিসটাকে বিশ্বাস করা অত সহজ না। এত কিছু হওয়ার পরেও সপ্তর্ষি থেকে নিয়ে আসা নরেনরেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে ঠাকুর অবতার, সেখানে আমার আপনার কি করে বিশ্বাস হবে। আমরা যে অবতার অবতার করি, এগুলো আমাদের মুখের কথা। একটু শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বড়দের কাছে শুনেছি, সেইজন্য বলি যে, ঠাকুর অবতার। ঠাকুর তখন নরেনকে বলছেন –যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দৃষ্টিতে না। বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তখন সবই এক। উপনিষদের খুব সুন্দর উদাহরণ –মাটির হাতি আর মাটির ইঁদুর; মাটির হাতি কখনই ইঁদুরের মত ছোট হয়ে যাবে না, ইঁদুরও হাতির মত বড় হয়ে যাবে না। জলে ফেলে দেওয়ার পর দুটো মিশে এক হয়ে যাবে, তখন হাতিও নেই ইঁদুরও নেই, সবটাই মাটি হয়ে গেল।

এর অর্থ, তত্ত্বের দৃষ্টিতে আপনি বুদ্ধ হতে পারেন, তত্ত্বের দৃষ্টিতে আপনি যীশু হতে পারেন; কিন্তু এই জগতে আপনি কখনই বুদ্ধ হতে পারবেন না। ভাগবতে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মন্বন্তরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কল্পের কথা আছে, ব্রহ্মার একটা দিনের কথা আছে, ব্রহ্মার পুরো একটা জীবন নিয়ে কথা আছে, মনুর একটা জীবন নিয়ে আসা হয়েছে, সত্যযুগ আদি নিয়ে আসা হয়েছে। এগুলো দিয়ে ভাগবত বোঝানর চেষ্টা করছেন, সৃষ্টি কত বিরাট। সেই সৃষ্টিতে ভগবান কতবার আসছেন, কতবার যাচ্ছেন। তত্ত্বের দিক থেকে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ এই সৃষ্টি আছে ততক্ষণ আমরা তাঁর সঙ্গে কখনই এক হতে পারব না। সৃষ্টি যখন থাকবে না, তখন এই কথার কোন দামই থাকবে না। কারণ তখন না থাকবে এই সিংহ, হাতি, ইঁদুর, মশা, না থাকবে এগুলোকে নিয়ে বলার জন্য কেউ। আমাদের যত রকম কথা, আমাদের যত চিন্তা-ভাবনা, আমাদের যা কিছু বোঝা, সব কিছুই সৃষ্টির মধ্যে। এই সৃষ্টির মধ্যে ভগবান হলেন সবার উপরে। ভগবানের ঠিক নিচে হলেন, বৈকুণ্ঠধামে তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরা। বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি বলেন, তাহলে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ; ভগবান যখন এই সৃষ্টিতে অবতার হয়ে আসেন তখন কারণ জগৎ থেকে কয়েকজনকে সঙ্গে করে আনেন, তাঁদেরই আনেন কারণ জগতের শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় আছেন।

যদি ঠাকুরকে বিশ্বাস করি তাহলে পুরোটাই বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস যদি না করি, তাহলে কোনটাই করব না। ঠাকুর যখন কাউকে দেখে বলছেন, তোমাকে আমি অমুক মণ্ডলীতে দেখেছি, তোমাকে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখেছি, তোমাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখেছি; তখন এই কথাগুলোকে মেনে নিতে হবে। আর এই যে নিত্যসিদ্ধের কথা বলছেন, এগুলোকেও মেনে নিতে হবে। যারা ক্লাশ টু, ক্লাশ থ্রীতে পড়ে তারাও ছাত্র আর যাঁরা ইউনিভার্সিটিতে পাশ করার পর পোস্ট ডক্টর করছে তাঁরাও ছাত্র। কিন্তু ছাত্রের সাথে ছাত্রের তফাৎ আছে। এনাদের যদি তুলনা করতেই হয়, যাঁরা পোস্ট ডক্টর করছেন তাঁদের সাথে তুলনা করতে হবে। একদিকে তাঁরা ইউনিভার্সিটি ছাড়েননি, চাইলেই ছেড়ে দিতে পারেন; কিন্তু রিসার্চ করছেন, সেইজন্য ছাত্র। পিএইচডি হয়ে গেছে, নূতন করে তাঁর পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের স্থূল ভাষা, গেঁয়ো ভাষাতে যদি বুঝতে হয় তাহলে নরেন্দ্র-রাখাল এনাদেরকে বুঝতে হবে, আধ্যাত্মিক জীবনে এনারা হলেন পোস্ট ডক্টর। একদিকে এনারা মুক্ত হয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে ইউনিভার্সিটি আর দরকার নেই। নিজের খুশিতে আছেন, থাকলেও ভাল, না থাকলেও ভাল। চাইলেই তাঁরা ইউনিভার্সিটির আচার্য হয়ে যেতে পারেন। আবার আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের এনারা ক্লাশও নেন।

কিন্তু ঠাকুর এই উপমাগুলো না দিয়ে বলছেন – বসানো শিব, পাতাল ফোঁড়া শিব। শিবলিঙ্গকে বসাতে হয়, আবার প্রবাদ আছে যে, কোথাও কোথাও শিব মাটি থেকে বেরিয়ে আসেন। পুরাণে এই ধরণের কিছু কিছু কাহিনী আছে। যেমন বলা হয়ে যে, কাশী বিশ্বনাথ পাতাল ফোঁড়া শিব, শিবলিঙ্গ ওখানে বসানো হয়নি। তাঁর মানে নিত্যসিদ্ধ যাঁরা এনারা হলেন স্বয়ম্ভূ।

ঠাকুর বলছেন, নিত্যসিদ্ধ একটি আলাদা থাক। এগুলো আমাদের বুঝতে হয়। অনেক সময় মনে হয় যে, এনারা আমাদের মতই একজন; কিন্তু এনারা কোন মতেই আমাদের মত নন। নরেন-রাখাল এনারা কোন অর্থেই আমাদের মত নন। একটা জায়গায় জন্ম নিতে হয়েছে, তাই জন্ম নিয়েছেন; জন্ম নেওয়ার পর একটা জায়গায় সংসারের মত আচরণ করতে হয়েছে, এর বেশি আর কিছু না। আসক্তি কি এনারা জানেনও না, এই আছে, এই নেই। বাচ্চাদের যেমন কোন কিছুতেই আসক্তি থাকে না, মা হলেই হল। এনাদেরও ঈশ্বর হলেই হল, ঈশ্বর ছাড়া কিছু বোঝেন না।

এর পরে যে ঠাকুরের বাক্য, এই বাক্য দিয়ে ঠাকুর কাউকে ছোট করার জন্য বা বড় করার জন্য বলছেন না –**সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়**। সংসার যে শুধু ভোগের জন্য তা তো না, সংসার একটা দায়ীত্বের জায়গা, এখানে অনেক দায়ীত্ব আছে। বাবা আছেন, মা আছেন, আর যে কোন কারণে যখন বিবাহ করেছে তখন আরও দায়ীত্ব এসেছে, স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি দায়ীত্ব আছে। ফলে সংসারে আসক্ত হতেই হয়। টাকা-পয়সা রাখতেই হয়, টাকা-পয়সার চিন্তা করতেই হয়, নিজের শরীর স্বাস্থের দিকে তাকাতেই হবে। অনেকের ভুল ধারণা যে এগুলো লাগে না; না, সব জিনিসই লাগে। ঠাকুর এসে দেখালেন কি কি করতে হয়। এরপর বলছেন।

কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। কামিনী জিনিসটা খুব interesting। প্রথমের দিকে মহারাজরা যখন কথামৃতকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে চাইছিলেন, তখন তাঁরা কামিনী আর কাঞ্চনকে অনুবাদ করতে চাইলেন sex and gold। কিন্তু ওই অনুবাদ করতে দেওয়া হল না, বলে দেওয়া হল –যেমনটি আছে তেমনটিই রাখতে হবে। পুরুষদের সামনে ঠাকুর এই কথা বলছেন, তাই 'কামিনী' বলাটাই স্বাভাবিক। আবার ঠাকুরের মহিলা ভক্তরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বলছেন, তিনি তাঁদের পুরুষ-কাঞ্চন বলতেন।

যোগশাস্ত্র বলছেন –অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটিকে বলা হয় ক্লেশ। অভিনিবেশ মানে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। দ্বেষ মানে যেটা থেকে দূরে যেতে চাই। রাগ মানে অনুরাগ, যেটাকে ভালবাসি। অস্মিতা মানে, যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি বা চৈতন্য ও জড়ের মিলন হয়। অবিদ্যা, আমাদের জ্ঞানকে ঢেকে দেন।

কামিনী যখন পুরুষের জীবনে আসে তখন এই পাঁচটা স্তরেই আসে। যে কোন বস্তু, যেমন ধরুন এই কলম আছে; কলমটা আমার কাজে লাগে, এর প্রতি আমার অনুরাগ। যদি ভেঙে যায় কাজ করা যাবে না। তখন এর প্রতি দ্বেষ আসবে –এটা সরিয়ে দাও, আমার কাজের অসুবিধা করবে; সেখানেই শেষ। কামিনী জিনিসটা পুরুষের জন্য বা মেয়েদের জন্য পুরুষ। মেয়েরা ইমোশানালি অনেক stable হয়, পুরুষ জাতি unstable হয়। পুরুষরা unstable হয় বলে মেয়েদের পিছনে বেশি দৌড়ায়; মেয়েদের এত বেশি ছেলেদের পিছনে দৌড়াতে দেখা যায় না। সেইজন্য আমাদের হিন্দু ধর্মেই না, অন্যান্য সোসাইটিতেও বিবাহে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বয়সের একটা তফাৎ রাখা হয়; পুরুষের বয়স বেশি রাখা হয়। কারণ ইমোশানালিজমকে যদি সামঞ্জস্য রাখতে হয়, তাহলে ষোল বছরের যে ইমোশানাল স্ট্যাবিলিটি, সেই স্ট্যাবিলিটি একটা কুড়ি একুশ বছরের ছেলের হয়, তাঁর অন্যান্য ক্ষমতা যাই থাকুক। যার জন্য দেখা যায় সমবয়সীর মধ্যে বিবাহ হলে সেখানে মেয়েদের আধিপত্য অনেক বেশি হয়। কারণ পুরুষের ইমোশানাল নির্ভরতা অনেক বেশি, মেয়েদের এতটা থাকে না।

যদি বিচার করে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে কামিনী জিনিসটা প্রত্যেকটি জায়গায় আছে। অবিদ্যা রূপে আছে, অস্মিতা রূপে আছে, যেখানে মানুষ মনে করে এ হল আমার সব কিছু, এ আমার অস্তিত্ব। যার জন্য প্রেমে প্রত্যাখিত হলে মানুষ আত্মহত্যা করে নিতে দ্বিধা করে না। কামিনীতে অনুরাগ রয়েছে, আবার অনেক সময় দ্বেষ হয়। আর অভিনিবেশ, বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা; আমি তাকে হাতছাড়া হতে দেব না। মানুষ সব কিছু ছেড়ে দেবে কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ছাড়বে না। একদিকে ঈশ্বর অন্য দিকে কামিনী। মাঝখানে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলোর দাম মানুষের জীবনে অত বেশি থাকে না।

এটাকেই আমি মজা করে বলছিলাম –*অহম্ অস্মি* ও *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এই দুটো সত্তা; কামিনীকে নিয়ে যখন থাকে, তখন হয়ে যায় *অহম্ অস্মি*, কারণ তার অস্তিত্ব সেখানে লেগে আছে। যখন সে কামিনীকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন হয়ে যায় *অহং ব্রহ্মাস্মি*। যেমন ভগবান বুদ্ধ, যতক্ষণ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ছিলেন তখন *অহম্ অস্মি*; স্ত্রীকে ছেড়ে দিলেন, অহং ব্রহ্মাস্মি হয়ে গেলেন। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মা; নারীকে নিয়ে যখন আছেন তখন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিকার্য করেন, ঠিক তেমন মানুষও সৃষ্টির কাজে লেগে থাকে। কিন্তু যেদিন বলে দিল, আমার আর কোন কিছুই লাগবে না, সেদিন ব্রহ্মার 'আ'কারটা খসে গিয়ে ব্রহ্মের দিকে বেরিয়ে যায়। হয় ব্রহ্মা, প্রজাপতি; নয় ব্রহ্ম, অত্যন্ত সহজ জিনিস। যদি *অহম্ অস্মি* রূপে থাকতে চান, ব্রহ্মা রূপে থাকতে চান তাহলে কামিনী লাগবে। যদি ব্রহ্ম রূপে *অহং ব্রহ্মাস্মি* রূপে যদি থাকতে চান, কামিনীকে ছেড়ে দিতে হবে। যাঁরা সত্যিকারের উচ্চমানের সন্ন্যাসী, আমাদের ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কখন নারীর দিকে মন দিতেন না। আমরা ঠাকুরকে জানি, কখন মন দিতেন না। শ্রীশ্রীমা আছেন, দায়ীত্ব রূপে আছেন। মা ঠাকুরের দেখাশোনা করছেন, ঠাকুরের নির্ভরতা আছে মায়ের উপর। কিন্তু যেভাবে আমরা নারী মনে করি, ওই ভাবে ওনার আসক্তি ছিল না।

গৃহস্থদের নারীর প্রতি আসক্তি থাকবে। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ বা ব্রহ্মলীন যাঁরা, তাঁরা কখন সংসারে মন দেন না। সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁরা ওই দিকেও মন দিতে পারেন। এই যেমন আপনারা এতজন মিলে কথামৃত শুনছেন, আপনারা সংসারও দেখছেন আবার ঈশ্বরীয় কথাও শুনছেন। ব্রহ্মলীন পুরুষরা এ-রকম করবেন না, তাঁরা সব সময় ওই একটা দিকেই সর্বদা থাকেন।

ফলে কি হয়, এই যেমন ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরে ভক্তিও করে আবার সংসারে আসক্ত হয়। এই যে *অহম্ অস্মি*, এটা যে শেষ সত্য নয়; ব্রহ্মা রূপে নিজেকে যে দেখায়, এটা শেষ সত্য নয়। এটাতেই বোঝায় যে, গৃহস্থ জীবন যদি শেষ সত্য হত, তাহলে মানুষ কখনই ধর্মের দিকে যেত না। সংসারে থেকেও যে ধর্মের দিকে মন যাচ্ছে, তার মানেই ওটা একটা উঁচু অবস্থা, যেখানে পৌঁছাতে চাইছি কিন্তু পারছি না। পারছি না বলে কি করছি? যেখান থেকে ঝঁপ দিয়েছিলাম, সেখানেই আবার ফেরত আসছি। এতে দোষের কিছু নেই, কারণ বেশির ভাগ লোকেরা তো সেই ইচ্ছাটাও করে না। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়ার জন্য আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি, দেখতে পারছি; কিভাবে ধর্মের প্রতি আক্রোশ, কিভাবে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে যাচ্ছে। এরা না কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, না কোন সাধু মহাত্মার কাছে বসে ধর্মের ব্যাপারে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সবজান্তা হয়ে বসে আছে। ধর্মের প্রতি এদের কোন স্পৃহা নেই। হবে, পঞ্চাশ জন্ম কি একশ জন্ম অনেক কুকুর, বেড়াল, শূয়োর জন্ম হয়ে হয়ে একদিন মনুষ্য জন্ম হবে। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েই যে তারা মনুষ্যত্ব পেয়ে যাবে তা তো না। মনুষ্যত্ব পেতে হলে আবার তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তব্ধ)। এই জিনিস বাস্তবিক হয়। আমরা সন্ন্যাস জীবনে আছি বলে ছোট বাচ্চাদের যে নিত্যকর্ম হয়, আমাদের এটা ঠিক পছন্দ হয় না। কিন্তু তাদের মা-বার কাছে এটা কোন ব্যাপারই না, ওর মধ্যেই আছেন কিনা, এটা আক্ষরিক ভাবে সত্য।

নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর বসে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয়রসের দিকে যায় না। শুধু নিত্যসিদ্ধ না, যাঁরা ব্রহ্মলীন, যাঁরা ঋষি তাঁরা সবাই মৌমাছির মত, এনারা কক্ষণ বিষয়রসের দিকে যাবেন না। ঠাকুর বলছেন, মিছরির শরবৎ খেলে চিটেগুড়ের পানা আর ভাল লাগে না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের খুব ভাল চা খাওয়ার অভ্যাস। যাঁরা ভাল চা খান, ভাল চা খাওয়াটা ওনাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কখন-সখন যদি আমাদের মঠ মিশনে এসে ওনাদের যদি চা খেতে দেওয়া হয়, ভদ্রতার বশে খেয়ে নেবেন কিছু বলবেনও না। কিন্তু পরে আবার চা খাওয়ার জন্য বললে বলবেন, 'চা! থাক লাগবে না'। আমাদের এক মহারাজ আছেন, উনি বিদ্রুপ করে বলেন, 'বেলুড় মঠের চায়ের কি বৈশিষ্ট্য জানো? বেলুড় মঠের চা সাঙ্ঘাতিক জিনিস, একবার যদি বেলুড় মঠের চা খেয়ে নাও, যে কোন জায়গার চা খেতে ভাল লাগবে, এটাই বেলুড় মঠের চায়ের বৈশিষ্ট্য'। বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দিরে একবার বসার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বসতে ভাল লাগবে না। বেলুড় মঠের চা খেয়ে নিলে সব জায়গার চা ভাল লাগবে; কি বৈপরিত্য। অমৃতরস যাঁরা পান করেন, তাঁদের কাছে বিষয়রস চিটেগুড়ের পানা, কোন দিন খাবেন না। বলে, ঠিক ঠিক ভদ্রলোকের ছেলে যত অভুক্তই থাকুক, রাস্থায় পড়ে থাকা রুটি তুলে খাবে না। এগুলোতে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম মত, আমার এটাই মত।

সাধ্য সাধন করে যে ভক্তি, এদের সেই ভক্তি নয়। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য ঠাকুর এতক্ষণ এই কথাগুলো বলছিলেন। পাতাল ফোঁড়া শিবের কথা বলছেন, ঠোঁট বাঁকা পাখির কথা বলছেন। পাতাল ফোঁড়া শিব, পাতাল থেকে শিব উঠে এসেছেন। আমরা দেওঘর ছিলাম, দেওঘর অঞ্চলটা প্লেটো রিজিয়ন, সেইজন ওখানে প্রচুর ছোট ছোট পাথর হয়। দেওঘর বিদ্যাপীঠে প্রচুর বাগান আছে। যতগুলো হস্টেল আছে, প্রত্যেকটা বিল্ডিংএর সামনে বাগান আছে। স্কুল, অফিস, সাধুনিবাস সব বিল্ডিংএর সামনে বাগান, শুধু বাগান আর বাগান। আর এত রকমের ফুল যে নামও মনে রাখা যায় না। কপাল এমন যে, ওখানে যে মহারাজরা দেখাশোনা করেন, তাঁরা সবাই ফুল ভালবাসেন। আমরা ফুলের মধ্যেই বড় হয়েছি, বাগানও করতাম। বাগান করতে গিয়ে একটা বাগান থেকে সব পাথর ছুড়ে ছুড়ে সরিয়ে দিলাম; চারপাঁচ দিন পরে আবার খুরপি নিয়ে মাটি খুড়তে গিয়ে দেখছি আবার পাথর এসে যাচ্ছে। তখন বয়স কম ছিল বুঝতে পারতাম না যে, পাথর আসছে কোথা থেকে। সব পাথর সরিয়ে দেওয়ার পর আবার কোথা থেকে পাথর এসে গেল? পরে জানলাম, ওই পাথরগুলো নিজে থেকে বেরিয়ে আসে। মাটির যে স্বভাব, ওর মধ্যে ছোটখাটো মুভমেন্ট হতেই থাকে। আর মাটিগুলো আস্তে আস্তে নীচের দিকে যায়, আর বড় জিনিসগুলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসে। ঠিক ওই রকম, শিবলিঙ্গের মত যে পাথর, এভাবে উঠে চলে আসে। অলৌকিক কিছু না, কিন্তু এটা হয়।

আমরা যে ভক্তি করি, এই ভক্তি আমরা সাধ্য-সাধন করে করি; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ যাঁরা তাঁদের সে ভক্তি নয়। **এত জপ, এত ধ্যান করতে হবে, এইরূপ পূজা করতে হবে –এ-সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি**। আমাদের ভক্তি বিধিবাদীয়, গুরু আমাদের বলে দিয়েছেন এভাবে আসনে বসবে, দিনে এত জপ করবে। **যেমন ধান হলে মাঠ পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে**।

রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এতে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না। ঈশ্বরকে যখন আমরা ভালবাসি, তখন ঈশ্বর হলেন কর্তা, বিধাতা, ঈশ্বর উপর থেকে আমাদের দেখছেন, তিনি মালিক; সেই রূপেই আমরা যোগ করে থাকি, না বুঝেই করেই থাকি। কিন্তু নিত্যসিদ্ধের যে ভালবাসা, এই ভালবাসা আত্মীয়ের ভালবাসা।

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ছিলেন। তখন আমরা শুনতাম রাজীব গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী ওনার ছেলে, ওনাদের বয়সও তখন কম ছিল। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে

ভাবতাম, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী, বিরাট ক্ষমতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইন্দিরা গান্ধীর বিরাট জয় হয়েছে, আচ্ছা ওনার ছেলেরা কি ওনাকে 'মা' বলেই ডাকেন? প্রায়ই আমার মাথায় এই প্রশ্নটা আসত। আবার ভাবতাম, আমাদের মায়েরা আমাদের যেভাবে সামলান, ইন্দিরা গান্ধীও কি তাঁর দুটো ছেলেকে ঠিক ওই ভাবে সামলান? এই হল তফাৎ। নিজের নাতির কাছে এনারা যাঁরাই ছিলেন, এনারা দিদিমা, দাদু, ঠাকুরদা; অপরের কাছে তিনি প্রধানমন্ত্রী। সিংহের কাছে তারা বাচ্চা সিংহ শাবক, অপরের কাছে জঙ্গলের রাজা; যাকে দেখে জঙ্গলের সব পশুরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। নরেন-রাখালের যে ভগবান, এনারা হলেন তাঁর আত্মীয়; সিংহ আর সিংহ শাবক। মুখে আমরা বলতে পারি, আমার মা আছেন, মা আমাদের –এটা হয় না। কেন হয় না? বলছেন, রাগভক্তি প্রেমাভক্তি এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না।

মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন, কৃষ্ণপ্রেমে দিওয়ানি। মথুরায় এসেছেন গোবিনজীকে দেখবেন বলে। পূজারী আটকে দিলেন –এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। মীরাবাঈ বলছেন, আমি এতদিন জানতাম মথুরায় একজনই পুরুষ তিনি কৃষ্ণ। পূজারী বুঝতে পেরেছেন, মীরাবাঈকে ছেড়ে দিলেন। এনাদের জন্য কোন বিধিনিষেধ চলে না। শিবের উপর গান আপনারা শুনে থাকবেন, তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা; খুব সুন্দর গান। মনে মনে চব্বিশ ঘন্টা ঠাকুরকে নিয়ে যদি এভাবে আপনার নৃত্য হতে থাকে, তবে বুঝবেন এই ভক্তি আপনার মধ্যে এসেছে।

জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীকে খুব ভালবাসতেন। স্বামীজীকে সব সময় বলতেন my friend। মাঝে মাঝে মঠে আসতেন, মঠে থাকতেন, মঠের কাজে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন। একবার এসে বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে আছেন। একজন সন্ন্যাসী ওনাকে ডাকতে গেছেন। জানলা দিয়ে দেখছেন ঘরে একটা চেয়ারে স্বামীজীর ছবি বসানো, দরজা বন্ধ আর ওই ছবির সামনে উনি একা একা নৃত্য করে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ পর জানলার দিকে দৃষ্টি পড়ল, বুঝলেন মঠ থেকে ওনাকে ডাকতে এসেছে। উনি একটা হাসি দিয়ে বলছেন, who cares for the nigger; আমেরিকানদের একটা গালাগাল, কালো চামড়ার লোকেদের উদ্দেশ্যে গালাগাল। খুব ভালবেসে বলছেন, who cares for the nigger। কতটা আপন হলে ছবির সামনে একা একা নৃত্য করতে পারছেন!

এই রাগাত্মিকা ভক্তি কেমন, যেখানে বিধিনিষেধ সব কিছু উড়ে যায়, বোঝানর জন্য ঠাকুর গ্রামদেশের উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। **বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হল**।

এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না। এইটাকে বলবার জন্য ঠাকুর এতক্ষণ এত কথা বলে গেলেন। নরেন থেকে শুরু করে, বিধিবাদীয় ভক্তির কথা বলে, আরও অনেক কিছু বলে বলে আসল জায়গায় এনে ফেলছেন। আসল যে জায়গাটার কথা বলছেন, তা হল, নরেন্দ্র, রাখাল-টাখালের যে ভক্তি এই ভক্তি যদি আপনার না হয়, এই অনুরাগ ভালবাসা যদি না হয়, ঈশ্বরলাভ হবে না। কথামৃতে অনেক জায়গায় আছে, সংসারে থেকে কি হবে না? অবশ্যই হবে, তবে নরেন আদির যে ভক্তির বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ ওই অনুরাগ, ওই রাগ, ওই ভক্তি, ওই ভালবাসা সংসারে থেকে ঈশ্বরকে পেতে গেলে আনতে হবে। এখানে ঠাকুর এই আসল কথাটা বলছেন –এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

এর আগে বলছিলাম, দুজন ইয়ং ছেলে এসে জিজ্ঞেস করছিল, সাধনা করে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারি কিনা। হতে পারেন, কিন্তু আমাদের একটা মিটিং পয়েন্ট আছে। সেই মিটিং পয়েন্ট হল এই ভালবাসাটা। তফাৎ হল আপনি চেষ্টা করে, অনেক সাধ্য সাধনা করে অতটা উপরে গেছেন আর ওনারা নিজের মনকে অনেক চেষ্টা করে নামিয়ে নামিয়ে ওখানে থাকেন –এই হল মিটিং পয়েন্ট। যে জায়গাতে আমরা কোন জীবনে অনেক চেষ্টা করে করে, অনেক সাধ্য-সাধনা করে পৌঁছাতে পারি, সেখানে ওনারা অনায়াসে থাকেন না, সেখানে তাঁদের অনেক চেষ্টা করে মনটাকে কষ্ট করে টেনে

নামিয়ে এনে অবস্থান করতে হয়। ঠাকুরকে তাই নরেনকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে টেনে নামিয়ে আনতে হয়েছিল। স্বামীজী আমাদের জীবনের আদর্শ কেন? আদর্শ এই জন্য, ঠিক আছে আপনার যেটা মিনিমাম, আমার জন্য সেটা ম্যাক্সিমাম; কিন্তু আপনাকে না দেখলে আমি বুঝতে পারব না, আমাকে কোথায় পৌঁছাতে হবে। মুখে এমনি সবাইকে বলে দেওয়া যায়, এটা বিধিবাদীয় ভক্তি, রাগানুরাগ ভক্তি এই রকম, রাধার ভক্তি এই রকম, যেখানে বিধিনিষেধ থাকবে না, এগুলো ঠিক আছে। আপনিও শুনে নিলেন, পরের দিন থেকে সাধ্য সাধনা করতে শুরু করলেন। এখানে কিন্তু তা না, আপনাকে এটাই বলতে হবে; স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আমি দেখেছি, স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝেছি, স্বামী বিবেকানন্দের কিছু ধারণা তো আমার হয়েছে, যার ফলে এটা তো বুঝতে পারছি যে ওনারা কোন স্তরের ছিলেন। সেই অবস্থা থেকে ওনারা নিজেকে টেনে নামিয়ে এই জগতে যখন ছিলেন তখন এই জায়গাতে ছিলেন, ওই জায়গাতে গেলে তবে আমার ঈশ্বর লাভ হবে।

সকাল বিকাল নমো নমো করে একশ আট জপ করছি আর মনে করছি এতেই ঈশ্বরলাভ হয়ে যাবে। কক্ষণ কোন গুরু বলে দেননি যে এতেই হবে। ওটা এইজন্য বলা, অতটুকুও না করলে মন্ত্রটাই ভুলে যাবে। ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন কিভাবে ঈশ্বরলাভ হবে দেখানোর জন্য, দেখ এটা করা যায়। যাঁরা নিত্যসিদ্ধ ওনারাও হয়ত কোন জন্মে আমাদের মতই ছিলেন; যদিও এটা আন্দাজে বলছি, কারণ এগুলো জানার আমাদের কোন পথ নেই; সাধ্যসাধন করে করে উপরের দিকে উঠতে উঠতে এমন জায়গায় চলে গেছেন যেখানে তাঁকে ওখান থেকে নেমে এসে এই জায়গাতে দাঁড়াতে হয়। কেন তাঁদের ওই অবস্থা থেকে এভাবে নেমে আসতে হচ্ছে? লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য। এনারা তো এ-কথা কখনই বলবেন না যে, তোমার দ্বারা হবে না। বরং বলবেন, অবশ্যই হবে, কেন হবে না। আপনার ভিতরে সেই আত্মা, যে আত্মার প্রকাশ এই জগৎ; তাই কেন হবে না, অবশ্যই হবে। কিন্তু এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না।

ঈশ্বরলাভ কিভাবে হবে? এভাবে হবে। যেখানে এমন ভক্তি যে তাঁকে দেখার জন্য মন আটুপাটু করবে। সেখানে এমন ভালবাসা যেন আত্মীয়ের ভালবাসা। আপনি যেমন আপনার সন্তানকে ভালবাসছেন, বা জীবনে কাউকে যদি ভালবেসে থাকেন, তার সঙ্গে থাকার জন্য মন যেমন ছটফট করে, তাকে দেখার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য মন যেমন ছটফট করে, ঈশ্বরের জন্য তেমনই যদি মন ছটফট করে তবে গিয়ে ঈশ্বরলাভ হয়। সংসারে মানুষ কি ভালবাসে বলুন, সেই বাবা, মা, সেই ভাই-বোন, সেই স্বামী-স্ত্রী, সেই সন্তানাদি। নরেন এই সব কিছু ছেড়ে ঠাকুরের কাছে এসে বসে আছেন। আমাদের এখানে প্রচুর সন্ন্যাসী আছেন, দেশ-বিদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করার পর সব কিছু ছেড়ে আনন্দের সাথে এখানে চলে এসেছেন। নিশ্চয় এমন একটা কোন ভালবাসার আস্বাদ পাচ্ছেন, যেখান অন্য কোন কিছুই দাঁড়াতে পারে না।

অমৃত –মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

আপনাদের মধ্যে যাঁরা কথামৃত নিয়মিত পড়েন, বিশেষ করে যাঁরা স্টাডি করেছেন, আপনাদের বলতে পারি, আপনারা এটাকে নিয়ে রীতিমত রিসার্চ করতে পারেন –ঠাকুর সমাধিকে নিয়ে কত রকম বর্ণনা দিয়েছেন, দেখবেন খুব সুন্দর একটা কাজ হয়ে যাবে। এখানে বলছেন ঈশ্বরদর্শন কিরূপ, ঈশ্বরদর্শন আর সমাধি একই জিনিস। ঠাকুরের কাছে একজন থিয়েটারওয়ালা জানতে চেয়েছেন ঈশ্বরদর্শন কিরূপ। ঠাকুর থিয়েটারওয়ালাকে ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে বলছেন –থিয়েটারের পর্দা উঠলে সবার দৃষ্টি যেমন একবারে মঞ্চে থিয়েটারে চলে যায়। এখানে যে অমৃত আছেন, উনি থিয়েটারওয়ালা নন। তাই অমৃতের জন্য ঠাকুর অন্য উদাহরণ আনছেন। এই হলেন একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়। যে খেলাতে ওস্তাদ সে দান যখন ফেলবে এক বললে এক পড়বে, ছয় বললে ছয় পড়বে। একজন এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে সমাধি কেমন; ঠাকুর তাকে তার মতন উত্তর দিচ্ছেন। আরেকজন এসে জিজ্ঞেস করছে,

সমাধি কি রকম, তাকেও আবার তার মতন উত্তর দিচ্ছেন। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমি প্রথমেই বলে দেব, আপনি বুঝতে পারবেন না; কারণ আমি নিজেই জানি না। যখনই কেউ বলে, তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝে নেবেন সে নিজেও বোঝে না। যিনি বুঝেছেন, যিনি জানেন, তিনি একটা বাচ্চা ছেলেকেও বুঝিয়ে দেবেন। যিনি বিষয়টাকে জানেন, ঠাকুর বিষয়টাকে জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –শুনেছ, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়; কিরকম জানো? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

ঠাকুর দুটো উদাহরণ নিচ্ছেন। কুমুরে পোকা আর আরশোলার বায়োলজিটা পুরো আলাদা, আমরা আগে এর উপর একবার আলোচনা করেছিলাম। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমার কাছে একটা ছোট কৌটা আছে, ওর মধ্যে চাল রাখি। সকালবেলা পাখিদের একটু দিই। সেটাও আগে দিতাম না, দু-তিন বছর হল হঠাৎ দিতে শুরু করেছি। আমাদের ছেলেরা যারা কাজ করে, ওদের দিয়ে দু-কিলো চাল কিনে কৌটর মধ্যে রেখে দিই। একদিন দেখছি চালের মধ্যে এক ধরণের পোকা হয়েছে। দু-দিন আগে কৌটটা খুলে দেখি ওই সাদা পোকার ডানা আছে, ওখান থেকে দুটো তিনটে বেরিয়ে উড়তে শুরু করল। প্রথমে ভাবলাম, এই পোকা কোথা থেকে এলো? কারণ কৌটার মুখটা এক দু-মিনিটের জন্য খুলি, বাকি সময় বন্ধ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা চিন্তা এলো, ও এই ব্যাপার! কোন পোকা ডিম দিয়ে দিয়েছে, ওর মধ্যে থেকে থেকে ডিম ফুটে পোকা বেরিয়েছে, ওই ছোট পোকা যার ডানা আছে। এখন রোজই কৌটার মুখ খুললেই দুটো তিনটে পোকা বেরিয়ে যাচ্ছে। যার যেমন জন্ম হচ্ছে, খুলে চাল নিতে গেলেই উড়ে বেরিয়ে যায়।

কুমুরে পোকা আর আরশোলাতে ঠিক তাই হয়। কুমুরে পোকা আরশোলাকে গিয়ে ধরে, ধরে ওর উপর বিষ ঢেলে দেয়। আর এতটাই বিষ ঢালে যাতে আরশোলা অচেতন হয়ে যায়, মরে যায় না। তারপর ওটাকে টেনে এনে নিজের বাসার মধ্যে বন্ধ করে দেয় আর ওর মধ্যে ডিম পেড়ে দেয়, তারপর বাসার মুখটা বন্ধ করে দেয়। ডিম ফুটে যে লার্ভাগুলো জন্ম নেয়, তারা তখন নড়তে-চড়তে পারে না। ওই যে আরশোল এখনও মরেনি, ওটাকে খেয়ে খেয়ে প্রাণ রক্ষা করে। তারপর সেই লার্ভা থেকে কুমুরেপোকা জন্ম নেয়। যখন বাসা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সবাই দেখে যে আরশোলাকে ঢুকিয়ে ছিল সেটাই এখন কুমুরেপোকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আরশোলা তো আর নেই, ওকে খেয়ে নিয়েছে। তখন মনে হয় আরশোলাটাই কুমুরেপোকা হয়ে গেছে, আসলে জিনিসটা তা না। কিন্তু এটা উদাহরণের জন্য বলা হয়, ভাগবতেও এই উদাহরণ আনা হয়েছে।

কিন্তু যেটা আসল –যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে যা হয়, space, freedom – এটাই মূল কথা। বাচ্চা বয়সে বাচ্চা মায়ের কাছে থাকলে নিজের সেই স্পেস পায়, মা না থাকলে মনে করে হারিয়ে গেলাম, কাঁদতে শুরু করে। আরও একটু বড় হলে বন্ধুদের মধ্যে সে স্পেস পায়। আরও একটু বড় হলে মেয়ে মহিলা বন্ধুদের মধ্যে স্পেস পায়। সেখান থেকে যখন গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করে, তখন নিজের স্ত্রী, সন্তান হয়ে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে স্পেস খুঁজে পায়। সে সব কিছু করবে, অফিসে গিয়ে কাজ করছে, বিজনেস করছে, লোকাল ট্রেন ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে, সবই করছে। কিন্তু মাথায় থাকে যখন বাড়িতে ফিরে আসব তখন আমার স্ত্রীকে দেখব, সন্তানদের দেখব, আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া মানে আমি আমার স্পেসটা পেলাম।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, সেখানে একজন এসে বলছে, 'যাই আমি নাতির চাঁদমুখটা একবার দেখে আসি'। ঠাকুর রেগে গিয়ে বলছেন, চাঁদমুখ না পোড়ামুখ দেখবে। কিন্তু যাদের এগুলো কোনটাই চলে না, আপনারা যাঁরা আরবিয়ান নাইটসের সিন্ধবাদের গল্পগুলো পড়েছেন, তারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, সিন্ধবাদের কাহিনী যখন শুরু হয় তখন প্রত্যেক কাহিনীতে প্রথমেই সিন্ধবাদ বলে, বাসরাতে

ভাল ভাবেই ছিলাম। আবার তার মনে হল, না, বেরিয়ে পড়ি। কারণ সেটাই তার ফ্রিডম, সে স্পেস পাচ্ছে যখন জাহাজী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে যখন ভ্রমণ করছে তখন মনে করছে, আমি ফ্রি, আমি ফ্রি। হিমালয়ে গেলাম, আই এ্যম্ ফ্রি । কার্ভিং স্কাই যদি পড়ে থাকেন, পুরো এই জিনিসটাকে নিয়ে পুরো বইতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে মুক্তি, শক্তি, স্পেস সব জড়িয়ে আছে। আমরা কেবলই বলি, আমি শান্তি পেতে চাই। কিন্তু শান্তি আমরা পাই না, শান্তি মানেই হল স্পেস। আপনার জীবনে শান্তি নেই কেন? একটা বিরাট আকারের জন্তু, তাকে একটা ছোট্ট ঘরে বন্দি করে দেওয়া হয়েছে। রেলের স্লিপার ক্লাশে যাওয়ার সময় আমাদের অতটুকু সরু জায়গাতে ঘুমোতে হবে, একটু পাশ ফিরতে গেলেই মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলাম, শান্তিতে ঘুমোন যায় না। এইভাবে কি কখন ঘুম হয়, যেখানে সব সময় মনে হচ্ছে এই পড়ে যাব? একটা বড় জন্তুকে ছোট্ট একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়েছেন, বেচারী একবার এদিকে ঘুরতে গেলে ধাক্কা লাগে, আবার অন্য দিকে ঘুরতে গেলে ধাক্কা লাগে। কি করে থাকবে সে ওই ছোট্ট বদ্ধ ঘরে?

আমি, আপনি কি অতই সহজ জিনিস? কোন মতেই না। আমরা হলাম সেই বিশাল আকারের জন্তু। সেই জন্তু যারা, এই বিভিন্ন যে রিলেশানস্, এই রিলেশানসগুলিএর মধ্যে আর চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা বদ্ধ হয়ে ঘুরঘুর করছি। ফলে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যায়। যেমনি হাত-পা এগুলো একটু ছড়াতে চাইছি, একবার এখানে ধাক্কা লাগছে, আর-একবার ওখানে ধাক্কা লাগছে। বড়রা যদি একবার পিছনের দিকে তাকান, বাচ্চা বয়সে যাদের নিয়ে আনন্দ করতেন, তখন মনে হত একে ছাড়া আমি জীবন চালাতে পারব না; যদি এখন তাদের কারুর সাথে দেখা হয়ে যায়, আতঙ্ক লাগবে –এ কে নিয়ে ছোটবেলা আমি মেতে ছিলাম? দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের এক বাল্যবন্ধু এসেছে। সে শুনেছে দক্ষিণেশ্বরে তার ছেলেবেলার বন্ধু থাকে, সে এখন খুব নামকরা একজন মহাত্মা। সেই লোকটির পালিত ছেলে মারা গেছে, ঠাকুরকে বলছে –আমি বললাম আমার স্ত্রীকে, খেপী তুই মন খারাপ করিস না। ঠাকুর শুনেই রেগে গেছেন। বলে কিনা খেপী, একেবারে ডাইলুট হয়ে গেছে। তখন অবাক লাগবে, আরে আমি এই লোকটার সঙ্গে ছিলাম, এত সাধারণ একটা লোক! যাদের কে নিয়ে আমি বাসা বেঁধেছি, যাদের সঙ্গে বসে আছি; পরে মনে হয়, আমি কাদের সঙ্গে ছিলাম!

মহাভারতে মৎস্যাবতারের বর্ণনা আছে, মাছ দিনে দিনে বড় হয়ে যাচ্ছে। হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিয়েছে। আপনার আমার যে মন, যেটা শরীরের সঙ্গে যুক্ত, আপনজনদের সাথে যুক্ত, সমাধি অবস্থায় সেটা এখন মুক্ত হয়ে গেল। এরপর যত দূরেই যান, এই চার দেওয়ালের ধাক্কা আর লাগবে না, এটাই হল আনন্দ, এটাই হল স্পেস। জীবনে স্পেস না থাকলে মানুষ খুশি থাকতে পারে না। স্পেস কেউ দেয় না, নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়। আপনার আমার জীবনের উদ্দেশ্য, আমরা হাঁড়ির মাছ, আমাকে গঙ্গায় যেতে হবে, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য।

অমৃত –একটুও কি অহং থাকে না? জানতে চাইছেন সমাধি অবস্থায় অহং থাকে কিনা। ঠাকুর যেটা বলছেন, আগে আগেও তাই বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘষ না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন আর তার একটি ফিনকি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন –বিলাসের জন্য।

এই যে বলছেন, তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন। এই 'তিনি' হলেন সেই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ নিজের মায়াকে আশ্রয় করে অবতার হয়ে এসেছেন। সেই অবতার এখন সেই সচ্চিদানন্দের আস্বাদ করছেন। কিন্তু বলছেন, তিনি অহংটি রেখে দেন। দুটো কারণে, যখন আপনি একবার মনের জগতে এসে গেছেন, ভগবানও তখন এভাবেই ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়, একবার আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে এই দুটি চরিত্র –ভক্ত আর ভগবান খেলা করেন। কখন তিনি

ভগবান, কখন তিনি ভক্ত। কারণ, যে মায়াকে তিনি নিজে আশ্রয় করেছেন এই জগতে থাকার জন্য, সেটা হল ভক্তের মায়া। ভক্তের মায়া বলে ওনার সমস্ত ব্যবহার ভক্তের মত। শ্রীরামচন্দ্র যখন এই মায়াকে আশ্রয় করলেন, তখন তিনি একজন ক্ষত্রিয় রাজা। ওনার ব্যবহারেও তাই সব সময় ক্ষত্রিয় ভাব, রাজার ভাব আসে। যে ভাবটাকে আশ্রয় করে থাকেন, সেই ভাবের প্রতি তাঁরা একনিষ্ঠ থাকেন। তখনও কিন্তু তিনি বলবেন না যে এটা আমি করেছি, বলবেন, তিনি করেছেন।

আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। এগুলো খুব উচ্চমানের কথা। আমরা এগুলো মুখে বলে বেড়াই ঠিকই। বাচ্চার হাতে যদি একটা রঙিন পেনসিল দিয়ে দেওয়া হয়, বাচ্চাও যেখানে সেখানে আঁকিবুঁকি কাটতে শুরু করে দেয়। সাধারণ ভক্তরাও এই কথাগুলিকে নিয়ে যেখানে সেখানে আঁকিবুঁকি কাটতে শুরু করে দেন। **কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড়সমাধি' – নির্বিকল্পসমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর**!

ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় বর্ণনা করছেন, কিভাবে তাঁর আমিত্ব যখন হারিয়ে গেল তখন কে যেন খপ্ করে ধরে নিলেন। লবণটা যখন গলে যেতে শুরু করেছে, তখন তাকে পাথর বানিয়ে দিলেন, যাতে পুরোটা গলে না যায়; ঠাকুর যাতে ফেরত এসে ওপারের খবর দিতে পারেন।

মূল এই কয়টা জিনিস, যেটা এখানে আলোচনা করা হল। ভক্তির যে বিভিন্ন অবস্থা, ভক্তির যে শেষ অবস্থা যেখানে আপনাকে আমাকে সবাইকে যেতে হবে, নরেন-রাখালের সেই অবস্থা। আর সেই অবস্থা যেখানে হাঁড়ির ছোট মাছকে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই অবস্থা যেখানে নুনের পুতুল সমুদ্রে গিয়ে এক হয়ে গেল। এটাই জীবনের উদ্দেশ্য, এটাই ভক্তি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বাড়িতে এসেছেন, শনিবার অমবস্যা, ৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩ (পৃঃ ১৫৯)। আজ বলরামের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে অনেক ভক্ত আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাস্টার এনারা ঘরে ঠাকুরের সঙ্গে বসে আছেন। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটি, তার কাছেই এখন বলরাম মন্দির হয়েছে। উত্তর কলকাতার বাগবাজার থেকে বর্তমান স্বামীজীর বাড়ি, কলেজ স্ট্রীট; কলকাতা বলতে এই পুরো অঞ্চলটাকেই বোঝায়, কলকাতার যে ঠিক ঠিক সংস্কৃতি এই অঞ্চলটাই এর ধারক ও বাহক। দক্ষিণ কলকাতাকে বলে উঠতি বড়লোক। বাগবাজারে বলরাম বসুর পৈতৃক ভিটা, ঠাকুরে এখানেই যেতেন। বলরামের বাড়িকে ঠাকুর নিজের বাড়ি বলে মনে করতেন। তাই না, বলতেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন। কত বড় সম্মান।

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –**ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ি আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন –এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে**।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা আমরা অনেকবার বলেছি। আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে – ব্রহ্মযজ্ঞ, মানে ধ্যানজপ; দেবযজ্ঞ, দেবতাদের পূজো করা। গৃহদেবতা, কুলদেবতা বা নিজের লোকালয়ে যে মন্দির আছে সেখানে গিয়ে পূজা করা; সব দেবযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ, পিতৃদের নামে তর্পণ করা, তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু আহার উৎসর্গ করা, পরে সেই খাবার পাখিদের খাইয়ে দেওয়া হয়। মনুষ্যযজ্ঞ, অতিথিদের সেবা করা, কাঙালীসেবা। আর ভূতযজ্ঞ, পশুপাখিদের খাওয়ানো। এখানে যে ঠাকুর বলছেন,

এদের খাওয়ালে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে, এটা সরাসরি পঞ্চ যজ্ঞের কোথাও পড়ে না। ঠাকুর যে বলছেন, এদের খাইও, তার মানে এর বিশেষ অর্থ আছে, সাধারণ অর্থে বলছেন না।

সাধারণ ভাবে ধর্ম বলতে আমরা মনে করি চ্যারিটি রূপে সমাজসেবা; গরীব, কাঙালীদের খাওয়ানো। বিশেষ করে খ্রীশ্চানিটিতে ওরা এই চ্যারিটি জিনিসটাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে। চ্যারিটি হল দান করা –আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ, তুমি গরীব কাঙালী, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। ইসলামে উপার্জনের আড়াই শতাংশ আলাদা করে রেখে দেয় গরীবদের জন্য। আধ্যাত্মিক পুরুষকে ডেকে আহার করানো, এই জিনিসটা দুটো বড় ধর্মে নেই। ইসলামে তো এই জিনিসটাই নেই; যে অর্থে আমরা concept of spirituality বলি, ওদের এটা নেই। খ্রীশ্চানিটিতে যাঁরা ডেজার্ড ফাদারসরা ছিলেন, যখন ওনাদের ডাকা হয়, তখন একটা সোস্যাল গ্যাদারিং হয়। আমরা যে অর্থে সাধুসেবা, যে অর্থে বৈষ্ণবসেবা বলি, সেই অর্থে বড় দুটো ধর্মে হয় না, এই ধারণাটাই নেই। বৌদ্ধ ধর্মে জৈন ধর্মে ও শিখ ধর্মে আছে। সাধুসেবা, বৈষ্ণবসেবা হল পুরোপুরি ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অঙ্গ।

সাধুসেবাকে ভূতযজ্ঞ বলা যাবে না, এনারা পশুপাখি নন। মনুষ্যযজ্ঞও বলা যাবে না, কারণ মনুষ্যযজ্ঞ হল কোন অতিথিকে খাওয়ানো, কোন গরীব-কাঙালীকে খাওয়ানো। সাধুসেবা পিতৃযজ্ঞ কখনই হতে পারে না, কারণ পিতৃযজ্ঞ হল পূর্বপুরুষদের যাঁরা গত হয়ে গেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে পিতৃযজ্ঞ করা হয়। সাধু সন্ন্যাসীদের খাওয়ানো ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ এই দুটোর মধ্যে পড়ে। যাঁদের মধ্যে আচার-আচরণ পালন করার প্রবণতা অনেক বেশি, ওনাদের জন্য সাধুসেবা হল দেবযজ্ঞ। যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব এসে গেছে, ঈশ্বরের প্রতি যাঁদের অনুরাগ বেড়ে গেছে, ওনাদের জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা হল ব্রহ্মযজ্ঞ।

বয়স্করা যাঁরা আগেকার হিন্দু ধর্মকে দেখেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হত, কুমারী ভোজন করান হত। কুমারী ভোজন ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধে সব জায়গায় আছে, কয়েকজন কুমারী মেয়েকে এনে খাওয়ানো হয়। খাওয়ানোর পরে কুমারীকে কিন্তু দক্ষিণা দিতে হয়। সব জায়গায় দেওয়া হয়, দক্ষিণা দেবেই দেবে। কেন দক্ষিণা দেয়? কারণ ওটা একটা যজ্ঞ। যজ্ঞে যেমন পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি এখানে এই যে দেবতাদের অর্পণ করছেন সাথে দক্ষিণা অবশ্যই দেবেন। সাধু-সন্ন্যাসী পুরো আলাদা জিনিস, সাধুরা কোন কাঙালী ভিখারি না। সাধু বেশে কেউ এলে মনে করা যে একজন অতিথি এসে গেছেন, কিছু দিলেন, তা না। বিশেষ দিনে সাধুদের বসিয়ে খাওয়ানো, এটা ব্রহ্মযজ্ঞের মধ্যে পড়ে, আর খুব নিচে নামলে দেবযজ্ঞের মধ্যে পড়ে।

আমি যে মহারাজের কাছে শিক্ষা পেয়েছি, উনি আমাকে বারবার বলতেন, সাধুসেবা থেকে বড় পূণ্য এই সংসারে আর কোন কিছুতে হয় না। আমি এটাকে আমার জীবনের আদর্শ করে নিয়েছি। যখনই পারি, ছোট হোক, বড় হোক, সাধুসেবা করে যাই। আমার যতগুলো বই বেরিয়েছে, যে মহারাজ তার যত কপি চান আমি দিয়ে যাই। গৃহস্থরা যেভাবে পূণ্য অর্জন করেন, সেভাবে পূণ্য অর্জন করাতে আমি নেই। কিন্তু আমার যিনি আচার্য তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, সাধুসেবা থেকে বড় পূণ্য এই সংসারে হয় না, আমি ওটাকে আমার ধর্মজীবনের অঙ্গ করে নিয়েছি। ধর্ম জীবন-যাপন যেমন স্নান করার পর রোজ গঙ্গাজল ছিটাই, স্নানের পর রোজ জগন্নাথ মহাপ্রভুর আটকে প্রসাদ মুখে দিই, কবে থেকে দিচ্ছি মনে নেই; ঠিক তেমনি সাধুসেবার সুযোগ পেলে অবশ্যই করি। এটা হল ব্রহ্মযজ্ঞ। কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে আপনি যখন কোন কিছু অর্পণ করছেন, তখন দেখতে হবে আপনি কিভাবে দিচ্ছেন এবং কি উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ক মুনির কথা আসে, রাজা সেখানে নিজের মেয়েকে রৈক্ক মুনিকে অর্পণ করে দিচ্ছেন। বিয়ের জন্য না, বলছেন, আপনার দাসী হয়ে থাকবে। তার মানে রাজা রৈক্ক মুনির কাছে ধর্মকথা শুনতে চাইছেন; ধর্মকথা শোনা মানেই ব্রহ্মযজ্ঞ।

বলরামবাবু একজন ধর্মপ্রাণ লোক, সাধুসেবা করেন, বৈষ্ণবসেবা করে, তিনি নিজেও একজন বৈষ্ণব। নরেন, রাখাল এখনও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সেই পর্যায়ে পৌঁছাননি। ঠাকুর তখনই বলছেন –এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে। নরেন, রাখাল, এনাদের এক একজনকে খাওয়ানো আর হাজার জন সাধুদের খাওয়ানোর যে পূণ্য, সেই একই পূণ্য পাবেন। আমাদের ক্লাশগুলো ইউটিউবে হওয়ার জন্য অনেকেই বলেন, এতদিন কথামৃত পড়তাম, পড়ে যেতাম, ভাল লাগত; এখন পুরো অন্য রকম লাগছে। সত্যিই অন্য রকম, এমনি কোন কথা না। ঠাকুর তাঁর নিজের শিষ্যদের একটু বড় করবার জন্য এগিয়ে দিচ্ছেন, তা না। এনারা হলেন বিশুদ্ধ আধার, এই বিশুদ্ধ আধারকে আপনি যখন সেবা করছেন, এই সেবা তখন ব্রহ্মযজ্ঞের সমান। দিনের পর দিন আপনি যে জপধ্যান করছেন, একজন সাধুকে ব্রহ্মযজ্ঞ রূপে সেবা করলেন, এই সেবা কয়েক বছরের জপধ্যানের সমান হয়ে গেল। একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না, একেবারে সত্য কথা বলা হচ্ছে।

অনেক আগে কানপুরে আমাকে একটা ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তখন আমি ভাষণ দিতাম না। এখনও আমি ভাষণ দিই না, ক্লাশ নিই। সেখানে অধ্যক্ষ মহারাজ আমাকে নিয়ে একজনের বাড়ি যাবেন। তাদের সাথে মহারাজের আবার রাগারাগি হয়েছিল। সেখানে মহিলা মহারাজকে বলছেন, 'কি মহারাজ চা খাবেন তো'? এমন ভাবে বলল যে, আমি তাড়াতাড়ি মহারাজকে বললাম, মহারাজ ছেড়ে দিন, চা খাওয়ার দরকার নেই। তারপর চা দিয়েছে, তাও একটা ফাটা কাপে। অথচ র‍্যাকে দেখা যাচ্ছে দামী দামী কাপ-ডিশে ভর্তি। তখনও আমি ভাবছি, একেই এনাদের এত অহঙ্কার যে, আশ্রমের সাথে মনোমালিন্য করেছেন, তার উপর আমি বাইরে থেকে বক্তা হয়ে এসেছি, সেখানে এভাবে ব্যবহার করছে, এরা কোন নরকে গিয়ে পড়বে ভাবলেই আতঙ্ক লাগে।

আমাদের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে স্বামী ভাবঘনানন্দ মহারাজ আমাদের আচার্য ছিলেন, আমরা খুব সম্মান করতাম। উনি বিকালবেলা হাঁটতে যেতেন, একদিন রাস্থায় চ্যাংড়া কয়েকটা ছেলে মহারাজকে দেখে বলছে, 'দেখছিস, ওই ভণ্ড সাধুটা যাচ্ছে'। এই ধরণের কথা আমাদের প্রচুর শুনতে হয়। মহারাজের কথা বলার মধ্যে একটা আলাদা ভঙ্গিমা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উনি রাস্থা থেকে নেমে এসে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন, 'দাদা, আপনিই আমাকে ঠিক চিনেছেন, একেবারে ঠিক চিনেছেন। আর আপনি আমাকেও চিনিয়ে দিলেন, আপনার কথা শুনে ঠিক মনে হচ্ছে, আমি একটা ভণ্ড সাধু, সত্যিই তাই। আমার তো এখনও ঈশ্বর দর্শন হল না'। চ্যাংড়াগুলো এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। মূল কথা হল, সাধুসেবা যখনই করবেন, ওটাই ব্রহ্মযজ্ঞ। এনারা আপনার বন্ধু না, এনারা আপনার অতিথিও না। এনাদের সেবা করাটা তাই মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের মধ্যে পড়ে না। হয় দেবযজ্ঞ, ফর্মাল পূজা; নাহলে ব্রহ্মযজ্ঞ। ঠাকুর এটাই বলরামবাবুকে এখানে বলছেন। এর আগে ঠাকুর বলেছিলেন, অভিনয়েও পাপপুরুষ সাজা ভাল না। ওটার উপর আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছিলাম।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) –কেশব (সেন) সাধু সেজে শান্তিজল ছড়াতে লাগল। আমার কিন্তু ভাল লাগল না। অভিনয় করে শান্তি জল!

আর-একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ওরকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না –পাপের অভিনয় করাও ভাল না।

এই যে বলছেন, নিজে পাপ করাও ভাল না –পাপের অভিনয় করাও ভাল না; এটা খুব ইন্টারেস্টিং বাক্য। ঠাকুর আগে বললেন, সাধু সেজে শান্তিজল ছড়াতে লাগল, আমার কিন্তু ভাল লাগল না। তার এক লাইন পরে বলছেন, পাপ পুরুষ সাজাও ভাল না, পাপ করাও ভাল না। তাহলে সাধু

যখন সেজেছেন, তখন সাধুর মত ব্যবহার করেন, তাতে কি দোষ হয়েছে? ঠাকুর এক জায়গায় গল্প বলবেন, একজন বহুরূপী সাধু সেজে এসেছে। তার সাধুর বেশ দেখে জমিদারবাবু খুশি হয়ে তাকে একটা টাকা দিতে গেল, সে নিল না। তারপর সাজপোশাক খুলে মুখ ধুয়ে এসে বলছে, 'তখন কি দিচ্ছিলে দাও'। জমিদার বলছে, 'তখন দিতে গেলাম নিলে না যে'? 'তখন যে আমি সাধু সেজেছিলাম'। ঠাকুর বলছেন, যখন সাধু সেজেছ তখন সাধুর মত ব্যবহার হবে।

আবার ঠাকুর যখন সন্ন্যাস নিয়েছেন, তখন হৃদয়রামকে বলছেন, ওরে হৃদু আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি ঘরে ঢুকব না, তুই আমার খাবারটা চাঁদনিতে দিয়ে যা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘটনা। এখানে আপত্তি কেন? আপত্তি এই জন্য, আধ্যাত্মিকতার শেষ যে অবস্থা, সেই জায়গার সাথে ঠাকুর কম্প্রোমাইজ করতে দেবেন না। ছোটখাটো জিনিসগুলো এক রকম চলছে, ঠিক আছে। শান্তি জল যখন আপনি ছড়াচ্ছেন, তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ধর্ম জীবনের শেষ কথা, ওখানে ড্রামা চলবে না। আপনি টাকা নিচ্ছেন না, চাঁদনিতে বসে খাচ্ছেন; এ পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু এর বেশি না। যেমন পাপ পুরুষ সাজা যাবে না, ঠিক তেমনি সাধু সেজে আপনি শান্তি জল ছড়াতে পারেন না। আপনি সাধু সেজে আছেন, লোকেরা প্রণাম করছে সে ঠিক আছে। বৃন্দাবনে একটা খুব strong culture আছে, ব্রজধামে ছোট ছোট বাচ্চারা কৃষ্ণলীলা করে, সেইসব বাচ্চাদের বড়রা প্রণাম করে। প্রণাম করছে নিজের ভক্তির জন্য, কিন্তু ওই বাচ্চা যদি আশীর্বাদ দিতে শুরু করে, তখন এটা আপত্তিজনক হবে। কারণ তুমি তখন নিজেকে গ্রেট মনে করছ। আপনি যখন শান্তিজল ছড়াতে শুরু করলেন, তখন আপনি মনে করছেন আপনি তিনি, আপনি কিন্তু তিনি নন, আপনি এটা করতে পারেন না। কারণ ওখানে নাটকে শান্তিজল স্টেজে ছড়াচ্ছে না, দর্শকদের মধ্যে ছড়াচ্ছে।

নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন, "নরেন্দ্র, এরা বলছে একটু গা না"। এ-সব কথার মধ্য দিয়ে যে কত মাধুর্য ঝরে পড়ছে, একবার যদি আস্বাদ করতে পারেন, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ঠাকুর জানেন নরেন্দ্রের শরীর তত ভাল নেই আর উনি মিষ্টি করে বলছেন, 'নরেন্দ্র, এরা বলছে একটা গা না', মাধুর্য যেন ঝরে পড়ছে। এরপর নরেন্দ্র একটা একটা করে অনেকগুলো গান করলেন।

নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বলিতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেনঃ

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
সুখে-দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।

গানের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন। ভবনাথের গান যেমনি শেষ হল নরেন্দ্র হেসে হেসে ঠাকুরকে ভবনাথের কথা বলতে বলতে বলছেন –

নরেন্দ্র (সহাস্যে) –এ (ভবনাথ) পান-মাছ ত্যাগ করেছে।

ঠাকুর (সহাস্যে) –সে কি রে! পান-মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। ঠাকুর যখন কথা বলতেন, ধর্ম জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে কোথাও কোন কম্প্রোমাইজ নেই। উচ্চতম যে শিখর, কক্ষণ সেখান থেকে ঠাকুর নিচে নামবেন না।

এখানে বিষয়ের সাথে হয়ত মিলবে না, তাও একটা ছোট গল্পকথা বর্ণনা করা যেতে পারে, তাতে ধর্ম জীবনটা ভাল বুঝতে পারবেন। ধর্ম জীবন কি রকম? একটা গল্প আছে। কলকাতার এক কুকুরের খুব ইচ্ছে হল সে কাশী যাবে। কোথাও কাশীর কথা শুনে থাকবে। ঘরবাড়ি সবাইকে ছেড়ে সে হাঁটতে শুরু করল। একদিন দুদিন যাওয়ার পর রাত্রিবেলা একটা গ্রাম দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে ভাবল একবার গ্রামটা ঘুরে যাই দেখি কেমন। সেখানকার গ্রামের কুকুরগুলো তাকে এমন তাড়া দিয়েছে, প্রাণ

ছেড়ে সে কাশীর দিকে দৌড় মেরেছে। সে কখন দৌড়াচ্ছে, কখন হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা জায়গায় যেতে যেতে ওখানকার কুকুরগুলো তাকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করেছে। এইভাবে সে কখন হাঁটছে, আবার কখন বন্ধুত্ব পাতাতে গিয়ে বাকি কুকুরদের তাড়া খেয়ে দৌড়াচ্ছে। ওর যেখানে এক মাসে হেঁটে কাশী পৌছানর কথা, পনের দিনেই পৌঁছে গেছে।

আধ্যাত্মিক জীবন মানে পূর্ণত্যাগ, সমস্ত ত্যাগ। ছোটখাটো ত্যাগ, এই যে কুকুরের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, এতে হয় না। যখনই কোথাও অল্প একটু ঢুকতে চাইছে, সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা করছে, তখনই তাকে বাকিরা সবাই তাড়া করছে। ঠাকুর বলছেন, সংসার যেন পাতকুয়া, আত্মীয়রা যেন কালসাপ; এরা যখন তাড়া দেয়, তখন বুঝবেন কাশীর দিকে যে দৌড়াচ্ছেন, আপনার গতি বেড়ে যাচ্ছে। পান-মাছ ত্যাগে কি হয়, এটা হল কৃষ্ণকিশোরের একাদশী। ঠাকুরের একদিন ইচ্ছে হল কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করবেন। খুব করে লুচি ছক্কা খেলেন, আবার দুটো রুটি দুধে ভিজছে –এই হচ্ছে কৃষ্ণকিশোরের একাদশী। ঠাকুরের স্বভাব বাচ্চার মত, যেখানে যা দেখতেন সেটাও তার করা চাই। হৃদয়রামকে বলছেন, ওরে হৃদু, আমিও কৃষ্ণকিশোরের মত একাদশী করব। ঠাকুর করলেন, ওই খেয়ে এমন ব্যারাম হল যে তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকলেন। এ-রকম করে ধর্ম হয় না।

আগে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, পরে পরে আরও দেব। আপনি কল্পনা করুন, কলকাতার গঙ্গায় আপনি সাঁতার কাটছেন। সাঁতার কেটে একা আপনি চললেন গঙ্গাসাগর। যখনই দেখছেন পানাগুলো কাছে চলে আসছে, ঠেলে একটু সরিয়ে দিলেন। কোন মরা জীবজন্তু ভেসে কাছে এলে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। নিজের মত সাঁতার দিতে দিতে চলেছেন। মাঝখানে কিছু ভাল ফুল ভেসে এলো, একটু কাছে টেনে নিলেন। এই ফুল টেনে নেওয়া, এটা হল comfortable life। প্রিয়কে কাছে টেনে সঙ্গ পাওয়া আর অপ্রিয়কে দূরে ঠেলে দেওয়া, খুব সহজেই করে নেওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জীবন এভাবে চলে না। আধ্যাত্মিক জীবন হল, আমি সাঁতার কেটে চললাম গঙ্গোত্রী বা হরিদ্বার। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্*, কোন কোন ধীর ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে আবৃত করে দিয়ে অমৃতত্ব বা অমরত্ব লাভের ইচ্ছা করেন। ইন্দ্রিয়কে আবৃত করে দিয়ে এবার সে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। বিপরীতে দিকে চলতে শুরু করার পর তাঁর কাছে ফুল ভেসে আসুক বা কচুরিপানাই ভেসে আসুক, দুটোকেই তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে। পাপ-পূণ্য, সুখ-দুঃখ দুটোরই পারে সেই অমৃতত্বের সন্ধানে আপনাকে সব ছেড়ে এগিয়ে চলে যেতে হবে।

এই উপমাটা যদি মনে রাখেন, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন ধর্মজীবন কিভাবে হয়। আপনি বলবেন, আমরা সংসারে আছি, আমাদের দ্বারা হবে না। তাহলে এটা আপনার জন্য নয়। হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্র বেদ অনেক আগেই পরিষ্কার দুটো পৃথক ধর্মের কথা বলে দিয়েছেন –প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। একমাত্র সন্ন্যাসীই পুরোপুরি ঈশ্বরে মন দিতে পারেন, কারণ তাঁর অনেক সুবিধা আছে। সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের পক্ষে পুরোপুরি ঈশ্বরে মনে দেওয়াতে অনেক অসুবিধা আছে, সেইজন্য তাঁরা পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবেন। আর তার সাথে সবটাই করবেন, একটু সুখভোগও করবেন। ঠাকুরও বলছেন, স্বদারা গমনে দোষ নাই। গৃহস্থদের যে সাধনপদ্ধতি তা অনেক সহজ, কারণ তাকে সংসার সামলাতে হয়। আমি একজনকে বললাম, ক্লাশ সিক্সে বায়োলজি পড়ে আপনি যদি মনে করেন ডাক্তার হয়ে গেছেন, তা কখনই হওয়া যায় না। কথামৃত পড়ে আপনি মনে করলেন এবার আপনি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনে ঢুকে গেলেন; না, এভাবে হয় না। তার জন্য প্রস্তুতি লাগে, প্রস্তুতি মানেই এই সংসার জীবন।

এই যে পান-মাছ ত্যাগের কথা, এসব করতে হয়; কোথাও একটা শুরু তো করতে হবে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর কর্মত্যাগ আর কর্মফলত্যাগে ত্যাগের সমানতার কথা বলছেন। এই ত্যাগ করতে করতে আপনি একদিন উপরে উঠে আসবেন। ঠাকুর এখানে বলছেন, সে কি

রে! পান-মাছে কি হয়েছে? এই কথা ঠাকুর ভবনাথের নামে বলছেন, যিনি কিনা একজন ঈশ্বরকোটি। আগেকার দিনের সমাজ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে কোন বাজে কিছু করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলা হত, তুমি ভদ্রবাড়ির ছেলে না? এ-রকম কেন করছ তুমি? তার মানে যারা ভদ্রবাড়ির, সেই বাড়ির যে সন্তান, তার আদর্শ অনেক উঁচু। মনুস্মৃতিতে মনু ব্রাহ্মণদের জন্য অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ রেখেছেন, ওই স্তরে তোমাকে থাকতে হবে।

ঠাকুর যদি এখানে বলতেন, বাঃ পান-মাছ ত্যাগ করেছ, খুব ভাল; তাহলে বোঝা যেত যে ভবনাথ এনারা এখনও অনেক নীচের থাকে আছে। কিন্তু এনারা একেবারে অন্য থাক, এনাদের ষোল আনা ত্যাগ; এনাদের ষোল আনা ত্যাগ না থাকলে অন্যরা পান-মাছ ত্যাগ করতে পারবেন না। এনাদের হল শতকরা একশ ভাগ ত্যাগ। সেইজন্য ঠাকুর ভবনাথকে এই কথা বলছেন। এটাই যদি অন্য সাধারণ কেউ হত, তখন ঠাকুর কি বলতেন বলা মুশকিল; কারণ ঠাকুর বলতেন, সংসারে থেকে হবে না কেন। কিন্তু ঠাকুর হলেন বর্তমান যুগের আচার্য, তিনি কোথাও কম্প্রোমাইজ করবেন না। তিনি সব সময় সা রে গা মা'র 'নি'টাকে ধরে থাকবেন। পরে পরে আচার্যরা আসবেন, তাঁরা একটু একটু করে ওটাকে ডাইলুট করবেন। এইজন্য এখানে পান-মাছ ত্যাগ নিয়ে বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ওইটাই করতে হবে। কিন্তু ত্যাগের সমানতা আছে, সাধারণ লোকেরা ওটা করবে। কিন্তু এখানে কথা বলছেন ঠাকুর, আর এই কথা বলছেন, নরেনের সামনে, রাখালের সামনে আর ভবনাথের সামনে, সেখানে এত সাধারণ জিনিসকে নিয়ে আলোচনা হয় না। ফাইটিংএ যেমন কমাণ্ডোরা হয়, খুব উচ্চমানের; আধ্যাত্মিক জগতে এনারা কমাণ্ডোস্; সেখানে এই সাধারণ জিনিস চলে না।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, রাখাল কোথায়? একজন ভক্ত জানালো, আজ্ঞে রাখাল ঘুমুচ্ছেন।

ঠাকুর (সহাস্যে) –একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠল তখন সব শেষ হয়ে গেছে। (সকলের হাস্য)

তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল। (সকলের হাস্য) ঠাকুর মজা করে বলছেন।

রামদয়াল বড় পীড়িত। আর এক ঘরে শয্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এবার বেলা চারটে বেজে গেছে। ঠাকুর বৈঠকখানাঘরে বসে আছেন, সেখানে নরেন্দ্রাদি ভক্তরা আছে, সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তও এসেছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে?

এখনও কলকাতার লোকেরা মাঝে মাঝে আমাদের বলবে, মহারাজ একবার অষ্টাবক্রসংহিতা করবেন, মহারাজ একবার পঞ্চদশী করবেন, মহারাজ নিবেদিতাকে নিয়ে একটু বলবেন। আমরা ইউটিউবে একেবারে core spirituality দিয়ে যাচ্ছি। আপনি বলবেন, নিবেদিতা কি core spirituality না? কোথায় উপনিষদ আর কোথায় নিবেদিতা, কখন কি তুলনা হয়? এই যে প্রকরণ গ্রন্থ, এনাদের উদ্দেশ্য হল আপনাকে উপনিষদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। উপনিষদের উদ্দেশ্য আপনাকে উপলব্ধি করানো। ঠাকুর এখানে উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে? বেচারি প্রশ্নকর্তা জানতেনও না যে ঠাকুর পড়াশোনা জানতেন না। তবে এনাদের দোষ নেই, আজকে আমরা ঠাকুরকে যেভাবে দেখছি, তখনকার লোকেরা তো এসব কথা জানতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ও-সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয় –প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। ঠাকুর শুনেছিলেন কত। আপনি গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন, সেখানে একটি মাছের সঙ্গে দেখা হল।

মাছকে আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মাঝে মাঝে স্নান কর? মাছ কি বলবে? সে স্নান ব্যাপারটা কি বুঝতেই পারবে না। গঙ্গার অগাধ জলরাশি, ওর মধ্যেই সে থাকছে, ওর মধ্যেই বিচরণ করছে। গঙ্গার পারে যাঁরা থাকেন, তাঁরা মাঝে মাঝে গঙ্গায় নামবেন, স্নান করবেন। উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের যে অনুভূতি, ওর মধ্যে আপনি ডুবে মাছ যেমন জলে ক্রীড়া করতে থাকে, ঠিক সেই রকম মনের আনন্দে আপনার বিচরণ করে যাওয়া। এখানে আমি আত্মানুভূতি, ঈশ্বরদর্শনের কথা বলছি না। ইউটিউবে, ফেসবুকে, হোয়াটসাপে আমাদের অনেকেই বলেন, আমরা তো সংসারে আছি। আচ্ছা বলুন তো, আমরা কি সংসারে নেই? নাকি, আমরা কি সংসারের বাইরে? ঠাকুর, ওনারও স্ত্রী আছেন, ওনারও ঘটিবাটি আছে, ওনারাও প্যালাপাঁচু আছে। সংসারে তো সবাই, কে নেই সংসারে।

আমার খুব প্রিয় গল্প, বন্ধুদের প্রায়ই এই গল্প বলি। সংস্কৃতে একটা নামকরা শ্লোক, শিবের সংসার, শিব সবাইকে নিয়ে বসে আছেন। শিবের গলায় যে সাপ, সেই সাপ এগিয়ে যাচ্ছে গণেশ ঠাকুরের ইঁদুরটাকে খাবে বলে। শিব তাড়াতাড়ি করে সাপটাকে সামলে নিচ্ছেন। ওদিকে কার্তিক, তাঁর বাহন ময়ূর। সে এগিয়ে আসছে শিবের গলার সাপটাকে খাবে বলে। শিব ময়ূরটাকে একটা হাত দিয়ে ঠেলে সরাচ্ছেন। মায়ের বাহন সিংহ, সে ওৎ পেতে আছে, শিবের দৃষ্টি সরলেই শিবের বাহন ষাঁড়ের ঘার মটকাবে। ওইদিকেও শিবকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, যাতে সিংহ আক্রমণ না করে বসে। আর ওইদিকে পার্বতী আগুন হয়ে আছেন, আমি শিবের স্ত্রী, তিনি কিনা মাথায় বসিয়ে রেখেছেন গঙ্গাকে। এই হল শিবের সংসার। সবাই এক অপরকে মারার জন্য লেগে আছে, শিব একেও সামলে যাচ্ছেন, ওকেও সামলে যাচ্ছেন, সবাইকে সামলাচ্ছেন; তার মধ্যে আবার তিনি হয় নির্বিকল্প সমাধি আছেন, নয় তো তাথৈয়া তাথৈয়া করে নৃত্য করে যাচ্ছেন।

জপধ্যান যখন করছেন, তখন ঠাকুরের নামে ডুবে থাকুন, না ডুবে থাকতে পারলে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকুন। শ্রীশ্রীমা তো বলেছেন, ছায়া কায়া সমান, ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন তাতেই হবে। ধ্যান করার আপনার অত দরকার নেই। যদি না পারেন গুরু যতটুকু বলে দিয়েছেন করলেন, তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকুন। আর যদি জপধ্যান করতে পারেন, তাহলে তো তার মত আর কিছু নেই। যদি তাও না পারেন, দশ পনের মিনিট হাততালি দিয়ে হরিনাম করুন। মনে যখনই কষ্ট হবে তখন শিবের সংসারের কথা ভাববেন, শিবের সংসার এভাবেই চলে। আমাকে একদিন একজন জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ আপনাদের এখানে ঝগড়াঝাঁটি হয়? ঝগড়াঝাঁটি মানে, কথা কাটাকাটি; আমরা তো বংশ পরম্পরায় এটা পেয়েছি। শ্রীশ্রীমায়ের পাগলী মামী, রাধু, মাকু সব এখানে রয়েছে। আর ঠাকুর তো হৃদয়রামের সাথে এমন ঝগড়া করতেন যে, বলতেন, আমি রাগলে তুই চুপ থাকবি, তুই রাগলে আমি চুপ থাকব; তা নাহলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। আমরা এই জিনিস পরম্পরায় পেয়েছি। স্বামীজী রেগে গেলে এমন গালাগাল দিতেন, একদিন ওই গালাগাল শুনে রাজা মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে গেলেন। সংসার মানেই এটা, এটাই সংসার, এখানে এভাবেই থাকতে হয়।

কিন্তু মূল কথাটা দেখুন, ঠাকুর বলুন, মা বলুন, স্বামীজী বলুন, শিব বলুন; কোথায় একটা মনের আনন্দে ভাসছেন। একবার কল্পনা করুন, কৈলাসে শিব নিজের ডমরু নিয়ে ডমক ডিম্ ডম্ ডমক ডিম্ ডম্ বাজিয়ে যাচ্ছেন, একা একা, কোথাও কেউ নেই। মনে মনে আপনিও সেই একই আনন্দ তৈরী করেন। এই সংসারে একটু আনন্দ যদি নাই পেলেন, তাহলে লাভটা কি। কষ্ট সবাই করছে, খাটনি সবারই আছে, ঝগড়াঝাটি সবারই হয়, অসুখ-বিসুখ সবারই আছে, জন্মমৃত্যু সবারই আসে। ধর্ম জীবনে এসে এতটুকু আনন্দ যদি আপনি নাই পেলেন, তাহলে আপনার লাভটা কি হল। ঠাকুর এটাই বলছেন, ওসব একবার প্রথম প্রথম শুনে নিতে হয় –প্রথম প্রথম একবার বিচার করতে হয়। তারপর –

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

মনে মনে আদরিণী শ্যামাকে নিয়ে আপনি নাচছেন। স্বামীজী বলছেন, গোমড়া মুখ নিয়ে বাইরে বেরিও না। আপনারা হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি, কারণ আপনারা শাস্ত্র শুনছেন। হিন্দু ধর্মের আপনি বিশেষ একজন, কারণ শাস্ত্র শুনছেন। আনন্দে যদি না থাকেন, তাহলে অপরকে কি বলবেন। আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ, পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, অনেক আগে উনি একজনের নামে বলতেন – পুরো চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জি সব সময় যেমন মেঘে ঢাকা থাকে, তেমনি ওর মুখটা সব সময় হাড়ি হয়ে আছে, মনে হয় মেঘে ঢাকা। মীরাবাঈএর খুব বিখ্যাত গান, পায়ো জী ম্যায়নে রামরতন ধন পায়ো। রামরূপী রত্ন পেয়েছেন, গুরুর কাছে রামমন্ত্র পেয়েছেন, আনন্দে নৃত্য করছেন। হরক হরক জস গায়ো, আনন্দের আতিশায্যে গান গেয়ে যাচ্ছেন, কি আনন্দ তার। আনন্দে যদি আপনার চেহারা টগবগ না করে তাহলে আপনি কিসের শাস্ত্র শুনছেন, কিসের আপনি ধর্মকথা শুনছেন।

আমাদের স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রায়ই এই কথা বলতেন, ঠাকুরের ঘর, এখানে হেউঢেউ ব্যাপার। এখানে এসেও যদি আপনার ভিতর আনন্দ না থাকে, গোমড়া মুখে থাকছেন, তাহলে আপনার ধর্ম জীবনে কিছু গোলমাল আছে। যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে; আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে যতনে রেখেছেন, তাতেও আনন্দ হচ্ছে না? ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু কেঁদে যাচ্ছেন, হে ঠাকুর আমার এই হয়েছে সেই হয়েছে একটু দেখ, হে ঠাকুর আমার মন বসছে না; যত সব ননসেন্স। মায়ের কথা যদি একটু বিশ্বাস করেন, ছায়া কায়া সমান; তাহলে এটা মানুন যে ঠাকুরের ছবি যেখানে আছে, সেখানেই ঠাকুর আছেন। ঠাকুর যেখানে আছেন, সেখানে আপনি গোমড়া মুখে থাকছেন? বাইবেলে যীশু এই একই কথা বলছেন, যতক্ষণ বর আছে বরযাত্রীরা আনন্দ করে। বলছেন, আমি এখন আছি, তোমরা আনন্দ কর।

ঠাকুর আপনার বাড়িতে আছেন, ঠাকুর আপনার ঘরে আছেন, ঠাকুর আপনার টেবিলে আছেন, সব জায়গায় ছবি রূপে তিনি বিরাজ করে আছেন; আনন্দ করুন, আনন্দে থাকুন। এই শাস্ত্রগুলো শোনা এইজন্য যে, শাস্ত্রগুলো হল আনন্দের খনি। কিসের বিচার, ঠাকুর পঞ্চদশীর প্রসঙ্গে এক কথায় বলে দিলেন, প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। কি বিচার করবেন? বিচার করে যে কথাটি বলবেন, সেটাতো আপনি পেয়ে গেছেন। পঞ্চদশী পনেরটি অধ্যায় বিচার করে আপনাকে বলবে –আত্মা সত্য বাকি মিথ্যা। সেতো আপনি পেয়ে গেছেন, ঠাকুরের মন্ত্র পেয়ে গেছেন, আর কিসের পঞ্চদশী পড়া। কিসে আপনি আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারবেন, এখন সেটাকে নিয়ে ভাবুন। প্রকরণ গ্রন্থে ওনারা যেটা বলবেন, আপনি ইতিমধ্যে সেটা পেয়ে গেছেন।

ওয়াল্ট ডিজনের বাচ্চা মেয়ে যখন জানল ইনি হলেন ওয়াল্ট ডিজনে, সেই বাচ্চা মেয়ে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, 'Are you Mr. Walt Disney'? 'Yes! I am'। বাবা বুঝতে পারছে না, হঠাৎ মেয়ে কেন জিজ্ঞেস করছে। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'Are you the creator of Micky Mouse'? 'Yes, I am'। 'Please give me your autograph'। ঠাকুরের সন্তান আপনি, আনন্দে থাকুন। ঠাকুর তো ছাড়ার পাত্র নন, আর আপনার সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক সাংসারিক বিবাহের সম্পর্ক না, যেখানে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রতি পদে পদে। কিসের এত টেনশান, কিসের এত দুঃখ!

শিবের গল্পটা মনে রাখবেন, সংসার এভাবেই চলে। তার মধ্যেই শিব আনন্দ করে যাচ্ছেন, ডমরু বাজিয়ে বাজিয়ে নৃত্য করে যাচ্ছেন। আমরা একটা ঘটনা শুনেছিলাম, জায়গার নামটা আর বলছি না, ওখানে যে মহারাজ ছিলেন তিনিই বলেছিলেন। ওখানে ইউনিয়ন বিরাট ঝামেলা তৈরী করেছিল।

মহারাজরা বললেন, ধুর এসব বন্ধ করে চল আমরা খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করি। সাধুরা সব ঘর বন্ধ করে খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করতে শুরু করেছেন। একজন মহারাজ বলছেন, বাইরে যারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করছে তারা যদি একবার দেখে নেয়, নিজের মাথাটাই ফাটিয়ে নেবে। সাধুরা খোল করতাল নিয়ে গান করছেন আর নেচে যাচ্ছেন – তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা। এই আনন্দটাই জীবন।

সাধনাবস্থায় ও-সব শুনতে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন। ঠাকুর এখানে নিজের কথা বলছেন না, বাকিদের কথাও বলছেন, আপনার ক্ষেত্রেও বলছেন। ঠাকুরের দিকে একটু এগোন, দেখবেন এগুলো কিছুই লাগে না তখন।

প্রথমে বানান করে লিখতে হয়, –তারপর অমনি টেনে যাও।

সোনা গলাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। আগেকার দিনে স্যাঁকরাদের সোনার কাজ করতে খুব পরিশ্রম করতে হত, এখন অনেক কলাকৌশল এসে গেছে। **একহাতে হাপর –একহাতে পাখা –মুখে চোঙ্গ –যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যাই গড়নেতে ঢালা হল –অমনি নিশ্চিন্ত**। জপধ্যন, তপস্যা দিয়ে খাটাখাটনি করা হল। এরপর যখন একটা স্থিতি এসে গেল, তখন আর কিসের এত খাটাখাটনি। দুঃখ যদি আপনাকে স্পর্শ করে, তাহলে বুঝবেন আপনার ধর্ম জীবনে, আপনার ধর্ম দর্শনে বিরাট গণ্ডগোল আছে। কিছুক্ষণের জন্য একটা দুঃখ এসে হিল্লে নাড়িয়ে দেবে, ওটাও আবার শান্ত হয়ে যাবে, তারপর আবার কিসের দুঃখ।

শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। এই যে ঠাকুর ভবনাথকে পান-মাছ ত্যাগের কথা বললেন, এটা এখানেও চলছে। **কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না**। এই হল পান-মাছ ত্যাগ আর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের তফাৎ। আমরা যখন কাঞ্চনের পিছনে দৌড়াই, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের ভিতরে টেনে নেয়। আর কাম সুখে মানুষ যখন নামে, বর্ণনা করে দরকার নেই; সব কটা ইন্দ্রিয় ওতেই মজে গিয়ে আটকে যায়। কিন্তু যে কামিনীতে নেই, তার আর কাঞ্চনের কিসের দরকার! কামিনীর পিছনে নেই, তা সত্ত্বেও যারা টাকার পিছনে ছুটছে, টাকা জমিয়ে যাচ্ছে, তারা মানসিক ভাবে অসুস্থ। আপনারা একটু বিচার করে দেখবেন, কামিনী-কাঞ্চন কিভাবে আপনার ইন্দ্রিয় আর মনকে টেনে নেয়, পুরো একাদশ ইন্দ্রিয়কে টেনে নেয়। কামিনী-কাঞ্চনের একটু আঁশ যদি থাকে, পুরোটাই টেনে নেবে। শাস্ত্র বোঝার জন্য আপনার মনকে কামিনী-কাঞ্চন থেকে আলাদা করতে হবে। কামিনী-কাঞ্চন থেকে আলাদা না হলে শাস্ত্র বোঝা যায় না। অনেকে এসে বলে, গীতা বুঝতে পারছি না। কি করে বুঝবেন, আপনি জানেনও না যে, আপনার মন কামিনী-কাঞ্চনে কিভাবে ডুবে আছে; কিভাবে সংসারে মন ডুবে আছে, সেইজন্য বুঝতে পারছেন না। এগুলো শুনতে শুনতে কি হয়, সংসার থেকে মন একটু সরে আসে। এটাও ওই সাধনার মধ্যেই পড়ে।

সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। আপনারা অনেকেই মেইল করেন, ইউটিউবে লেখেন –এটা কেন হয় না, সেটা কেন হয় না। সংসারের আসক্তিতে মানুষ কিভাবে যে মজে আছে বুঝতেও পারে না। উপায় কি? শাস্ত্রের কথা, গীতা, উপনিষদ, কথামৃত এগুলো শুনতে হয়, এতে চেতনাটা বাড়ে। সাধুসঙ্গ করলে চেতনা বাড়ে। আর দশটি সংস্কার, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এগুলো যদি নিয়মিত না করেন ধারণা হবে না। আগে মনটাকে শুদ্ধ করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। আসক্তি কমানোর উপায় –সাধুসঙ্গ, নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা আর জীবনটাকে যজ্ঞ রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঠাকুর রস মিশিয়ে বলছেন –

সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত।। (সকলের হাস্য)

কালা, শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন। কাব্যরস শিখেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভালবেসেছে যে কাব্যরস সব উড়ে গেল। ঠিক তেমনি যত শাস্ত্র পড়ুন ধারণা করতে পারবেন না। কারণ মনটা সংসারে পড়ে আছে কিনা। ঠাকুর বলছেন, দক্ষিণেশ্বরে বানরগুলো চুপ করে বসে আছে, মাথায় খালি ঘুরছে কোন বাগানে কি হয়েছে।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন।

কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে। আমরা যখন কোন কিছু পড়ি, আমরা সেটাকে নিজের সঙ্গে জুড়ে দিই। ঠাকুরের এই কথা পড়ার পর আমরা মনে করি, আমারও যোগ ভোগ। কেরলের একজন ভদ্রলোককে জানতাম, ওনাকে আমি চিনতাম। প্রচুর মদ খেতেন। এখন ঠিক করেছেন গিরিশ ঘোষ হবেন, মনে করছেন তাঁকেও ঠাকুর গিরিশ ঘোষের মত উদ্ধার করবেন। ভদ্রলোককে আমি বললাম, যেভাবে দ্বিতীয় নরেন হয় না, ঠিক সেইভাবে দ্বিতীয় গিরিশ ঘোষ হয় না। এসব পাগলামো ছাড়ুন। যোগ ভোগ, কেশব সেনের ছিল, তাই বলে আপনিও যে বলবেন, আমার যোগ ভোগ দুই আছে, না, আপনার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না।

একজন ভক্ত কনভোকেসনের কথা বলছেন **–দেখলাম লোকে লোকারণ্য**। ঠাকুর কি রকম দেখুন, সব কিছুকে ঘুরে তিনি ঈশ্বরে নিয়ে ফেলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বরের যে বিরাট রূপ, যে কোন জায়গায়, যদি গভীর জঙ্গল দেখা হয়, কিংবা বিরাট পাহাড়, এই দৃশ্যগুলি মনে একটা বিরাটের ভাব নিয়ে আসে। ঠিক তেমনি জনসমুদ্র, অনেক লোক যদি একসঙ্গে দেখেন ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে যাবে। **আমি দেখলে বিহ্বল হয়ে যেতাম**। হাওড়া স্টেশনে যখন লোকাল ট্রেন থেকে লোকেরা নামে তখনও এই রকম হয়, সব লোক দৌড়াচ্ছে। সেটা দেখলে ঠাকুর আবার ওটাই বলতেন, দেখলুম সবারই দৃষ্টি নিচের দিকে। কিন্তু কনভোকেসান আদিতে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আছে, চাঞ্চল্যটা সেখানে নেই। আমাদের একজন মহারাজকে দেখতাম, কোন সভা আদি হলে সামনে এসে সভার দিকে তাকিয়ে একবার প্রণাম করতেন। কারণ ঠাকুর এই যে বলে গেছেন, অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। এটাই ঈশ্বরের বিরাট রূপ, সমষ্টি রূপ। এই হল ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। এরপর মণি মল্লিকের সাথে কাশীর ব্যাপারে আলোচনা হবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে –মণিলাল ও কালীদর্শন

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে আছেন। এর আগে আমরা ৭ই এপ্রিলের বর্ণনা করলাম, যেখানে অনেক কিছুর সাথে ঠাকুর পান-মাছ ত্যাগের কথা বললেন। পরিচ্ছেদের শুরুতে মাস্টারমশাই ঠাকুরের একটা খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। মাস্টারমশাইয়ের ভাষা খুব সুন্দর ছিল। স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ আমাদের খুব সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, গত হয়েছেন। উনি ঘোর বেদান্তী ছিলেন। আমি তখন নূতন ব্রহ্মচারী। সবে দু-এক বছর হয়েছে আমি দেওঘরে জয়েন করেছিলাম। মহারাজ মাঝেসাজে দেওঘর বিদ্যাপীঠ আসতেন, বিশেষ করে গরমের সময় আসতেন। অনেক সময় এক মাস, দু-মাস থেকে যেতেন। উনি মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গ করেছিলেন, মাস্টারমশাইকে জানতেন।

আমাদের বেশির ভাগ সেন্টারে, শাখা কেন্দ্রে রাত্রে খাওয়ার পর সবাই মিলে একটা ঘরে সমবেত হন, সেখানে একজন একটা কোন শাস্ত্র পাঠ করেন। দেওঘর খুব ব্যস্ত কেন্দ্র। ছুটি আদি থাকলে কথামৃত পাঠ হত। স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজও এসে বসতেন। ওনার কাছে আমি অনেক

কিছু শিখেছিলাম, বুঝেছিলাম। উনি বলতেন, কথামৃতে মাস্টারমশাই যে বর্ণনাগুলো দিয়েছেন, এগুলোকে অনুধ্যান করতে হয়। যাঁরা আমাদের কথামৃতের আলোচনা শুনছেন, আশা করি তাঁরা রোজই কথামৃত এক পাতা করে পড়েন। যেটুকু পড়া হল ওটাকে মাথায় সব সময় ঘোরাতে হয়। ঠাকুরের কথাগুলো যেমন ঘোরাতে হয়, ঠিক তেমনি এই ধরণের যে বর্ণনাগুলি রয়েছে, এগুলোকেও চোখ বন্ধ করে ভাবতে হয়। মহারাজ আমাদের এই কথাগুলো বলেছিলেন, কথাগুলো তখন আমার খুব ভাল লেগেছিল।

পরিচ্ছেদের প্রথমেই মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। আমরা পুরো বর্ণনাটা পাঠ করছি না, আপনারা নিজেরা পড়লেই বুঝতে পারবেন। আমরা এখানে মূলতঃ ব্যাখ্যা করছি। মাস্টারমশাই বলছেন, **আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে দর্শন করিতে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের ভাবে সর্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন দেখিব**। মাস্টারমশাইর এই ভাষা যেন শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। ভাগবতে ভগবান ভক্তের সঙ্গে বিলাস করছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপ বালকদের সঙ্গে খেলাধুলা করছেন, গোপীদের সঙ্গে ঘুরছেন, এগুলো সব ভক্তের সঙ্গে ভগবানের বিলাস। ঠাকুরেরও এগুলো বিলাস। **কখন সমাধিস্থ, কখন কীর্তানন্দে মাতোয়ারা আবার কখন বা প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, দেখিব**।

আগে আগে ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর উদাহরণ দিয়ে অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা অর্থাৎ সমাধিস্থ, কীর্তন আর কথাবার্তার কথা বলেছিলেন তার উপর আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। কথাবার্তা ঠাকুরের দুই প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে –একটা হল, যেখানে ঠাকুর তত্ত্ব কথা বলছেন, আবার সাধারণ কথাবার্তাও করছেন। অন্যন্য শাস্ত্রের তুলনায় কথামৃতের একটা বিশেষ স্থান, কারণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কথা সরাসরি আসছে, কিংবা রামকথা যখনই কোথাও আমরা পড়ি, সেখানে ওনাদের যে সংসার নিয়ে কথা খুব বেশি নেই। যদি তুলনা করতে হয়, তাহলে দেখা যাবে কথামৃতের সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রন্থ হল বাল্মীকি রামায়ণ। পুরোটা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে বর্ণনা আসে কিভাবে শ্রীরামচন্দ্র সাধারণজনদের সাথে মিশছেন, তাদের যেমনটি বলা দরকার তেমনটি বলছেন, যেমনটি ব্যবহার দরকার সেই অনুরূপ ব্যবহার করছেন। এটাই যখন ভক্তিশাস্ত্র হয়ে যায়, যেমন তুলসীদাসের রামচরিতমানস, তখন এই জিনিসগুলো হারিয়ে যায়। যে কোন ভক্তিশাস্ত্রে হারিয়ে যাবে। পরে যখন ঠাকুরকে নিয়ে ভক্তিশাস্ত্র তৈরী হবে, তখনও এগুলো হারিয়ে যাবে। তখন ওনারা তত্ত্বকে হয় জ্ঞানরূপে নয়তো ভক্তিরূপে আমাদের সামনে পরিবেশন করবেন। ঠাকুর নিজের হৃদয় দেখিয়ে বলছেন, এর ভিতর এক তিনি আছেন আর এক তাঁর ভক্ত। কখন তিনি ভগবান রূপে উপদেশ দিচ্ছেন, কখন তিনি ভক্ত রূপে বাকিদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। ভগবান রূপে তো মেশা যাবে না, সম্ভব না। মাস্টারমশাই এইসব বর্ণনা করছেন।

ঠাকুরের কাছে রাখাল বসে আছেন। মাস্টারমশাই এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিক এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন। হিন্দু সমাজের এটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য, যখনই কোন মহাত্মা একটু বড় হয়ে যান, ওনাকে কেন্দ্র করে সবাই একটা সম্প্রদায় দাঁড় করিয়ে দেন। হিন্দুদের এটা স্বভাব। অন্যান্য সমাজে এতটা হয় না। কারণ অন্যান্য সমাজ পুস্তক কেন্দ্রিক, পুস্তক কেন্দ্রিক হলে তখন এই জিনিস করা যায় না, তখন অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এখানে হঠাৎ হঠাৎ দেখি কখন এই বাবাজী ফেমাস, কখন ওই বাবাজী ফেমাস, এই জিনিস এখানে চলতেই থাকে, ভারতবর্ষে এটা কোন ব্যাপারই না। কেশবচন্দ্র সেন ভাল লেকচার দিতে শুরু করলেন, হয়ে গেল ব্রাহ্মসমাজ।

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে তাঁহাদের কুঠি আছে। আগেকার দিনে, এখনও আছে, যাদের টাকা-পয়সা আছে তাদের অনেকে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে, নামকরা শহরে ফার্ম হাউস তৈরী করে। আগেকার দিনের বাবুরা যাদের পয়সা থাকত তারা বিভিন্ন শহরে, তীর্থস্থানে বা কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা বাড়ি বা কুঠি তৈরী করে রাখতেন। দেওঘরে আমরা দেখেছি, সেখানে শহরে ও শহরের বাইরে প্রচুর লোক বাইরে থেকে এসে বাড়ি করে রেখেছেন। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী এসব জায়গায় বড়লোকদের এ-রকম বাড়ি থাকত। মঝেসাজে এনারা সেখানে গিয়ে এক মাস, দু-মাস থাকতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধু-টাধু দেখলে? ঠাকুর সব রকমের কথাই বলতেন। হৃদয় দেখা করতে এসেছিলেন, হৃদয়কে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন দেশে এবার ধান-টান কেমন হয়েছে। লোকেদের মধ্যে একটা ধারণা যে, ভগবানের যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু বলেন না, তা না, সব কিছু নিয়েই কথা বলেন। সমাজ সাধু-সন্ন্যাসীকে খেতে পরতে দিচ্ছে। তাঁদের যে দুঃখ-কষ্ট, তাঁদের যে অবস্থা, যত দূর থেকেই হোক একটু তো দেখতে হবে। ঠাকুর ভালভাবেই মিশতেন, কথামৃতে এমন এমন সব কথা আছে অবাক লাগে; আমরাও জানতাম না সমাজে এমন জিনিস হয়।

মণিলাল –আজ্ঞে হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ –এঁদের সব দেখতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিরকম সব দেখলে বল?

মণিলাল –ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়িতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। তবে প্রামাণিক খুব একটা পাওয়া যায় না, যা এক-আধটুকু পাওয়া যায়। **লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য আশ্চর্য কার্য করতে পারতেন। এখন অনেকটা কমে গেছে**। ঠাকুরের মন্তব্য না পড়েও আমাদের মত সাধারণ লোকেদেরও এই কথা শোনার পর অবাক লাগবে। আমরা কত আহাম্মক, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত একজন সাধু, তাঁকে নিয়ে বলছেন; এখন তাঁর আশ্চর্য আশ্চর্য কর্ম করার ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে। মানুষের কতটা ক্ষুদ্র বুদ্ধি হলে, একজন সাধু, আপনি এমনি বলুন উনি কিছু না, ঠিক আছে বুঝলাম আপনার দৃষ্টিতে তিনি কিছু না; কারণ আপনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এ-রকম বিচার করা, আগে অনেক ক্ষমতা ছিল, এখন ক্ষমতা অনেক কমে গেছে; এগুলো কি টাকা-পয়সার মত নাকি? আমাকেও অনেকে বলেন, আগে উনি ভাল বলতেন, এখন উনি ভাল বলেন না; আগে যা বলতেন এখনও তাই বলেন। আপনি শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, আপনার আর ভাল লাগছে না। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, তাঁর বিরাট যোগশক্তি ছিল। বিভিন্ন কারণে এখানে সেখানে তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়ে ফেলেছেন। লোকেরা ওটাই বোঝে, ওই ক্ষমতা দেখে মানুষ চমৎকৃত হয়ে আছে। তিনি কি সব সময় জাদুখেলা দেখাতেই থাকবেন? স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুরও বিরক্ত হয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ও-সব বিষয়ী লোকের নিন্দা। সাধু নিন্দা যেখানে হয় বুঝবেন সেখানে বিষয়ীরা আছে। বিষয়ীরা ছাড়া সাধু নিন্দা কেউ করবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে, সমস্ত রকম নিরাপত্তা ছেড়ে একা একা থাকা যে কি জিনিস, যাঁরা এভাবে থাকেন তাঁরাই জানেন। বাইরে থেকে মনে হয় বেশ আছেন, চেহারা ঝকঝক করছে। যারা বিষয়ী তারাই এই ধরণের কথা বলে। কারণ তারা সমস্ত কিছু ওই চমৎকারী দিয়ে বিচার করে।

একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে নর্থ বিহার মতিহারী থেকে এক সাধুবাবা এসেছিলেন। আমাদের বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজ, স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, উনি তখন সেখানকার সেক্রেটারী ছিলেন। সাধুবাবা প্রথমে এসে বসলেন, বসার পর মহারাজকে প্রশ্ন করলেন, 'আপকে পাস কিতনা হাতি হ্যায়'। মহারাজ বললেন, 'না ভাই, আমাদের তো একটাও হাতি নেই'। তখন সেই সাধু সোজা হয়ে বসলেন। একটা আশ্রম সেখানকার যিনি মহন্ত, তিনি কত বড় মহন্ত সেটা মাপা হবে, আশ্রমে কটি হাতি

আছে সেটা দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনে কোথাও হাতি থাকে না, কি আর বলবেন মহারাজ। উনি বললেন, ওনার নটা না দশটা হাতি ছিল। 'মেরা পাস নও হাতি হ্যায়', তার মানে আমি আপনার থেকে বড়।

মণিলাল –ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো নয় –একেবারে কথা বন্ধ। এক-একজন সাধু এক-এক রকম হন। এখন যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি বিভিন্ন কারণে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম একটু বেশি। ভাস্করানন্দের নাম আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কারণ এই জিনিসটা শিষ্য পরম্পরার উপর দাঁড়ায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ভাস্করানন্দের সঙ্গে তোমার কোন কথা হল?

মণিলাল –আজ্ঞে হাঁ, অনেক কথা হল। তার মধ্যে পাপপূণ্যের কথা হল! তিনি বললেন, পাপ পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চান। যে-সব কাজ কল্লে পূণ্য হয়, এমন সব কর্ম কর। ঈশ্বরা চান, আমরা যেন ভাল পথে থাকি, পূণ্য কর্ম করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ ও একরকম আছে, ঐহিকদের জন্য। যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর-সব অনিত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর-একরকম ভাব। এই বিষয়কে নিয়ে আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। তবে এখানে সরাসরি বিষয়টা আসছে, আর ভাস্করানন্দের মত মহাত্মা যেখানে বলছেন, 'ঈশ্বর এই সব চান', তবে ভাস্করানন্দ এই কথা বলেছেন, নাকি মণি মল্লিক বলতে গিয়ে এ-রকম বলছেন, আমাদের এখন জানার উপায় নেই। এগুলোকে বলে একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ হল যেখানে ঈশ্বরকে মনে করা হয় তিনি কোন এক দেশের রাজার মত এই বিশ্বসংসারের রাজা। একেশ্বরবাদে ভগবান যেমন আদেশ করে দিয়েছেন, সেই আদেশ মত সৃষ্টিতে সবাইকে সব কিছু পালন করতে হয়।

ঠাকুর বলছেন, এগুলো ঐহিকদের জন্য। আসলে হিন্দু শাস্ত্রে এ-ভাব নেই। আমরা যখনই 'পাপ' শব্দটা বলি আমাদের মাথায় ইংলিশের 'sin' শব্দটা আসে। হিন্দুদের কিন্তু 'sin' হয় না। এই কথা ভাস্করানন্দ বলেছিলেন, নাকি মণি মল্লিকের মুখ দিয়ে আসছে বলে অন্য রকম হয়ে গেছে, বোঝা মুশকিল। তবে কথাটা অত্যন্ত কাঁচা কথা। কারণ, ঈশ্বর চান আমরা ভাল পথে থাকি, এটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হিন্দু মত নয়। বেদে যদি দেখা হয়, সেখানে এই ভাব নেই, উপনিষদেও নেই। সবচেয়ে প্রামাণিক হল মনুস্মৃতি, যেখানে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল বলে দেওয়া হয়েছে; সেখানেও কিন্তু ঠিক এইভাবে, ঈশ্বর এটা চান, এই ধরণের কোন কথা বলা হয়নি। ভাগবত গ্রন্থে যদি দেখেন, সেখানেও ভগবান কোন আদেশ করছেন না। কিন্তু জহুদি, জিউস, খ্রীশ্চান আর ইসলামরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরীয় কথা বা আদেশ রূপে দেখে। সেখানে খ্রীশ্চানিটি আরও মজার; ওদের যে নিউ টেস্টামেন্ট, সেখানে পাপ বলে কিছু নেই।

আসল জিনিসগুলো হয় জহুদিদেরকে নিয়ে। ওদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, এ্যব্রাহাম, যার জন্য এই ধর্মগুলিকে এ্যব্রাহামিক রিলিজিয়ন বলা হয়, তিনি ওদের যে ভগবান জেহোবা, তাঁর সঙ্গে একটা ট্রিটি করলেন, এটাকে ওনারা কভেনেন্ট বলে, আইনসিদ্ধ দলিল করার মত। জেহোবা বলে দিলেন, এ্যব্রাহাম, তোমার সন্তানরা যদি এই এই করে তাহলে তার বদলে আমি তোমাদের এই এই দেব। এ্যব্রাহামের যাঁরা সন্তান, যাঁরা ওই ধর্ম গ্রহণ করছে, তারা ওই আইনকে ভাঙতে পারবে না। একটা দলিল যদি হয়ে থাকে, সেটাকে না মানলে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যাবে, এর বিরুদ্ধে আপনি কোর্টেও যেতে পারেন। এখানে ভগবানের সাথে দলিল করা আছে। Sin মানে হয়, ওই দলিলকে যখন আপনি অমান্য করছেন।

এ্যব্রাহামেই এই ট্রিটি শেষ হল না, পরে পরে ওদের যাঁরা প্রফেটরা এসেছেন, প্রফেট হলেন যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, তাঁরাও এটাকেই ধরে রাখলেন। অনেক প্রফেট এলেন, তার

মধ্যে খুব নামকরা হলেন মোজেস। মোজেসের সঙ্গে ঈশ্বরের অনেক ট্রিটি হয়; জহুদি ধর্মে সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশর উপরে ট্রিটি আছে। এর কোন একটা যদি উল্লঙ্ঘন হয়, তাহলে কিন্তু পাপ হয়ে যাবে। যীশু আসার পর তিনি সব কিছু ভেঙে দিলেন। তিনি আনলেন –ঈশ্বরকে ভালবাস। ইসলামরা এসে দুটো জিনিসকেই নিলেন, কোরানে যে কথাগুলো বলা হয়ে সেগুলো অমান্য করা যাবে না, তার সঙ্গে আল্লাকে ভালবাসার কথা বলছেন, দুটোই এলো।

হিন্দুদের কিন্তু এই জিনিসটা নেই। আমাদের কাছে পাপকর্ম হল –আপনি একটা দিকে যাচ্ছেন, রাস্থা ছেড়ে আপনি অন্য দিকে চলে গেলেন, তার মানে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আপনার দেরী হবে। আমাদের কাছে পাপকর্ম যে কোন সময় শুধরে নেওয়া যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন, পাপকর্ম করলে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় –অমন কাজ আর করব না। এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা জুদাইজিমে হবে না, কারণ আপনি ভগবানের বিরুদ্ধে পাপ করেছেন কিনা। আদম আর ঈভকে বলা হল, তোমরা স্বর্গে থাক, কিন্তু এই আপেল গাছের ফল খাবে না। তারা আদেশ অমান্য করে আপেল খেল, তার মানে পাপ হয়ে গেল। কারণ ঈশ্বরের যে আইন, তার অমান্য করা হল। এই পাপের জন্য তাদের চিরদিনের জন্য স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। খ্রীশ্চানিটিতে এই রকম কোন দলিল নেই। খ্রীশ্চানরা আদম আর ঈভের ওই আদি পাপটাকে এখনও ধরে রেখে দিয়েছে, প্রত্যেক খ্রীশ্চান মনে করে you are born sinner। এই যে ঈশ্বর চান তুমি পূণ্য কর, পূণ্যকে কে পরিভাষিত করবে? ঠিক কোনটা, ভুল কোনটা, এগুলোকে কে পরিভাষিত করবে?

আমাদের নামকরা যে ধর্মশাস্ত্র আছে তার মধ্যে মহাভারত ও মনুস্মৃতি নামকরা, দুটো এক অপরের সঙ্গে মিশে আছে। কোনটা পাপ কোনটা পূণ্য বলা খুব মুশকিল, কারণ বিভিন্ন পরিস্থিতি বলে দেয় কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। যোগশাস্ত্রে বলছেন, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে আমাদের হিংসা করতে হয়, মিথ্যা কথা বলতে হয়। মহাভারত সেদিক থেকে অনেক বেশি লিবারাল। ঠাকুর বলছেন, যেটা করলে মনটা খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ। কারণ বাচ্চা বয়স থেকে অনেক কিছু শুনে শুনে আমাদের কোনটা পাপ, কোনটা পূণ্য, একটা ধারণা হয়ে যায়। দ্বিতীয় হল স্বার্থপরতা, স্বার্থের জন্য যদি কিছু করা হয়, সেটা পাপ। সেখানেও মহাভারত আমাদের অনেক লাইসেন্স দিয়ে রেখেছেন। যেমন নিজের যদি প্রাণ রক্ষা করতে হয়, সর্বস্ব হরণ হয়ে যাচ্ছে, সে-সব ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়। এগুলো ডায়নামিক জিনিস, সেভাবে এগুলোকে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এগুলো নিজেকে বার করে নিতে হয়। আপনি কোন একটা কিছু করলেন, করার পরে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক। দশ বছর পরে আপনার মনে হতে পারে আমি তখন ঠিক করিনি; তখন ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। ধর্মশাস্ত্রে এগুলো মেলে না।

আমার 'The Hindu Way'বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন বইটা কত খোলামেলা, কারণ মূল্যবোধ জিনিসটাকে কখনই এত টাইট করা যায় না। যে মূল্যবোধই থাকুক, যে ধর্মগ্রন্থেরই থাকুক, এটা বলা যে, সর্ব অবস্থায় এটা থাকবে –সমস্যা হয়ে যাবে। যেমন ধরুন অহিংসা। বৌদ্ধরা বলছেন, অহিংসা পরম ধর্ম; জৈনরা বলছেন, অহিংসা পরম ধর্ম আর মহাভারতও বলছে অহিংসা পরম ধর্ম। এখন দুষ্কৃতিরা এসে যদি বাড়ির মেয়েদের উপর হামলা করে; আপনি বন্দুক তুলবেন কি তুলবেন না? অবশ্যই তুলবেন। তাহলে তো কণ্ডিশান এসে গেল, জিনিসটা আর টাইট থাকল না। এই কণ্ডিশানের কথা বলতে গিয়ে হিন্দুরা আততায়ীর কথা নিয়ে আসে। গীতাতে আততায়ীর সংজ্ঞা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, পাঁচটি পরিস্থিতি দেওয়া আছে –এই পাঁচটি পরিস্থিতিতে হিংসা করা যায়। সেইজন্য ধর্মশাস্ত্র খুব জটিল হয়ে যায়।

আমি হিন্দু ধর্মের সব কিছুকে আমার ছোট চটি বই 'The Hindu Way' বইতে রেখে দিয়েছি। ঠাকুর, স্বামীজীকে পড়ে, বেদান্ত পড়ে আমার নিজের যা মনে হয়েছে, সেটাকেই খোলাখুলি

ভাবে বলে দিয়েছি। আপনার যদি মনে হয়, আমাকে এটা করতে হবে, আপনি করুন, দোষের কি আছে। যখন ওই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, মিটে গেল। আমরা ঈশ্বরের দাস না, আমরা ঈশ্বরের সন্তান না, আমরা নিজেদের ঈশ্বরের সঙ্গে এক দেখি। অন্য ধর্মের যে দলিল, যেখানে সব আইনে বাঁধা, আমরা আইনে বাঁধা নই; হদ্দ ঈশ্বরের সন্তান। আসলে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক; ঈশ্বরের সঙ্গে যে এক, তার আবার কিসে পাপ হবে! ঠাকুরও বলেছেন, তিনি স্বাধীন ইচ্ছা রেখে দিয়েছেন, তা নাহলে পাপ বাড়বে। কারণ সাধারণ মানুষ উল্টোপাল্টা করে বেড়ায়, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন পাপ হয় না।

ঠাকুর এটাই বলছেন, যাদের ঈশ্বর সৎ আর-সব অনিত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর-একরকম ভাব। পুরো জিনিসটাই সেখানে পাল্টে যায়, তখন এই একটি কথাই বেরিয়ে আসে –কিসের পাপ, কিসের পূণ্য। অর্থ হল, যখনই আমরা পাপ আর পূণ্য শব্দ ব্যবহার করি আমরা ওটাকে permanent senseএ নিই। হিন্দুরা যখন পাপ আর পূণ্য বলেন তখন ওনারা temporary senseএ বলেন। তাহলে হিন্দুদের পাপবোধ বলে কিছু নেই? অবশ্যই আছে, তবে সাময়িক। মনুস্মৃতিতে বলছেন, কেউ যদি দিনে দশ হাজার করে এক মাস গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে, সে তার সমস্ত জন্মজন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার মানেই পারমানেন্ট পাপ বলে কিছু না। এই কথা অন্যান ধর্মে কোন ভাবেই বলা যাবে না; পাপ মানেই তোমাকে নরকে যেতে হবে। নরকে গিয়ে তোমাকে পুড়তে হবে, তারপর গিয়ে যদি কিছু হয়।

হিন্দু ধর্মে এই সমস্যাটা নেই। তারা জানে যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। এরপর ঠাকুর আরও উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, এবারে যে কথাগুলো বলছেন, এগুলো আমাদের কথা না, ঠাকুর তাঁর নিজের অবস্থার কথা বলছেন।

যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না। এই জিনিসটাকে বোধগম্য করার জন্য যদি আমরা ঠাকুরকে না নিয়ে একজন সাধককে নিই, যে কোন পথের সাধক, আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা আগে আগে তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণের কথা বলেছি। তমোগুণ আলস্য, নিদ্রা বৃদ্ধি করে; রজোগুণের প্রভাবে মানুষ আমি আমি করে আর সত্ত্বগুণে মন শান্ত হয়ে যায়। যারা ঝগড়াঝাটি করে, নোংরা কথা বলে, এরা তমোগুণী; রজোগুণী বলবে, আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এক চড় মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে। সাধক হওয়া মানে প্রথমে তমোগুণকে ছাড়িয়ে রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পরে ধীরে ধীরে রজোগুণকেও নিয়ন্ত্রণ করে সত্ত্বগুণে উত্তীর্ণ হওয়া।

আমাকে যখনই কেউ প্রশ্ন করে, মহারাজ ধ্যান কিভাবে করব, জপ কিভাবে করব; আমি সবাইকে বলি, জীবনে আগে কিছু হয়ে দেখান, আগে শক্তি সঞ্চয় করুন। ভিতরে শক্তি নেই, আপনি কি করে জপধ্যান করবেন! ঠাকুর এদের জন্য একটাই শব্দটা ব্যবহার করতেন –ঢ্যামনা শালা। ঠাকুরের কাছে এত শিষ্য এসেছেন, এত লোক এসেছেন; তার মধ্যে নরেনকে দেখেই বলেছেন, এই হচ্ছে সিংহপুরুষ, কারণ শক্তি আছে। কোন কারণে আপনি যদি জপধ্যান করেন আর একটু যদি সফল হয়ে যান, বিশ্বাস করুন, আপনার ব্রেনের ফিউজ উড়ে যাবে। জীবনে আমি অনেককে দেখেছি, যাদের ফিউজ উড়ে গেছে, কারণ ভিতরে শক্তি নেই। তমোগুণকে অতিক্রম করে রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সোজা জোর করে যদি জপধ্যান করতে নেমে গেলে তার ফিউজ উড়ে যাবে, মাথাটা খারাপ হবেই। আর এমন কামিনী-কাঞ্চনে মন চলে যাবে যে, সেখান থেকে নিজেকে আর তুলে আনতে পারবে না। সেইজন্য আগে শক্তি দরকার। ভিতরে শক্তি অর্জন করে তারপর যখন সত্ত্বগুণে যায় আর রজোগুণের ভাবগুলিকে ফেলে দেয়, তখন পুরো জিনিসটা যেন সোনা হয়ে গেল। সেখান থেকে তাঁরা যখন পাপপূণ্যের পারে চলে যান, তখন ওই যে শেষ সংস্কার ছিল, শেষ সংস্কার মানে সত্ত্বগুণের সংস্কার থাকে; ফলে ওনার বেতালা পা পড়বে না। ওনাকে যদি ভুল কাজ করতে বলা হয়, ওনারা করতেই পারেবন না।

যদিও উদাহরণটা ঠিক না, পঞ্চ পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে যখন বিবাহ করে আনলেন, যুধিষ্ঠিরকে বলা হচ্ছে, এটা তো ঠিক না। যুধিষ্ঠির তখন বলছেন, দোষের কিছু নেই, এর আগে আগেও হয়েছে। দ্বিতীয় বলছেন, মায়ের আদেশ পালন করছি। তৃতীয় বলছেন, আমার বাণী থেকে কখন মিথ্যা কথা বেরোবে না। যুধিষ্ঠিরের মন এমন তৈরী হয়ে রয়েছে যে, স্বপ্নেও তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরোবে না। কাহিনী আদিতে দেখা যায়, অনেক সময় হিপনোটাইজ করে কিছু কিছু জিনিস করিয়ে নেয়। কিন্তু এমন কিছু কাজ যদি করতে বলেন, যেটা তার স্বভাবের বিপরীত, যেখানে নিজের চরিত্রকে লঙ্ঘন করা হয়ে যাবে, কোন মানুষকে খুন করা হচ্ছে, সেখানে সে ওই কাজ করবে না; হিপনোটিক অবস্থা, তাতেও তারা করবে না। এমনই গভীর ভাবে ওই ভাব বসে থাকে। হিপোনটাইজ অবস্থাতেও মানুষ যেমন ভুল কাজ করে না, ঠিক তেমনি সমাধিবান পুরুষ অজান্তাতেও কখন ভুল কাজ করবে না। কারণ সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত। এটাই হল ঠাকুরের কথায় বেতালে পা না পড়া।

আমাদের জীবনে সব সময় এটাই করতে হয়, বেতালে যেন পা না পড়ে। শচীন তেণ্ডুলকারের মত বড় বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যখন খেলে তখন বল দেখে মারে না, সহজাত প্রতিভায় খেলেন। পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে এমন সংস্কার নিয়ে এসেছেন, আর এমন ট্রেনিং নিয়ে রেখেছেন যে, বল যেমনি মাটিতে পড়ল সহজাত প্রতিভায় তিনি জানেন বল কোন দিকে যাচ্ছে আর সেই ভাবে ব্যাট চালান। আমাকে আপনাকে ওটা ভেবে ভেবে করতে হবে। কাসপরভের একটা ম্যাচের বর্ণনা পড়েছিলাম, কম্প্যুটারের সঙ্গে ওনাকে খেলানো হচ্ছিল, যতবার কম্প্যুটারের সঙ্গে খেলানো হয়েছে ততবার তিনি হারিয়ে দিয়েছেন। শুধু একবার ডিপ ব্লু বলে একটা কম্প্যুটার, যেটা প্রায় পাঁচশজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে তৈরী করেছিলেন, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু ছিল, তখন শুধু কাসপরভ হেরে গিয়েছিল। কিন্তু ওটাকে নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে যে, আদপে ওটাকে মেশিন বলা যায় কিনা। বলছেন, কম্প্যুটার প্রোগ্রাম করা, অথচ কাসপরভ সহজাত ভাবে বুঝে গেছেন দশটা দানের পরে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তিনি আগে থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মা আগে থেকে জানে ছেলে কি দুষ্টুমি করতে যাচ্ছে। ক্রিকেট প্লেয়াররা, ফুটবল প্লেয়াররা নিজের খেলাতে এমন মজে রয়েছে, আগে থেকেই জানে বল কোথায় যাবে। কি করে জানে? আমি একবার বলেছিলাম বলে একজন লিখলেন, ফুটবলে, হকি খেলায় প্লেয়ার দৌড়ে যাচ্ছে, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না, সহজাত ভাবে জানে আমার লোক সেখানে আছে। ঠিক তেমনি যাঁরা সমাধিবান, যাঁরা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, কখনই তাঁদের বেতালে পা পড়বে না।

হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না। যেটা বলছিলাম, যারা গ্রেট ক্রিকেট প্লেয়ার তারা হিসাব করে ব্যাট চালায় না, যার নামকরা ফুটবল প্লেয়ার তার হিসাব করে বল কিক করে না। আমি নিজে ছবি আঁকার ব্যাপারে একেবারে ব্লাইণ্ড অথচ আর্টিস্টরা চোখ বন্ধ করে একটা কিছু এঁকে দেন, দেখে অবাক লাগে। একই জিনিস ঠাকুর এখানে বলছেন, বেতালে পা পড়ে না। আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনে এখন অনেকেই যোগাযোগ করেন। এত ভাল ভাল শ্রোতারা আসেন, মাঝে মাঝে চিঠি দেন, খুব সুন্দর লাগে। মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায় আর ভাবি, ঠাকুরের দুটি কথা বলি বলেই না এনারা আমাদের সাথে জুড়েছেন।

সাধুপুরুষকে যদি তিরস্কার করেন, তিনি কোন প্রতিক্রিয়া করবেন না। আমি প্রতিক্রিয়া করব না, এটাও ওনারা ভাবনা চিন্তা করে করেন না, সহজাত ভাবেই ওনারা প্রতিক্রিয়া করবেন না। অথচ আমাদের কাছে নিয়মিত লম্বা লম্বা মেইল আসে, আমার বাড়িতে এ-রকম হচ্ছে, আমার এটা হচ্ছে, আমার অমুক মারা গেছে। মরে গেছে তো কি হল! কার বাড়িতে মৃত্যু আসে না! ভগবান বুদ্ধের কাছে এক বৃদ্ধা এসে কান্নাকাটি করছে, তার একমাত্র সন্তান মারা গেছে। ভগবান বুদ্ধ বললেন, যাও গ্রাম থেকে এক মুষ্টি সরষে নিয়ে এসো যার বাড়িতে কেউ মরেনি। অথচ আজ দেখে খারাপ লাগে, এই হিন্দু সমাজ কি অবস্থায় চলে গেছে। বাড়িতে কেউ মারা গেলে কত অশান্তি হয়, প্রচুর সমস্যা হয়ে যায়, বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির ছোট ছোট শিশুরা থাকে তাদের। কিন্তু তার জন্য ভেঙে পড়ার কি আছে।

মনের শান্তিটাকে কেন আপনি চলে যেতে দিচ্ছেন। আপনি যাই করুন মনের শান্তিটাকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয় যায় না।

মদ খাওয়া নিয়ে ঠাকুর কালীপ্রসন্নকে বলছেন, পা যেন না টলে। আপনি মদ খেতে চাইছেন, খান, কেউ নিষেধ করেছে না! আপনার একমাত্র সম্পদ হল আপনার মন। মনটা যেন কোন পরিস্থিতেই চঞ্চল না হয়। কামের প্রভাবে মন যেন চঞ্চল না হয়, ক্রোধের জন্য যেন চঞ্চল না হয়, লোভে পড়ে যেন চঞ্চল না হয়, মদের জন্য যেন চঞ্চল না হয়, ড্রাগসের জন্য যেন চঞ্চল না হয়, কোন কিছুর জন্যই যেন মন চঞ্চল না হয়। এই মনই আমাদের সবার একমাত্র সম্পত্তি। এই মনই আপনাকে জগতে গ্রেট করবে, এই মনই আপনাকে বড় লেখক বানাবে, আপনাকে দিয়ে সম্পত্তি অর্জন করাবে, এই মনই আপনাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবে। ওই অস্ত্রকে কখন হাত থেকে চলে যেতে দিতে নেই। ডাক্তারের গলায় স্টেথোস্কোপ, খুব দরকারি, কিন্তু আপনার কাছে এটা বেশি দরকারি।

মনই আপনার সব কিছু। মনটাকে আপনার এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, তা যে ফিল্ডেই হোক। যেমন মায়েরা রান্না করে যাচ্ছেন কিন্তু ঠিক হিসাব আছে কোনটাতে কতটুকু নুন দিতে হবে, কতটা লঙ্কা, কতটা মশলা দিতে হবে; সহজাত স্বভাবে সব দিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর ঢেকির আরেকটা উদাহরণ দেবেন। ঢেকির পার পড়ছে উঠছে, ধান ভাঙা হচ্ছে, তার মধ্যেই হাত চালিয়ে যাচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, সন্তানকে খাওয়াচ্ছে। আজকাল আর ঢেকি দেখা যায় না। আমরা ছোটবেলা দেখেছি। ভাগ্যিস এমন সময়ে আমরা জন্ম নিয়েছি, ঠাকুর যে যে জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন, প্রায় সব জিনিসই দেখা।

ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে-কর্ম তারা করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। শ্রীরামচন্দ্র লুকিয়ে বালিকে মেরেছেন সেটাও সৎকর্ম। ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন, মানুষ তখন চেষ্টা করে সাধুপুরুষ হয়ে যেতে পারেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে যেতে পারেন। এইসব মানুষরা যেটাই করেন সেটাই সৎকর্ম হয়ে যায়। কারণ বেতালায় এনাদের পা পড়বে না। **কিন্তু তারা জানে এ-কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি**।

যাদের চৈতন্য হয়েছে। চৈতন্য এখানে সমাধি না, ঈশ্বরের প্রতি চেতনা জেগেছে। **তারা পাপপূণ্যের পার**। **তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন**। এখানে ঠাকুর একটা গল্প বলছেন। একজন সাধু ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখেন এক জমিদার একটা লোককে খুব মারছে। সাধুটি বড় দয়ালু, তিনি জমিদারকে মারতে বারণ করলেন। খুব সুন্দর বলছেন –**জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করল যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল**।

অনেক আগেকার একটা ঘটনা আপনাদের বলেছিলাম। দেওঘরে দুজন মহারাজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওই দুজন মহারাজের মধ্যে একজন ছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। রাস্থায় একজন ভদ্রলোক মহারাজদের গালাগাল দিচ্ছে। মহারাজ বললেন, 'ভদ্রলোকের মত কথা বলতে পারেন না'? ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি কি বললেন? আমাকে অভদ্র বললেন'? বলেই মহারাজকে মারতে শুরু করেছে। ভূতেশানন্দজী আটকাতে গেছেন, তাঁকেও লোকটি পিটিয়ে দিয়েছে। কতটা পতিত হলে মানুষ এমন ব্যবহার করে! এখানেও জমিদার সাধুকে এমন মেরেছে যে অচৈতন্য হয়ে গেছে।

সাধুর মঠে খবর দেওয়া হল। সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। চেতনা ফেরবার জন্য সাধুর মুখে দুধ দেওয়া হয়েছে। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। **একজন বললে 'ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না? লোক চিনতে পারছে কিনা'। তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাস**

করলেন, 'মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে'? ঠাকুরের এই বর্ণনাগুলো খুব সুন্দর। **সাধু আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন'**। সাধুটির চৈতন্য হয়েছে।

ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না। মণিলাল সব শুনে যাচ্ছেন। কথায় কথায় যারা বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুর দেখছেন; এ-রকম মার যখন খাবেন তখনও কি বলতে পারবেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে; কেঁদে না, স্বাভাবিক ভাবে? যদি না পারেন, ঢংবাজীগুলো বন্ধ করুন। রজোগুণ বাড়ান, রজোগুণ বাড়লে আস্তে আস্তে চৈতন্য হবে। তা নাহলে ঠাকুর যেমন বলছেন, নিজেকে ঠকায়, পরকে ঠকায়।

মণিলাল –আজ্ঞে আপনি যে-কথা বললেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা! ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচরকম কথা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কোনও বাড়িতে থাকেন?

মণিলাল –একজনের বাড়িতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কত বয়স?

মণিলাল –পঞ্চান্ন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আর কিছু কথা হল?

মণিলাল –আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি বললেন, 'নাম কর, রাম রাম বোলো'।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এ বেশ কথা।

ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা যে কথাগুলো বলতেন, অনেক সময় হয়ত সব কথা ভুল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর যেটা শেষ কথা, সেটাকে সামনে রেখে দিতেন, আর তা না হলে ওখানেই আটকে থাকবে। এখানে 'নাম কর রাম রাম বোলো' এটাকে নিয়ে আমি একবার বলেছিলাম। অমরনাথ দর্শনে যাওয়ার সময় আমি বৈষ্ণোদেবীর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি যাঁদের কাছে ছিলাম, আমাকে বললেন এখানে একজন খুব নামকরা সুফি আছেন। আমি দেখা করতে গিয়ে তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম, ভক্তি কিসে হয়? উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'জমিদারি যেভাবে অর্জন করতে হয়, সেইভাবে খেটে ভক্তি অর্জন করতে হয়'। মূল কথা, ভক্তির জন্য খাটতে হয়। কোন দিন ভুললাম না মুসলমান ফকিরের কথা –জমিদারি যেভাবে অর্জন করতে হয়, সেইভাবে খেটে ভক্তি অর্জন করতে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
গৃহস্থ ও কর্মযোগ

ঠাকুরবাড়ির পূজা শেষ হয়েছে। ঠাকুর আহারাদির পর ঘরে একটু বিশ্রাম করছেন। রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীষ্মকালে বড় জলকষ্ট। ঠাকুর মণি মল্লিককে সেই কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি) –দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তাহলে কত লোকের উপকার হয়। ঠাকুর যে সব সময় ঈশ্বরের ভাবে থাকছেন, তা না; তিনিও সব সময় চাইতেন আধ্যাত্মিক মঙ্গলেরা সাথে সাথে যেন লোকেদের ঐহিক মঙ্গলও হয়। কিন্তু সেবা করাটাই যে শেষ কথা, তা না।

(সহাস্যে) তোমার তো অনেক অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবী। (*ঠাকুর ও ভক্তগণের হাস্য*) ঠাকুরের এসব কথা নিয়ে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করবেন, ঠাকুর কেন এমন জাতপাত নিয়ে কথা বললেন? অবতার যখন আসেন, তিনি তৎকালীন যে সমাজ ব্যবস্থা, এটাকে ভেঙে দেন না। গীতায় ভগবান বলছেন, *চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং*, যেটা আছে, যে ব্যবস্থা চলছে, সেই ব্যবস্থাকে অবতার কখনই ভেঙে দেবেন না। কিন্তু ভগবানের ঠিক ঠিক যে আধ্যাত্মিক শক্তির অবতার হয়ে যখন আসেন, তাতে অনেক আবর্জনা নিজে থেকেই খসে পড়ে যায়।

মাস্টারমশাই মণিলাল মল্লিকের অনেক বর্ণনা করছেন। বলছেন, **মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে। সমস্ত গাড়িভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না**। এ-রকম হয়, বেশি টাকা-পয়সা হয়ে গেলে অনেক সময় লোকেরা হয় একটু পয়সা দেখাতে শুরু করে, আর তা না হলে কৃপণ হয়ে যায়।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ-কথা ও-কথার পর, কথার পিঠে বলিলেন, 'মহাশয় পুষ্করিণী কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি-ফেলী বলা কেন'? সন্ন্যাসী ভাইদের মধ্যে দেখেছি, অনেক সময় কোন মহারাজ অন্য কোন মহারাজকে মজা করে কিছু কথা বললেন, সেই মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে এই কথা অবশ্যই বলবেন –আবার তেলি-ফেলী বলা কেন। হয়ত বললেন, 'এই, তুমি এই কাজটা করে দেবে? তা তুমি তো করবে না জানি, কারণ তুমি তো একটা ফাঁকিবাজ'। যাঁকে বলা হল, তিনি বলবেন, 'মহারাজ আবার তেলি-ফেলী বলা কেন, কাজটা করে দিতে বললেই পারেন'।

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন। মাস্টারমশাই প্রথমে দেখালেন, ঠাকুর কিভাবে সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধারণ কথা বলছেন। কথাগুলো বিশেষ কোন অর্থে বলছেন না, শুধু একটা প্রবাদ বললেন মাত্র, তাতেই কেমন খোঁচা লেগে গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ – প্রেততত্ত্ব

কলকাতা থেকে কয়েকটি পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর সহাস্য বদন, বালকমূর্তি। ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আনন্দে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) –তোমরা 'প্যাম' 'প্যাম' কর, কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? জাগতিক লোকেদের প্রেম জিনিসটাকে ঠাকুর যেন বিদ্রুপের ভঙ্গিতে প্যাম্ প্যাম্ বলছেন। সাধারণ লোকেরা অবশ্য প্রেমকে 'প্যাম্' বলে, আত্মাকে 'আত্তা' বলে। স্বামীজী খুব রেগে যেতেন, তোরা আত্তা আত্তা বলিস কেন, আত্মা বলতে পারিস না? ঠাকুরও এখানে 'প্রেম' শব্দকে বিদ্রুপের সুরে 'প্যাম' বলছেন। তার সাথে বলছেন –**চৈতন্যদেবের 'প্রেম' হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম –জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে"।**

দ্বিতীয় লক্ষণ –নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। জীবনে যদি সত্যিকারের কাউকে প্রেম করে থাকেন, যেমন মা সন্তানকে ভালবাসে, সেখানে এই লক্ষণগুলি অনেকটা বোঝা যায়। মা সব সময় সন্তানের চিন্তাতেই থাকেন আর নিজের যে দেহ, নিজের যে কষ্ট ওসব এক পাশে পড়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরীয় প্রেম পুরো আলাদা জিনিস। এই যে ব্রাহ্মসমাজের ভক্তরা এসেছেন, মুখের কথা বলে যাচ্ছেন; ইদানিং কালে আমাদের ভক্তদেরও ঠিক একই অবস্থা দেখি। কোথাও দুটি কথা শুনেছেন বা পড়েছেন, মুখে কথাগুলো বলে

যাচ্ছেন। কিন্তু একটু কোন চেষ্টা নেই, মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। আমার পরিচিতদের আমি বলি, এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যখন সারাদিন থাকবেন, তখন এই প্রেম অঙ্কুরিত হবে, তার আগে পর্যন্ত হয় না।

ঈশ্বরলাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্ছে তার আর ঈশ্বরলাভের দেরি নাই।

আপনাদের মনেও অনেক সময় প্রশ্ন আসে, কবে আমার ঈশ্বরদর্শন হবে। এই ধরণের বোকা বোকা প্রশ্ন অনেক সময়েই লোকেরা আমাদের করে থাকে, কাজের প্রশ্ন একটাও করে না। খুব সাধারণ ভাবে বলি, আজকের দিনে তিনটে ভাষা মিলিয়ে ইউটিউবে আমাদের প্রায় এগারশো খানা ভিডিও আছে। সবটা আপনার দেখার দরকার নেই। যে কোন একটা প্লে-লিস্ট ধরুন, চণ্ডী হোক, ভাগবত হোক, মনুস্মৃতি হোক, রামায়ণ হোক, মহাভারত হোক; দেখবেন আপনার মনে যত প্রশ্ন উঠছে সব প্রশ্নের উত্তর ওই লেকচারে পেয়ে যাবেন; সব রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। মানুষ দেখবে না, খাটবে না, অথচ সহজে উত্তর চাই। সহজে উত্তর পেলে সহজে হারিয়েও যায়।

খুব নামকরা একটা কথা আছে। জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে হয়, বলেন –*চিরচিরা চিরবেগা বেগচিরা বেগবেগা*; কিছু জিনিস ধীরে ধীরে আসে, হারায় ধীরে ধীরে, সেটা হল বিদ্যা। আমাদের এটাই হয়, ধীরে ধীরে আসে, ধীরে ধীরে হারায়। যারা খুব ট্যালেন্টেড তাদের খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যাটা আসে এবং চিরদিন থাকে। পরীক্ষার দুদিন আগে থেকে মুখস্ত করে আমরা যে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখি, পরীক্ষা দেওয়ার পর ভুলে গেলাম; এটা হল *বেগবেগা*। দ্রুত আমরা শিখি, দ্রুত হারিয়ে ফেলি। আরও আছে, অনেক কষ্টে বিদ্যাটা পেল, দুদিন পরে ভুলে গেল। ধর্মজ্ঞান *চিরচিরার* মধ্যে হয়। আমি যখন নূতন জয়েন করেছিলাম, তখন পূজনীয় সুহিতানন্দজী মহারাজ বারবার আমাকে এটা বলতেন। বিদ্যা সব সময় *চিরচিরা*, ধীরে ধীরে যাতে অনেকদিন থাকে। *চিরবেগা* হলে সর্বনাশ, অনেকদিন ধরে পড়ছেন, একদিকে পড়ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। আর *বেগবেগা* তো অতি জঘন্য, ধর্ম জীবন সর্বনাশ করে দেয়। আচ্ছা মহারাজ ওটা কি, আচ্ছা মহারাজ এটা কি; ঠাকুরকে যেমন একজনবলছেন, মহাশয়, আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন।

অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন, সত্যকথা –এই সব। ঠাকুর এখানে যে কটির কথা বলছেন, সব কটাই ঈশ্বরকেন্দ্রিত, সাধুকেন্দ্রিত। উত্তরাখণ্ডে একজন সাধুকে দেখেছিলাম, কোন সাধুর উপর রেগে গেলে বলত, তোমার গেরুয়া খসে যাবে। পরে দেখলাম সাধুটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোন সাধুকে এই ভাষায় কেউ কথা বলে, তাও নিজে একজন সাধু হয়ে? আমাদের কত রকম কথা শুনতে হয়, ঢপ সাধু, ভণ্ড সাধু। ঠাকুর বলছেন, অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি; সাধুদের প্রতি আপনার সম্মান যদি না হয়ে থাকে, সাধুদের সেবা করার ইচ্ছা যদি না হয়ে থাকে, তার মানে আপনার এখনও অনেক দেরী আছে।

এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নাই। এই সব গুণের ঐশ্বর্য মানে, মন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এই সত্ত্বগুণের মধ্যে শুধু যে বিদ্যার প্রতি আগ্রহ তা না, আধ্যাত্মিক বিদ্যার প্রতি আগ্রহ, সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গ করার ইচ্ছা। যে বিজ্ঞান পড়তে চায়, সে সেই বিজ্ঞানীদের সম্মান করে। তেমনি যারা ধর্ম জীবনে যায়, সাধুদের তারা ভালবাসে।

এরপর ঠাকুর বলছেন, **বাবু কোন খানসামার বড়ি যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়! প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজে সতরঞ্চি, গুড়গুড়ি এই সব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। কারণ তিনি জানেন, খানসামা এত কিছু জোগাড় করতে পারবে না। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলে**।

এই সৎগুণের যখন উদয় হয়, তখন বোঝা যায়, তিনি এবার আসছেন, তাঁর ঈশ্বরদর্শন হতে আর বেশি দেরী নেই। সৎগুণের উদয় যদি না হয়ে থাকে, বুঝতে হবে তাঁর আসার দেরী আছে। এই হল ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ। আপনার বাড়িতে যদি প্রধানমন্ত্রী আসেন, আগে থেকে সিকিউরিটির লোকেদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। তারপর একদিন আপনি শুনতে পাবেন, সাইরেন বাজানো গাড়ি আসছে। যেমন যেমন তাঁর আসার সময় এগিয়ে আসবে, তেমন তেমন তাঁর ঐশ্বর্য বোঝা যাবে।

ঈশ্বরকে জানতে গেলে ঈশ্বরের যে গুণগুলো আছে, সেগুলো নিজের মধ্যে আসতে হয়। বড় হাওয়াই জাহাজ ছোট এ্যারোড্রামে নামতে পারে না। আঠারো চাকা, কুড়ি চাকার বড় বড় যে গাড়ি হয় সেগুলো ন্যাশানাল হাইওয়েতেই চলতে পারে, শহরের ভিতরের ছোট রাস্থায় চলতে পারবে না। রাস্থায় ভিড়ভাড়, যান চলাচল বেশি থাকলেও চলতে পারবে না, চলার জন্য আগে থেকে সব পরিষ্কার করে দিতে হয়। ঈশ্বর হলেন হাজার চাকার গাড়ি, চলার জন্য রাস্থাটাও সেই রকম চওড়া হতে হবে আর পরিষ্কার থাকতে হবে। যাঁরা হাওয়াই জাহাজে চেপেছেন, তাঁরা জানেন রানওয়ের উপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ কত গতিতে দৌড়ায়। সেই সময় রাস্থায় যদি ছোট্ট কোন জিনিস থাকে দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। পাখির সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা হওয়ার কথাও শোনা যায়।

মনে যদি ঈশ্বরকে নামাতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের গুণগুলিকে আগে নিজের মধ্যে নামাতে হবে। এগুলো কিভাবে আসে, ধীরে ধীরে আমরা দেখব। ধর্মের পথে যাঁরা এগোতে চান, প্রথমে তাঁদের ছটফটানিটা বন্ধ করতে হয়। যাঁদের মন অসংসস্কৃত, মনের উপর যাঁদের নিয়ন্ত্রণ নেই, তাঁরা মনে করেন ধর্ম পথে এলে তাঁরা সবাই ভাল হয়ে যাবেন। ঈশ্বর হলেন পরশমণি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সবটাই দেন, অধৈর্য হওয়ার কোন দরকার নেই। শুধু মনে রাখবেন, ঈশ্বরের যে গুণগুলো আপনার মনে আসে; যেমন ধরুন, যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি ঠাকুরের দর্শন চান, কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ঠাকুর বলতে কি? সেটাই তো ঠাকুরের গুণ হবে। একবারও কি ভেবেছেন?

যদি আপনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরমব্রহ্ম। তাহলে ঠাকুরকে জানতে হলে আপনাকেও পরমব্রহ্ম হতে হবে। কাজী নজরুল ইসলামের একটা খুব সুন্দর গান আছে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ পরমযোগী, এই কথাটা বলে যাচ্ছেন। ঠাকুরের যে কোন গুণ যদি নিই, যেমন শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা; আপনার জীবনে আপনিও যদি ত্যাগের বাদশা হন, তবে কিন্তু আপনি আশা করতে পারেন আপনার জীবনে ঠাকুরের আবির্ভাব হবে। ঠাকুর বলছেন, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে, গোঁফ চাপরাচ্ছে; এভাবে ঈশ্বরদর্শন হয় না।

যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত সহজ উপায় বলছি। কাগজ-কলম নিয়ে তিনটি বা দুটি গুণের কথা লিখুন, যে গুণগুলি আপনার মনে হয় ঠাকুরের এই গুণগুলো ছিল। এবার এই দুটি গুণকে আপনার জীবনে আনুন। তবেই কিন্তু আপনার উপর ঈশ্বরীয় কৃপা বর্ষিত হবে। *শিবো ভূত্বা শিবং ভজেৎ*, শিবের যদি সাধনা করতে হয়, আপনাকে শিব হতে হবে। ঈশ্বরদর্শন সহজ না কঠিন, এগুলো পরের কথা। কিন্তু প্রথম যেটা প্রয়োজনী কথা, তা হল, বলা হয় যে যেমন ভাব তেমন লাভ; কিন্তু এখানে উল্টোটা হবে –যেমন আপনি লাভ চান তেমন আপনাকে ভাব আনতে হয়। আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, আপনি শিবের ভক্ত; আপনি কাগজে লিখুন, আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণ মানে এই, যে কোন দুটি পয়েন্ট লিখুন। গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম করেছিলেন, আপনি কি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম চান? রাসলীলায় প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে এক এক কৃষ্ণ। আপনি আগে ওই ক্ষমতাটা নিজের ভিতর অর্জন করুন। যাদের আপনি ভালবাসবেন, একসাথে আপনি সবারই সাথে থাকতে পারবেন।

আমি দীন হীন কাঙালী, এ-জিনিস আমাদের কোন শাস্ত্রে নেই। বেদে যান, উপনিষদে যান কোথাও নিজেকে দীন-হীন কাঙাল ভাবতে বলা হয় না। পরে পরে বৈষ্ণবরা এগুলোকে আমদানি করেছেন। শরণাগতির কথা যখন বলেন, তখন সেখানে মন-প্রাণ সবটাই ঈশ্বরে সমর্পিত করছেন। ঠাকুর

বলছেন, বাবু কোন খানসামার বাড়ি যেবেন, বাবু খানসামার বাড়িতে অনেক কিছু পাঠিয়ে দেয়, তখন বোঝা যায়, এখানে বাবু আসবেন। যখন কারুর ব্যক্তিত্বে এই গুণগুলির প্রকাশ হতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হয় তিনি এবার ভক্তির জন্য প্রস্তুত। এরপর ঈশ্বরদর্শন কবে হবে সেটা তিনিই জানবেন, আমরা তা জানি না।

একজন ভক্ত –আজ্ঞে, আগে বিচার করে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে হয়?

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেকেই বিচিত্র সব মন্তব্য করেন। তবে বেশির ভাগ মন্তব্যকারী নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞানতাটাই বেশি দেখিয়ে ফেলেন। যতক্ষণ ভিতরে জ্ঞান টগবগ না করে, কোন কিছু প্রকাশ করতে নেই। কারণ ওতে অনেক খ্যাঁচমোচ থেকে যায়, লোকেরা শুনে হাসে। গীতাতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু গীতার এই কথাটা ভাল করে বোঝা দরকার। এখান থেকে আমি বলবার চেষ্টা করব, ঈশ্বরের পথে মানুষ কিভাবে এগোন, ঈশ্বরদর্শন কার হয়, ঈশ্বরদর্শন কিভাবে হয়, সাধনভজন কিভাবে হয়, খুব ছোট্ট করে কয়েকটা কথা বলছি, তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে।

যাঁরাই ঈশ্বরের ভক্তি চান, আত্মজ্ঞান চান; তাতে প্রথমটা হল আপনাকে চাইতে হবে। আপনি কি সত্যিই ভক্তি চান, আপনি কি সত্যিই আত্মজ্ঞানী হতে চান, এটা হল প্রথম। দ্বিতীয় আপনি হয়ত বলবেন, 'আমি চাই না, কারণ আমি নিজেকে যখন ভাল করে বিচার করি, তখন দেখি অজান্তায় আমার এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে'। ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, ভোগেচ্ছাকে প্রশমিত করার জন্য আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যেটা, সেটা হল ঈশ্বরীয় ভাব ভিতরে টগবগ করা চাই। সকাল থেকে রাত, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরীয় ভাবে থাকতে হবে। এটাকে আস্তে আস্তে আরোপ করতে হয়, ভিতরে ঢোকাতে হয়। আপনি যেখানে থাকছেন, বাড়িতে ঠাকুরের ছবি লাগান। শোলার আতা দেখলে আসল আতার কথা মনে পড়ে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কি হয়, আগেকার দিনে বিয়ে যখন হত তখন স্বামী স্ত্রীকে জানতা না, স্ত্রী স্বামীকে জানত না; একসাথে থাকতে থাকতে সম্পর্কটা নিবিড় হয়, ঈশ্বরভক্তি তাই। ঈশ্বরের ভাবে থাকতে থাকতে ভক্তি গাঢ় হয়; এর কোন শর্টকাট নেই।

অনেক আগে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, সেই মহারাজের কথা আরেকজন মহারাজের কাছে আমি শুনেছিলাম। উনি বলতেন, 'ভগবান লাভ করা ছাড় বাপু, ঠাকুরের কৃপায় সন্ন্যাসী হয়ে থেকে গেছি'। আমাদের নিজেদের মধ্যে এর একটা expression আছে, সেটা আর বলছি না। উনি বলতে চাইছেন যে, কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত না হয়ে সন্ন্যাসী হতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। বাইরের লোকে মনে করে সাধুসন্ন্যাসী মানে বিরাট কিছু। বেলুড় মঠে টিকে থাকা এটাই আমার সাধনা, ঠাকুরকে ধরে আছি কিনা। আপনি বলবেন, আপনি সন্ন্যাসী, আমি তো সংসারে আছি, কি করে করব? সংসারেও একই কথা, ঠাকুরকে ধরে রাখা। যখন ভাল কিছু হচ্ছে, ঠাকুরকে ধরে রাখা; খারাপ কিছু হচ্ছে, ঠাকুরকে ধরে রাখা। বিপদের পর বিপদ হচ্ছে, ঠাকুরকে ধরে রাখা। আর ভাল-মন্দ এই জিনিসটাকে আস্তে আস্তে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া, ওটার সঙ্গে ঠাকুরের কোন সম্পর্ক নেই।

আমাদের একটা ভুল ধারণা যে, ভক্ত হলে শরীর ভাল থাকবে, ভক্ত হলে টাকা-পয়সা হবে, জীবনে শান্তি আসবে। একেবারেই তা না। ঠাকুর বারবার বলছেন, বাচ্চা ছেলে বলে আমার মাকে চাই। এই ভাবটাকে সৃষ্টি করতে হয়, নিজে থেকে এই ভাব আসে না। আপনি যদি মনে করেন তিনি কৃপা করে আপনার মনে এই ভাব দেবেন, ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে। কারণ সবটাই তাঁর। আপনি যদি সংসারে থাকেন, সেটাও তাঁর; আপনি যদি আগামীকাল অসুর-দৈত্য আদি হয়ে যান, সেটাও তাঁর; আপনি যদি কাল সাধুপুরুষ হয়ে যান, সেটাও তাঁর; কোনটাতেই তাঁর কিছু আসে যায় না। আপনাকেই ভাবতে হবে আপনি কি চান। যেটা চান, সেই ভাবটাকে আপনাকে ভিতরে ঢোকাতে হবে। আর অপরকে

দেখে, অপরের কথা শুনে সেটাকে নিয়ে নাচানাচি করা, একেবারেই উচিত না। দ্বিতীয় হল, যেখান থেকে ইষ্টমন্ত্র নিয়েছেন, গুরু যেমনটি বলে দিয়েছেন, আপনার সাধনপথ পুরোপুরি তেমনটি হবে; তার বাইরে এক চুলও যাওয়া যাবে না। ব্রাহ্মভক্তরা নিরাকার সাধন করতেন, কিন্তু বলার সময় বলতেন – আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলিতে। একদিকে নিরাকার নিরাকার করে যাচ্ছেন, তার সাথে চরণের ধূলিটাও খুঁজছেন। নিরাকারের কোথা থেকে পা এসে গেল, ওনারাই বলতে পারবেন। এখানে প্রশ্নকর্তা কোথাও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কথা শুনেছেন, সেটাকে নিয়ে এখন প্রশ্ন করছেন। এনারা হলেন non-serious seekers। ঠাকুরের কাছে এসেছেন যখন একটু কথাবার্তাও তো করতে হবে। ঠাকুর জানেন, এগুলো কথা বলার জন্য কথা বলা, এদের তো হবে না, তাই বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ও এক পথ আছে। ঠাকুরের সব পথই দেখা আছে। আজকে আমরা যখন কথামৃত পড়ছি, ভাবছি আজ থেকে পাঁচশ হাজার বছর পরে কথামৃতের কি সাংঘাতিক দাম হবে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। পুরো হিন্দু ধর্মে যাবতীয় যত সাধনা হয়েছে, পুরো জিনিসটাকে কথামৃতে তুলে রাখা হয়েছে। বলছেন –**বিচারপথ**। আগে আগে আমরা বলেছি কিভাবে বিচারপথের সাধকরা নেতি নেতি করে ব্রহ্মের দিকে এগিয়ে যান। বিচারপথ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য। কয়েকজন বলতে সাধক যাঁরা, তাঁদের কয়েকজন। ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয় যদি জগতের দিকে যায় সেখানে অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করে হবে।

আল গাজালি একজন খুব নামকরা সুফি সাধক ছিলেন। ওনাকে প্রায়ই রাজারা জেলে পুরে রেখে দিতেন। উনি যখন জেলে থাকতেন, শুধু ধ্যান করতেন। জেলের বাইরে যখন থাকতেন, বাইরে থেকে বিভিন্ন বই সংগ্রহ করতেন। সারাক্ষণ বই পড়তেন আর বই লেখালেখি করতেন। আজকে সুফি ট্রাডিশানের অনেক কিছু যে আমরা জানতে পারছি, শুধু আল গাজালির জন্য। ধর্মের বই লিখতে গিয়েই যদি এত ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, ইন্দ্রিয় জগতে থাকলে কি দুরবস্থা হবে ভেবে দেখুন। উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, থাকতেই দেবে না। ভক্তিপথে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই হয়, চেষ্টা করে করতে হয় না। যেটারই চেষ্টা করবেন, সেটার প্রতি মন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া করে। কক্ষণ কোন কিছু জোর করে করতে যাবেন না, সবটাই যেন স্বাভাবিক হয়। জোর করে কোন কিছু করতে নেই। জপধ্যান পর্যন্ত জোর করে করবেন না। জপধ্যান যদি না করতে পারেন, ঠাকুর বলছেন, হাততালি দিয়ে হরিনাম কর। সেখান থেকে ধীরে ধীরে মন ধর্মকে নিতে শুরু করবে।

আপনি বলবেন, আমার গুরু বলে দিয়েছেন সকাল বিকাল একশ আট জপ করতে। না হয়, একবেলা তাই করুন। কিছু দিন পরে দেখবেন মন রিয়েক্ট করবে, যতটা এগিয়েছিলেন রিয়েক্ট করে আবার পিছনের দিকে ঠেলে দেবে। তাতেও কোন অসুবিধা নেই; যতটা আপনি গিয়েছিলেন, আজ হোক কাল হোক আবার ততটাই যাবেন। *যোগো হি প্রভাবাপ্যয়ৌ*, কঠোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন, যোগ ওঠানামা করে। যতক্ষণ ঈশ্বরজ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ ওঠানামাটা চলতে থাকবে। কিন্তু সব থেকে বিপজ্জনক হল, যদি জোর করে জপধ্যান করতে যান, জোর করে যদি ত্যাগ করতে যান, মন ভয়ঙ্কর ভাবে রিয়েক্ট করবে; আপনাকে অত্যন্ত লোভী, কামী বানিয়ে দেবে। মাথাটা বিগড়ে দেবে, পুরো একজন ধর্মবিদ্বেষী বানিয়ে দেবে। যেটা স্বাভাবিক সেটাই ভাল। তবে ছেড়ে দেওয়া চলবে না, বলতে হবে, মন জপ করবি না? ঠিক আছে, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাক। তাতেও মন ছটফট করছে? তাহলে যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম রয়েছে, সেখানে চল, ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি। মনে কিছুক্ষণ এই চিন্তাটা থাকবে, ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি। যার জন্য সন্ন্যাসীরা যাঁরা হন, তাঁদের উন্নতির গতিটা খুব মন্থর। লোকেরা মনে করে, এই দীক্ষা নিলাম, কাল থেকেই আমার ভাবসমাধি হবে। এটা একটা লম্বা সংগ্রাম।

ঠাকুর বলছেন, **নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনি লাগবে**। এটা নিজে থেকেই হয় ঠিকই, একটা তো বয়সের সাথে আলুনি লাগাটা এসে যায়, কিন্তু তখন খিটখিটানিটা বেড়ে যায়।

যেদিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে? ঠাকুর এটা উদাহরণ দিচ্ছেন। যতই কামুক হোক, ভয়ঙ্কর শোক যদি এসে পড়ে, তখন আর সুখ-ভোগ কি করে হবে, সম্ভবই না। আপনি বলবেন, মদ খায় তো। মদ তো দুঃখেই খায়, সেখানে সে সুখবোধ করছে না। যেটা বলা হল, এখান থেকে শুরু হয়, যেখানে ভক্ত তাঁর মনের কথা বলছেন।

একজন ভক্ত –তাঁকে ভালবাসতে পারছি কই?

আগেও এই গল্পটা বলেছিলাম, পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে একবার আমি প্রণাম করতে গেছি। তখন আমি ব্রহ্মচারী। মহারাজকে এই রকম বোকা বোকা প্রশ্ন করলাম। এই পথে প্রথমের দিকে যারা আসে, তাদের এই ধরণের বোকা বোকা প্রশ্ন থাকে, আমারও ছিল। ভূতেশানন্দজী মহারাজ তখন খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। এক জায়গায় হরিনাম হচ্ছে, হরিনামের সাথে সবারই অশ্রুপাত হচ্ছে। একটি ইয়ং ছেলেও হরিনাম শুনছে, কিন্তু অন্যদের মত তার কোন অনুভূতি হচ্ছিল না। তখন সে রেগে বাড়ির ভিতরে রান্নাঘর থেকে লঙ্কার গুড়ো নিয়ে নিজের চোখে ঘষে দিল –চোখ তুমি জল বার করছ না, নাও এখন এভাবেই জল বার কর। আমি ঘটনাটা শোনার পর মহারাজকে স্বাভাবিক ভাবে বললাম; 'এ আবার কি ধরণের ভক্তি, চোখের জলটা তো কৃত্রিম'। মহারাজ বললেন, 'তুমি এটা এভাবে কেন দেখছ, ওর ব্যাকুলতাটা দেখ। তার আফশোষ হচ্ছে, আমি এমনই অভাগা যে, কৃষ্ণ নামে চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বেরোচ্ছে না! ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি, বলে লঙ্কা ঘষে দিল'। মহারাজ ঠিকই বললেন, আজকে তার হয়ত জল বেরোচ্ছে না। অভিনেতারা যেমন চোখে গ্লিসারিন দিয়ে চোখের জল বার করে দর্শকদের দেখায়। কিন্তু ছেলেটি এখানে অভিনয় করছে না। সে চাইছে বাকিদের যেমন কৃষ্ণ নাম শুনে ভাব হয়েছে, সেটা যেন স্বাভাবিক ভাবে তারও হয়।

আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, খুব হিউমারাস, ওনাকে আমি খুব ভালবাসতাম। তখন আমি জয়েন করব করব, কুড়ি বছর বয়স তখন। ওনাকে আমি কিউরিসিটি নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মহারাজ! আপনি কিভাবে সন্ন্যাসী হলেন'? 'আরে, আমি দেখলাম এতজন সন্ন্যাসী হচ্ছেন, কেন এনারা সব ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হচ্ছেন, এটা দেখার জন্য আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম'। মজা করে উত্তর দিলেন। ওই ভাব, এতজন সন্ন্যাসী, তাঁদের ভাব আপনার উপরেও আসতে শুরু হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আপনিও ওই রকম হয়ে যাচ্ছেন। ভাব আরোপ করতে শুরু করেছেন কিনা। আমার খুব প্রিয় প্রশ্ন, যখনই সুযোগ পাই আমি এই প্রশ্ন করি। আপনি কি জীবনে কাউকে ভালবেসেছেন? প্রথম কথাতেই বলবে, ঠাকুরকে ভালবাসি। ঠাকুরের থেকে একটু নিচে নামুন, ঠাকুরকে আমি কি বুঝব। যে মানুষকে ভালবাসছেন, তার কোন গুণটাকে ভালবাসছেন? সেই গুণটা নিজের ভিতরে নিতে শুরু করুন।

উপমন্যু চ্যাটার্জির নাম আপনারা অনেকে শুনে থাকবেন। সিনিয়র আইএএস অফিসার, এখন রিটায়ার করে গেছেন। অনেক বই লিখেছেন। ওনার বই বেরোবার পর বলে ইংলিশ সাহিত্যে ইণ্ডিয়ান ইংলিশ রাইটিং খুব ফেমাস হয়ে গেল। আমার খুব ভাল বন্ধু। অনেক আগেকার কথা, ওনার খুব সুন্দর একটা কথা মনে পড়ছে। ওনার ছোট মেয়ে তখন তিন-চার বছরের। মেয়ে বুঝে গেছে বাবা বই লেখে। বাবাকে খুশি করার জন্য বাবাকে দেখলেই একটা বই বার করে পড়ার নকল করতে শুরু করে বা হাতে একটা কলম নিয়ে খাতায় লেখার নকল করতে শুরু করে। মেয়েটির ভাব –আমার বাবা লেখক, আমি তার বই পড়ছি। আপনি আগে ঠিক করুন, কাউকে কি আপনি সত্যিকারের ভালবাসেন? প্রজাতন্ত্র দিবসে, পনেরই আগস্ট এলে স্কুলে, কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ভাষণ দেওয়া হয়, তোমরা

নেতাজীকে ভালবাস, তোমরা অমুককে ভালবাস। বক্তারা অত দূরে কেন যান আমি বুঝতে পারিনা। একটু কাছের লোকের কাছে নামুন। নেতাজীর আদর্শ! নেতাজীর কোন গুণটা আপনার ভিতরে আছে? ক্ষুদিরাম বোসের কোন গুণটা আপনার ভিতরে আছে? নিজেকে দেখুন, আপনি কাকে ভালবাসেন? তার কি গুণ আপনি অর্জন করেছেন? ভেবে দেখুন সেই গুণটা আপনার ভিতরে কিভাবে আসবে, জীবনে এগোনর এটাই পথ।

এখানে বলছেন, তাঁকে ভালবাসতে পারছি কই? সত্যিই তো, যাঁকে দেখেনি, কোন অনুভব নেই, কি করে তাঁকে ভালবাসবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা –এ-সব পালিয়ে যায়।

এখানে অতি সাধারণ একটা কথা বলার আছে। অন্তরসত্তা আর বহিঃসত্তা, উপনিষদে এটাকে বলছে, প্রত্যগাত্মন্ আর পরাগাত্মন্। প্রত্যগাত্মন্ ভিতরে আর পরাগাত্মন্ বাইরে। আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু এখানে বলছেন, প্রত্যগাত্মন্, ভিতরে; আর পরাগাত্মন্ বাইরে। যদি আপনি পরাগ্ অর্থাৎ বাইরের দিকে যান, তাহলে প্রত্যগ্‌কে ছেড়ে দেওয়া হবে। কঠোপনিষদে বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনামৈক্ষদ্*। বাইরে সবাই আমরা দৌড়াচ্ছি। কেন দৌড়াচ্ছি? কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এগুলোর জন্যই দৌড়াচ্ছি। বয়স হয়ে গেলে তার সমস্ত কিছু চলে যায়। বউমার উপরেও রাগ করার ক্ষমতা নেই, কাম বাসনা সেটাও নেই, কিন্তু শরীরের সুখের ইচ্ছা থাকবেই। তখন যত ক্রিয়াকর্ম করা হয়, সবই করা হয়ে এগুলোর জন্য। এগুলো যখন কমতে শুরু হয় তবেই ঈশ্বরে ভালবাসা আসে।

ঈশ্বরে কেন ভালবাসা হয় না? কারণ আমাদের ভিতরে যে ছটি রিপু আছে, মন তাদের খুশি করতে ব্যস্ত থাকে। কলকাতার কলেজগুলিতে দেখবেন সব প্যাকাটি মার্কা ছেলে থাকে, একটা চড় মারলে উল্টে পড়ে যাবে, এরা সব ইউনিয়ন লিডার। এরা যাকে যা বলবে সবাইকে তাই শুনতে হবে। যারা পড়াশোনা নিয়ে থাকে, ভাল ছেলে, তারা এসবের কোন কিছুতে থাকে না। কিন্তু আজকে মিছিলে যেতে হবে, আজকে প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হতে হবে; তখন ভাল ছেলেদেরও তাই করতে হয়। মন ঠিক তাই করে। এই দুষ্ট প্যাকাটি মার্কা ইন্দ্রিয়গুলো যেমনটি বলে মন তেমনটি করে। চারটে ভাল ছেলে যদি একজোট হয়ে যায়, পিটিয়ে শেষ করে দেবে। কিন্তু কোন দিন হবে না, ভালরা কখন একজোট হয় না, দুষ্টরাই হয়। জল যখন নিচের দিকে যায় তার সাইজ বাড়তে থাকে। উপরের দিকে যখন ওঠে একটা একটা কণা বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে। জীবনে যখন মানুষ ওঠে একাই ওঠে। ফলে কি হয়, এদের কষ্টটাও বেশি। এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা এগুলো যাবে কি করে? ঠাকুর বলছেন, তাঁর নাম করতে হয়। এরপর ভক্ত প্রশ্ন করছে।

একজন ভক্ত –তাঁর নাম করতে ভাল কই লাগে?

এই প্রসঙ্গটা খুব সুন্দর। সমস্যা যেগুলো বলছেন, একেবারে বাস্তব। আমরা যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমাদের কত সুবিধা; কোন কিছুর পিছনে দৌড়াতে হয় না। সঙ্ঘও আমাদের দৌড়াতে দেবে না, একটু ডানদিক বামদিক হয়ে গেলে চোখে পড়ে যাব। মনে যদি কোন বিকারাদি আসে, অন্যদের নজরে সেটা পড়বে, অন্য সবাই এসে তাঁকে আটকে দেয়, সাবধান করে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। সত্যিই যাঁদের ধর্ম পথে এগোনর ইচ্ছে, তাঁরা এই বাক্যটাকে সব সময় মাথায় রাখবেন। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে বলছেন। এটা যদি মেকানিক্যালও হয়, মুখের কথাও যদি হয়; তাতেও হবে। ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছেন। রান্নাঘরে ছবি লাগিয়েছেন, আপনার ড্রইং রুমে

লাগিয়েছেন, বসার ঘরে লাগিয়েছেন, শোওয়ার ঘরে লাগিয়েছেন। হঠাৎ নিজের দুরবস্থার কথা মনে পড়ে গেল; শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন ছায়া কায়া সমান, তার অর্থ দাঁড়ায় যেখানে ঠাকুরের ছবি আছে সেখানেই ঠাকুর আছেন। আপনি মেকানিক্যালিই বলুন, দিনের পর দিন বলুন –ঠাকুর আমার মধ্যে ভক্তির উদয় হচ্ছে না, কিছু করো তুমি ঠাকুর। সকাল বিকাল নিয়ম করে হাতজোড় করে –'ঠাকুর! আমার তো ভক্তি নেই। ইউটিউবে কথামৃতের ক্লাশে শুনেছি হাতজোড় করে বলতে হয়, তাই এই প্রার্থনা করছি'।

রোগ যত গভীর, জানবেন, রোগের চিকিৎসা তত লম্বা। আপনার পূণ্যের উদয় হয়েছে বলেই না শাস্ত্রের কথা শোনার ইচ্ছে হয়েছে। তাই বলে যে রোগ চলে গেছে, তাতো না। ভয়ঙ্কর রোগ রয়েছে, তার সঙ্গে কিন্তু পূণ্যটাও আছে। এই পূণ্যের জোরে মূল কথাগুলো শিখে হাতজোড় করে প্রার্থনা –'হে ঠাকুর! তোমাতে যেন আমার মন যায়'। দিনের পর দিন করুন, মাঝখানে তিন দিন গ্যাপ হয়ে গেলে, চতুর্থ দিন থেকে আবার করুন, ছাড়ব না। এই আঁট যদি না থাকে তাহলে মুশকিল আছে। এই আঁট আপনাকেই তৈরী করতে হবে। আপনি শাস্ত্রের কথা নিয়মিত ইউটিউবে শুনছেন মানেই আপনার আঁট আছে; আপনার ঘরে কথামৃত আছে মানে আপনার আঁট আছে। এই জিনিসটাকে প্রথমে মেকানিক্যাল ভাবে মাথা ঠুকে ঠুকে করতে হবে –হে ঠাকুর, আমার তো জপে মন বসে না। শুধু এটা জানবেন যে, যদি না হয়, বুঝবেন রোগ খুব গভীর।

আমি তখন একেবারে নূতন ব্রহ্মচারী, একদিন পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, তখন বুঝতেও পারিনি। কথাটা কথামৃতেরই –আমি মেঝে করা ফরাস। তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। ফ্লোরের নিচে কত কি আছে উপর থেকে লোকে বুঝতে পারেনা। আজকে যখন কোন সন্ন্যাসীকে দেখছেন, আমার ক্লাশ শুনছেন, অন্য কারুর ক্লাশ শুনছেন; আপনার তখন মনে হচ্ছে, আহা! এনারা কত সুখে আছে, আমিও যদি এ-রকম হতে পারতাম! কিন্তু ভুলবেন না –মুক্তির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান। যে সন্ন্যাসীদের দেখে আপনার মনে হচ্ছে এনারা কত সুখে, আমিও যদি এনাদের মত হতে পারতাম। কিন্তু ভুলে যাবেন না, এর পিছনে কত বলিদান আছে; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কত দুরমুশ করা হয়েছে বুঝতে পারছেন না, এই দুরমুশ আপনারও হবে, এ পথে যাঁরাই আসতে চাইছেন তাঁদের সবারই হবে।

আপনার মনের ইচ্ছা যত বেশি, বুঝবেন রোগ তত কঠিন, রোগের নিরাময় হতে তত সময় বেশি লাগবে। প্রথম প্রথম প্রার্থনাটা মেকানিক্যাল হয়, ওখান থেকে হতে হতে ব্যাকুলতা আসতে শুরু হয়, নিজে থেকেই হবে। অনেক জন্ম ধরে কত গোলমাল করা হয়েছে, এখন সেই গোলমালগুলো সারাতে কয়েক জন্ম তো দিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি আশা করেন, ছ-মাসে, এক বছরে, দশ বছরে হয়ে যাবে; না হবে না। যাঁরা আপনাকে বলছেন, তাঁরা আপনাকে সরাসরি বোকা বানাচ্ছে। ঠাকুরকে একজন বলছেন, সংসারে কি হবে না? ঠাকুরও বলে দিলেন, হবে না কেন, অবশ্যই হবে। কিন্তু তারপর যে শর্ত আরোপ করছেন, সেগুলো একবার দেখুন।

এই কথা বলার পর ঠাকুর গান ধরলেন –দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যাম। স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, খুব সুন্দর গান। আপনার যত দুঃখ-কষ্ট, এগুলো আপনিই খাল কেটে নিয়ে এসেছেন। আপনার টেনশান আছে, আপনিই এনেছেন; আপনার ট্রেস আছে, আপনিই সেটা নিয়ে এসেছেন। রাতে আপনার ঘুম হয় না, আপনিই এর কারণ। আপনার পেটের গণ্ডোগল আছে, হজম হয় না, খিদে পায় না, সব আপনিই এনেছেন। আপনার টাকা-পয়সার অভাব? অভাবের মূলেও আপনি। সব কটা আপনারই আনা। সব নিয়ে আসার পর বলছেন, হে ঠাকুর, সব ঠিক করে দাও। তা কি কখন হয়? ঠাকুর বলবেন, বাঃ তুমি নিজে নিয়ে এসেছ, তুমিই সরাও, আমি কি করে সরাব? বাড়িতে ছেলে কোথায় বদমাইশি করে জোর ফেঁসে গেছে। বাড়িতে এসে বাবা-মাকে বলছে, আমাকে এই যাত্রায় এই বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও। বাবা-মা বলবে, তুমিই তো গোলমাল করেছে, তুমি এবার বুঝে নাও।

সাধারণ জীবের অবস্থা ঠাকুর নিজের উপর আরোপ করে মার কাছে জীবের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাচ্ছেন।

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন। জীবের বিকাররোগ। তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে। এই বিকাররোগ সবারই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, এনারা হলেন আদর্শ পুরুষ। এনারা সেই কারণ জগৎকে অতিক্রম করে, সূক্ষ্ম জগৎকে পেরিয়ে স্থূল জগতে প্রবেশ করে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, হে জীব, জীবনযাপন এভাবে করতে হবে। যদি মনে করেন এনাদের মত আমারও হয়ে যাবে। তা কি করে হবে? ঠাকুর বলছেন, তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তন্নামে অরুচি! বিকারে যদি অরুচি হল, তাহলে আর বাঁচবার পথ থাকে না।

আপনি তাকিয়ে দেখুন, একশ চল্লিশ কোটির দেশে ঈশ্বরের নামে কজনের রুচি আছে? আজকের দিনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কত সমস্যা, দিনের পর দিন সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আরও বেশি সমস্যা ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পেটের। দেশে অন্ন ছিল না। ১৯৬২ সালে যখন চীন-ভারত যুদ্ধ হল, সেই সময় দেশের খুব খারাপ অবস্থা ছিল। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরায় দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। কটা গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল? রেলগাড়িতে ওঠার মত লোকের পয়সা ছিল না। কিছুই ছিল না, ভারতের লোকেরা একেবারে নিঃস্ব ছিল। কিন্তু তাও কোন হতাশা ছিল না। আজকে দুটি পয়সা হয়েছে কিন্তু সবার মধ্যে হতাশা। সবাই সবার উপর চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেন? তন্নামে অরুচি।

ইংরাজী শিক্ষা পেয়ে, ইংরাজী বই পড়ে সবাই বলছে, religion is fake, we don't need religion। নারদীয় ভক্তিসূত্রে দেবর্ষি বলছেন, *স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি*। আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ বলতেন, কিন্তু লোকেদের এমন অবস্থা যে *স জরতি স জরতি স লোকাংসজারয়তি*, নিজেও পুড়ে মরছে অপরকেও পুড়িয়ে মারছে। আপনি এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি তরতি গ্রুপে আছেন, নাকি জরতি গ্রুপে আছেন? ঈশ্বরের নামে যদি অরুচি তাহলে আর বাঁচার আশা থাকে না। কিন্তু এটা সাধারণ লোকের কথা বলা হচ্ছে, এই কথা আপনাকে আমাকে নিয়ে বলে হচ্ছে না, কারণ আমার আপনার কোন দিন অরুচি হতে পারে না। অরুচি থাকলে এই ক্লাশগুলো শুনতেই পারতেন না। উচ্চমানের সাধনা হয়ত হচ্ছে না, আপনি নিষ্ঠাহীন হতে পারেন, কিন্তু হিপক্রিট না। নিষ্ঠাহীন মানে, সাধন-ভজনের যে চেষ্টা, যে নিষ্ঠা হওয়া দরকার, সেখানে আপনার ঘাটতি আছে, এরাই বহির্জগতে হিপক্রিট হয়। আপনি ঢপবাজ কখনই নন, আপনি insincere।

বলছেন, **যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা**। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনাদের বাঁচার আশা আছে শুধু না, আপনারা বাঁচবেনই বাঁচবেন। আর একটু-আধটু রুচি না, আপনাদের রুচি অনেক বেশি। আপনি আর আপনার ইষ্টের তফাতটুকু হল –insincere; বাংলায় আলস্য, আলস্য ছাড়া কিছু না। আপনারা কাম, ক্রোধ অনেকটা পেরিয়ে এসেছেন। না পেরিয়ে এলে এসব কথা শুনতেই পারতেন না, শোনার ইচ্ছাই হত না। যার জন্য ভক্তিশাস্ত্র খুব সুন্দর বলেন, পাপের যখন উদয় হয় তখন ঈশ্বরনাম শোনার ইচ্ছা থাকে না। এমন একটা কিছু হয়ে যাবে যে, যেখানে আরতি হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, পাঠ হচ্ছে; সেখানে থেকে তিনি সরে আসবেন। বছর দুয়েক আগে আমি মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কাছে কোলা নামে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। ওখানে দেখলাম ঠাকুরের প্রচুর ভক্ত আছেন। খুব ভাল লাগল। সবাইকে দেখলাম, ফোন এলেই বলছেন 'জয় রামকৃষ্ণ' 'হ্যালো' কেউ বলে না। ওটা দিয়ে ভাব আরোপ করছেন। আপনি বলবেন, ঢপবাজি করছে। হতে পারে, কিন্তু তাঁরা একটা ভাব আরোপ করছেন।

ঈশ্বরের নাম করতে হয়; দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? আপনাদের ক্ষেত্রে পরিষ্কার ঠাকুরের নাম। **যদি নাম করতে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তাহলে আর কোন ভয় নাই, বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে**। আমার এমনি ব্যক্তিগত একটা কিউরিসিটি আছে, আজকে আমরা কথামৃতের বিরাশি নম্বর ক্লাশ নিচ্ছি। আপনার যাঁরা সব কটা ক্লাশ শুনেছেন, আপনাদের রুচি আছে, আমার ক্লাশ শুনছেন বা আর কারও বক্তার শুনছেন; তার মানে আপনারা কোন না কোন ভাবে ঠাকুরকেই ধরে আছেন। এতেই তাঁর কৃপা হবেই হবে। কথামৃতের এই পুরো পাতাটা যদি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখেন, যেটা আগের ক্লাশ থেকে শুরু হয়েছিল –ঈশ্বরলাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে; সেখানে এই গুণের কথা বলছেন। যখন দেখছেন গুণে হচ্ছে না, তখন বলছেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। তারপর বলছেন, ভক্তি করলেই হবে। পর পর বলে যাচ্ছেন, তাঁকে ভালবাসতে পারছি না, তাঁর নাম করতে পারছি না। ভক্তির একটু আঁশ যদি থাকে, পুরো জিনিসটাকেই ধরে নেওয়া যাবে।

আগেকার দিনে কেল্লায় যাওয়ার সময় দড়ি যদি ছুড়তে হয়, একটা পাতলা দড়ি ছুড়ত; কারণ পাতলা দড়ি সহজে উপরে যাবে। সেই পাতলা দড়ি মোটা দড়িটাকে ধরে টেনে আনছে। তারপর দেখা যেত পাতলা দড়ির পর মোটা দড়ি, তারপর আরও মোটা দড়ি। আর তক্তা যদি দিতে হয়, তার মানে একটা উঁচু জায়গায় আপনাকে ভারি জিনিস তুলতে হবে। ঠিক তেমনি ভক্তির একটু হাল্কা আঁশ যদি থাকে, সামান্যতম আঁশ যদি থাকে, তাহলে সেটাকে ধরে আস্তে আস্তে গভীর থেকে গভীরতম ভক্তিকে ধরে নেওয়া যাবে। কিন্তু অরুচি যদি হয়, অর্থাৎ সেই আঁশটুকুও নেই, তাহলে কি আর করার আছে। তবে হবে, হতে বাধ্য; শত জন্ম পর, সহস্র জন্মের পর উন্নতমানের ভক্তির উদয় আজ হোক আর কালই হোক, হবেই হবে।

যেমন ভাব তেমনি লাভ। আগে যেটা বলা হয়েছিল, এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে এর উল্টোটাও হয়, যেমনটি লাভ চান তেমনটি ভাব রাখতে হয়। এরপর ঠাকুর এখানে খুব নামকরা গল্প বলছেন। দুজন বন্ধু পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দেখল এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বলল, চল ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর-একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে বেশ্যালয় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর বন্ধুটির মনে বিরক্তি এল। সে নিজে মনে মনে বলতে লাগলে, 'ধিক্ আমাকে। বন্ধু আমার হরি কথা শুনছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি'। অন্যদিকে যে বন্ধু ভাগবত শুনছিল, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, 'আমি কি বোকা! কি ব্যাড় ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে'। **এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল**। এগুলো কাহিনী।

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন আন। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'। খুব সুন্দর কথা। একটা গল্প আগেও বলা হয়েছিল, একজন মেয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্ধকার পথে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। পথে একজন ফকির বসে আল্লার নাম করছিল। দৌড়ে যাওয়ার সময় ফকিরের গায়ে মেয়েটির পা লেগে যায়। ফকির রেগে আগুন, 'একটা বদমাইশ নোংরা মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছিস'! মেয়েটি তখন খুব করে ক্ষমা চাইতে লাগল, 'দোহাই ফকির বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তবে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমি সাধারণ একজন প্রেমিকা, প্রেমিকের কথা ভাবতেই আমার কোন হুঁশ নেই; আর আপনি সেই ওপরওয়ালার কথা ভাবছেন, তারপরেও কি করে আপনার পুরো জগতের ব্যাপারে হুঁশ আছে'? **'ভাবগ্রাহী জনার্দন'**। আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু আমি কথা বলে আপনাকে বোকা বানিয়ে নিতে পারি; ওই কথার পিছনে যে সূক্ষ্ম কথাগুলো রয়েছে, ভগবান সেটাও শুনতে পান।

কর্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন ‘মন তোর’। অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর করছে। যিনি ঈশ্বরের পথে এগোতে চাইছেন, তাঁকে তাঁর হৃদয়ে ভালবাসা ভরে নিতে হয়। এই জিনিস এমনি এমনি হয় না, সময় লাগে। সবচেয়ে সহজ উপায় হল, ছবির দিকে তাকানো, ভক্তিমূলক গান শোনা বা নিজে গান গাওয়া। গান করতে করতে বা শুনতে শুনতে হয়ে যায়। হয়ে যায় মানে, প্রণাম করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন, হে ঠাকুর আমার কি হবে? একটা বাচ্চা ছেলে যেমন ভাবে প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও। সেই রকমই করুন, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বাচ্চা ছেলে শুধু পরীক্ষার সময়ই করে, আপনি কিন্তু রোজ করছেন, এ-ভাবে প্রার্থনা করতে করতেই নির্ভরতা এসে যায়। এই করতে করতেই হয়ে যায়। একবার যখন হয়ে যাবে, তখন দেখবেন পুরো শরীর-মন তাঁর দিকে চলে যাবে। তখন ঠাকুর যেটা বলছেন, কয়েকটি লক্ষণ আছে, যেমন বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া এই গুণগুলো আসতে শুরু হয়।

তারা বলে, ‘যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ’। এখানে করণ বলতে ইন্দ্রিয় হতে পারে, করণ বলতে কাজও হতে পারে।

মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হয়ে গেল। ‘আমি রামের দাস, আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি’। এই বিশ্বাস। ভাব আরেকটু পাকা হলে তবে গিয়ে এই বিশ্বাস আসে।

আজকে যেটা ঠাকুর বললেন, একটা বললেন, তাঁর কৃপা; তারপর বললেন হবেই হবে। আসলে ভক্তির একটু আঁশ যদি থাকে তাতেই হবে। ভগবান বিরাট, ভগবান আবার সূক্ষ্মতম। ওই অতটুকু ভক্তি আঁশ যেখানে থাকে সেখানেই ভগবান নেমে আসতে পারেন।

কথামৃতের যে জায়গাতে আমরা এখন আছি, আধ্যাত্মিক ভাবে টগবগ করছে; পুরো কথামৃতই তাই। তাহলেও কি হয়, বিভিন্ন রকম কথাবার্তা থাকে বলে একটু তারতম্য এসে যায়। এই জায়গাতে গান হচ্ছে, তার মধ্যে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, শাস্ত্রীয় কথা হচ্ছে, আর তার মধ্যে ঠাকুর নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। আলাদা আলাদা স্তর, গান করছেন, সেই গান আর-একজনের লেখা, সেই গান ঠাকুরের মুখ দিয়ে আসছে, শাস্ত্রীয় কথা ঠাকুরের মুখ দিয়ে আসছে, তার সাথে ঠাকুরের নিজের যে অনুভূতি, যেটা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই অনুভূতিগুলি ঠাকুর নিজের মুখে বর্ণনা করছে, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের, যাঁরা সবাই বড় বড় সন্ত-মহাত্মা ছিলেন, তাঁদের রচিত প্রচলিত গানগুলো ঠাকুর গান করছেন আর এর সাথে আসছে ঠাকুরের নিজের কথা, সাক্ষাৎ ভগবানের কথা।

এর আগে ঠাকুর বলছেন, তাঁর কৃপা হবেই হবে আর বলছেন, ভাবগ্রাহী জনার্দন। ঠাকুর কিন্তু ভাব দেখেন। এর আগে ভাব জিনিসটার বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। আপনি কথা বলছেন, কাজ করছেন, কিন্তু আপনার ভাবটা কি? ভাব একদিনে হয় না। সাধক কবি বলছেন, ভাব কি ভেবে পরান গেল। কি ভাব বলা খুব মুশকিল। রামকৃষ্ণ মিশনে চল্লিশ বছরের বেশি আমার সন্ন্যাস জীবন হয়ে গেছে। দশ বছর বয়স থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়াশোনা করলাম। তার মানে পঞ্চাশ বছরের উপর আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে জড়িয়ে আছি। এখন মনে হচ্ছে যেন ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে আছি, এর বেশি না। আপনারা ভাগ্যবান, আপনাদের কারুর দর্শন হচ্ছে, কারুর শিহরণ হচ্ছে, আমার তো এগুলোর কোন প্রশ্নই নেই। এই জন্মে যদি মনে করতে পারি ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে আছি, তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করব, এর বেশি কিছু আমার চাওয়ার কিছু নেই। কারণ যতক্ষণ একশ ভাগ ভাব না এসে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক ঠিক শুরু হয় না। বাকি যা কিছু সব ইমোশানালিজম্।

ঠাকুর বলছেন, বিকারের রুগী বিকারের ঘোরে বলে এক জ্বালা জল খাব। আমাদেরও এ-রকম ছিল, জয়েন করার পর পাঁচ বছর, সাত বছর খুব লাফাতাম। আমার এক বন্ধু, বিদেশে থাকেন, কয়েকদিন আগে খুব উৎসাহ নিয়ে বলছেন, We are soldiers of Swami Vivekananda।

আমি ওনাকে বললাম, কম বয়সে এগুলো ভাল শোনায়, এই বয়সে এসে এই নাটকবাজীগুলো বন্ধ করুন তো; ঠিক এই ভাষায় তাঁকে বললাম।

যাই হোক, এইসব বলার পর ঠাকুর শুরু করছেন এই বলে –**যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকতে মুক্তি নাই**।

গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে। এগুলো কাহিনী, কাহিনী দিয়ে একটা জিনিসকে বোঝান হয়। এর কোন কিছুকে নিয়ে প্রশ্ন করা, এটা কি, ওটা কেন, এগুলো অবান্তর। যখন কোন কাহিনীকে দিয়ে একটা জিনিসকে বোঝান হয়, তখন জেনারালাইজ করতে নেই। যদি কাহিনী ছাড়া আপনি বুঝে নেন, তাহলে তো খুব ভাল; কাহিনী দিয়ে যদি বুঝতে পারেন, তাহলেও ভাল। কিন্তু কাহিনীগুলিকে যদি বিচার করতে শুরু করেন; না এমন তো হয় না, এটা কি করে হবে ইত্যাদি, তখন আর সেটা ভাল হয় না; আসলে আপনি কাহিনীর উদ্দেশ্যটাই বুঝতে পারলেন না।

একবার একটা ঘটনা পড়েছিলাম, গীতার একটি শ্লোকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন, *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং*, সেখানে বাইরের একজন খুব বড় মহাত্মা এটাকে নিয়ে বলছেন, কেন, সমুদ্রে তো কত তিমি মাছ হয়, আরও কত কিছু হয়। তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখনই আমার অবাক মনে হচ্ছিল, এত বোকা সাধু হতে পারে। তুলনা করা হচ্ছে সমুদ্রের বিশালত্বকে, তুমি তার মধ্যে তিমি মাছ খুঁজছ? আর এনারাই নাকি নিজের নিজের সম্প্রদায়ের বড় বড় মহাত্মা।

গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে, ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে, অপরের পিছনে কখন ম্যা ম্যা করে দৌড়াবেন না। তখন ঠাকুর বলছেন, **তাই ওদের কত যন্ত্রণা। কসায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে; যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে আমি, আর 'ম্যায়' মানেও আমি**। প্রথম যখন দেখলাম ঠাকুর হিন্দিও জানতেন, ইংরাজী কয়েকটা শব্দও জানতেন, তখন খুব মজা লেগেছিল। 'আমি' 'আমি' করে বলে কত কর্মভোগ। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে 'তুঁহু তুঁহু' বলে, অর্থাৎ 'তুমি তুমি'। 'তুমি তুমি' বলার পর তবে নিস্তার। আর ভুগতে হয় না। সাধু মহাত্মারা তখন দক্ষিণেশ্বর হয়ে গঙ্গাসাগর দর্শনে যেতেন, ঠাকুর নিশ্চয় তাঁদের কাছেই এই কাহিনীটা শুনেছিলেন। শুনলেই বোঝা যায় যে এটা হিন্দি বেল্টের গল্প।

'আমি' ভাব কেমন ভাবে জড়িয়ে থাকে আমরা কল্পনাই করতে পারব না। আমি এক সময় ছাপড়া আশ্রমে ছিলাম। আমাদের এক ভক্ত, বয়স কম, আশ্রমে আসতেন। একদিন আশ্রমে আমি গীতার উপর একটা ক্লাশ নিলাম। ক্লাশের পর ভক্তটিকে আমি হেসে বললাম, 'কি, ভাল বললাম কিনা'? একদিন ভক্তটি আমাকে বলছেন, মহারাজ, 'জীবনে আমার স্বপ্ন থেকে গেল যে, কোন দিন নিজে থেকে আপনার প্রশংসা করব। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই আপনি নিজেই নিজের প্রশংসা করে নেন'। শুনে আমার লজ্জা হল। তারপর ওর সামনে ওই ধরণের কথা বলাটা কমে গেল। এখন বয়স হয়ে গেছে, এগুলো আর কিছুই লাগে না। কিন্তু তুঁহু তুঁহু ভাবটা আসে না।

পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছে সকালে আমরা সাধুরা সবাই প্রণাম করতে যেতাম। একদিন একজন মহারাজ মজা করে বলছেন, 'মহারাজ আপনি বলেন, সাধুরা সব 'আমি' 'আমি' করে। কিন্তু দেখুন সাধুরা তো এটাও বলে যে, এত বড় মন্দির, হাসপাতাল সব ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে'। স্বামী ভূতেশানন্দজীর বলার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল। তিনি ঠিক ওই ভঙ্গিতে খুব মিষ্টি করে বললেন –'তার সাথে বলে, আমার সময় ঠাকুরের ইচ্ছায় এই কাজ হয়েছে'। এই 'আমি' 'আমি' ভাব যায় না। তুঁহু তুঁহু, সব ঠাকুরের ইচ্ছা, সব ঠাকুর করছেন; কত উচ্চমানের সাধক হলে তবে গিয়ে এই ভাব আসে। আমার নিজের ধারণা, আমি ভুলও হতে পারি; খুব কম করে ছয় থেকে সাত ঘন্টা বছরের পর বছর যদি জপ করা হয়, আর জীবনে যদি প্রচুর মার খাওয়া থাকে, এমন মার যে মাটিতে পিষে

দিয়েছে, তাও কোন রকমে বেঁচে আছেন; তখন হয়ত এই তুঁহু তুঁহু হতে পারে। এই দুটি ছাড়া, আর তা নাহলে যেটা বলা হল; অনেকদিন ধরে একটি ভাবকে নিয়ে লেগে আছেন।

যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁরা হয়ত দেখে থাকতে পারেন; ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমার মত বয়স্ক বাড়ির মহিলারা তুলসি গাছের তলায় সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিতেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রদীপের বাতি দিয়ে যাচ্ছেন, সেখান থেকে একটা ভাব জন্ম নিয়ে নিয়েছে। যদি কিছু দিনের জন্য তাঁকে কোথাও যেতে হত, উনি বারবার বাড়ির অন্য কাউকে মনে করিয়ে দিতেন –দেখো ওখানে প্রদীপ দিতে যেন ভুল না হয়। এই ধরণের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে থাকলে একটা ভাব জন্ম নেয়। তার মানে, এই তুঁহু তুঁহু ভাব, ঠাকুরই কর্তা, এই ভাব প্রচুর জপধ্যান করলে, আর তপস্যা করলে হবে।

দ্বিতীয় জীবনে বেদম মার যদি খেয়ে থাকেন। বেদম মার আবার দুই প্রকার হয় –এক প্রকার হল কাঁচ, একটু আঘাত দিলে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল; দ্বিতীয় প্রকার হল লোহা, আঘাত পড়লে আরও শক্ত হয়। যাঁরা লোহা, যাঁদের ভিতরটা স্টীল, তাঁরা জীবনে যখন বেদম মার খান, তা সত্ত্বেও যখন দেখছেন আমি বেঁচে আছি, আমি শেষ হয়ে যায়নি, তখন তিনি বোঝেন –ঠাকুরই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাকিরা ভেঙে গিয়ে ছিটকে যায়।

আর তৃতীয় আরেকটা হল –দীর্ঘকাল একটাতে লেগে আছে। এই তিনটে ছাড়া এই ভাব আসবে না, যারা বলে ও-সব মুখের কথা। আমাদের কাছে অনেকেই আসেন, বেশির ভাগ লোকের মধ্যে শুধু শুধু 'আমি' 'আমি' ভাব। একজনকে আমি বললাম, আমি একটু খাতা বার করে নোট করছি কতবার আপনি 'আমি আমি' করছেন। দু মিনিটে দশবার 'আমি' বেরিয়ে আসছে। এত সহজে 'আমি' 'আমি' ভাবের পারে যাওয়া যায় না। এগুলো শুনতে ভাল লাগে, পড়তে ভাল লাগে; কিন্তু জীবনে নামাতে গেলে দেখবেন খেই পাওয়া যাবে না। আমি যেটাই বলি, গুরুজনদের কাছে অনেক শিখেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এই মূলধনকে আশ্রয় করে যা বলার আছে বলি।

হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান।

এ-জিনিস তখনই হবে –হয় ভয়ঙ্কর সাধনা করা হয়েছে আর মার খেয়ে খেয়ে পূর্ণ শরণাগতির ভাব এসেছে। মার খেতে খেতে সেখানে একটা নূতন আমি বেরিয়ে এসেছে। আর তা নাহলে দীর্ঘদিন ধরে লেগে আছেন। এই ভক্তিটাই তিল তিল করে আপনার ভিতরে জন্মেছে; তা না হলে হয় না।

এই তিনটের একটা আপনাকে করতে হবে। চতুর্থ আমার জানা নেই। আর তাঁর কৃপাতে হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না, শাস্ত্রেও কোথাও নেই। তাঁর ভারি বয়ে গেছে আপনাকে সংসার থেকে তুলে নেবেন। তিনি সংসার করেছেন, তিনিই আপনাকে সংসারে রেখেছেন; তিনি কেন আপনাকে সংসার থেকে তুলে নেবেন, আমার জানা নেই। একজন মহারাজের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মতিথিতে বড় মেলা বসে। একটা ছোট বাচ্চাকে তার বাবা মেলা দেখাতে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটা একটু পরেই মায়ের জন্য কাঁদতে শুরু করেছে। বাবা খুব করে বাচ্চাকে বোঝাচ্ছে –চল, মেলা থেকে তোমাকে মা কিনে দেব, বাবা কিনে দেব। মেলা থেকে বাবা প্লাস্টার অফ প্যারিসের ঠাকুরের একটা মুর্তি আর মায়ের একটা মুর্তি কিনেছে। ছেলের হাতে দিয়ে বলছে, 'এই দেখ, তোমাকে মা দিলাম, বাবা দিলাম'। বাচ্চাটা ঠাকুর আর মার মুর্তি নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে বলছে –'এই নাও তোমার মা, এই নাও তোমার বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল'। আমি যখন গল্পটা শুনেছিলাম হাসতে হাসতে আমার দম বেরিয়ে গিয়েছিল। বেচারা গ্রামের লোক, মেলা দেখতে এসেছে, ছেলেকেও মেলা দেখাবে। ছেলে মায়ের জন্য কাঁদছে। ঠাকুর আর মায়ের পুতুল মাটিতে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে বলছে –এই নাও তোমার মা, এই নাও তোমার বাবা।

এই যে ভাব, হে ঠাকুর এই সংসার তোমারই, আমি মানছি; এবার তোমার সংসার তোমার কাছেই রাখ, আমার লাগবে না। সুরদাস হিন্দির একজন খুব বড় কবি ছিলেন, কৃষ্ণভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উপর তিনি খুব সুন্দর সুন্দর ভজন রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটা ভজন গানে বলছেন, মাখন চুরি নিয়ে যশোদার কৃষ্ণের উপর রাগ হয়েছে, মা যশোদা খুব করে শাসনের সুরে বকাবকি করেছেন। তখন কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলছেন, বহুত হোই নাচ নাচায়ো, তুমি যে রোজ আমাকে এই শুকনো রুটি দাও, এই খেয়ে আমাকে গরু চড়াতে পাঠাও; এই নাও তোমার লাঠি, এই নাও তোমার দড়ি; আমি আর কোথাও যাচ্ছি না, বড্ড নাচ নাচিয়েছ, আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। অত্যন্ত মধুর বর্ণনা। বাচ্চা বয়সে পড়েছিলাম। হে প্রভু এই তোমার জগৎ, এই তোমার সুখ, এই তোমার দুঃখ; আমার কোনটাই লাগবে না। এই ত্যাগের ভাব আর তুমিই কর্তা আমি অকর্তা; এই ভাব সহজে হয় না।

কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই; সহজে হয় না, তাই বলে আমি ছেড়ে তো দেব না। এটাই আমাকে করে যেতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। যদি না হয়, আরেকটু চেষ্টা করতে হবে। তাতেও যদি না হয়, আরও চেষ্টা করতে হবে। আপনার জীবনে কষ্ট হচ্ছে? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন। না হয় তো, আরও প্রার্থনা করুন। তাতেও যদি না হয়, আরও প্রার্থনা করুন। এছাড়া করার তো কিছু নেই। এর বাইরে করবেনই বা কি।

নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে। তবে চাষ হয়। কথামৃতেই আছে, একজন এই কথা নিয়ে ঠাকুরের সাথে তর্ক করছে; কেন পাহাড়েও পুকুর হয়। পাহাড়ের মধ্যে ওই জায়গাটা নিচু আছে বলেই পুকুর হয়েছে। পাহাড়িয়া দেশে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে জমি তৈরী করে চাষ করা হয়। পাহাড়ের ওই অংশগুলিকে নিচু করা হয়েছে বলেই সেখানে চাষ হয়, নিচু না হলে চাষ হবে না। বোঝানর জন্য ঠাকুর আমাদের এই উদাহরণগুলি দিচ্ছেন।

স্বামীজীকে দেখুন কি তেজ! সারাটা জীবন ওই তেজ নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সামনে স্বামীজীকে দেখুন, ছোট থেকে ছোট শিশুর মতন। স্বামীজী ঠাকুরের কত পরীক্ষা নিলেন, স্বামীজী ঠাকুরের সঙ্গে কত তর্কাতর্কি করেছেন। অথচ দেখুন, একটি কোন ঘটনা নেই যে, স্বামীজী মায়ের কথা শোনেননি। আজ পর্যন্ত একটি ঘটনা শুনেছি, যেখানে তিনি মাকে নিয়ে একটু মজা করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে মা নিজে রান্না করে স্বামীজীকে খাইয়েছিলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম খেলি? স্বামীজী বলছেন, রোগীর পথ্য খেয়ে এলাম, ওই তো পাতলা পাতলা রুটি সঙ্গে মুগের ডাল। ঠাকুর বলে পাঠালেন, ওদের জন্য মোটা মোটা রুটি আর ছোলার ডাল করবে। কতটা আপনার মানুষ হলে এমন কথা বলতে পারেন, মাথাটা ওখানে বিকিয়ে দিয়েছেন।

আর আমাদের এখানে ভক্তরা, শ্রোতারা প্রত্যেক কথায় তর্ক করতে আসেন; কি শিখবেন তাঁরা! খাল জমি চাই, তবে জল জমে। তবে চাষ হয়। কষ্ট করে একটু সৎসঙ্গ করতে হয়। সৎসঙ্গ করতে এসে ওরা প্রথমে মাপতে শুরু করে, আপনি সৎপুরুষ কিনা, আপনি ঠিক ঠিক সাধু কিনা। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। আমি আমার বাষট্টি বছর পেরিয়ে এসেছি, জীবনে আজ পর্যন্ত একটি লোক দেখেনি, একটি লোক পাইনি, যে ভিতর থেকে সত্যিকারের বদমাইস। অরুণাচল থেকে লে, লাদাখ পর্যন্ত আমার চষা। কোন এমন জায়গা নেই যেখানে আমি থাকিনি। সত্যিকারের যাদের বদমাইস বলে, একটি লোক পাইনি, দেখিনি। কিন্তু আমি প্রচুর লোকের সাথে মিশেছি। সমাজ যাদের বদমাইস লোক বলে, তাদের সাথেও অনেক মিশেছি আর দেখেছি তাদের মধ্যেও সৎগুণ জ্বলজ্বল করছে। আমি একটু ছুঁয়ে দিই, সৎ কথার প্রসঙ্গ নিয়ে আসি; আর ভিতর থেকে তার গুণগুলো বেরোতে শুরু করে। কক্ষণ কারুকে নিয়ে বিচার করবেন না, কারণ জীবনে কখন কেউ পুরোপুরি বাজে লোক হয় না। পুরোপুরি ভাল লোক হয়, পুরোপুরি বাজে লোক হয় না। বিহারে থাকার সময় কত নামকরা ক্রিমিনালসদের

জানতাম। বেআইনি ভাবে একে-৪৭ হাতে নিয়ে খুন করে বেড়ায়। তারাও যখন আমাদের কাছে আসত, তখন একবারও সংসারের একটি কথা বলবে না। আর চুপ করে শুনবে আমরা কি বলছি। আমরা জানি সে ক্রিমিনাল, সেও জানে যে আমরা জানি সে ক্রিমিনাল, কিন্তু ওই জিনিসটা পুরো আলাদা। সাধুসঙ্গ করুন, যেখানে যাঁকে আপনার ভাল লাগে, তাঁর সঙ্গ করুন। আজ হোক বা কাল হোক, আপনাকে দুটো ভক্তির কথা আবশ্যই বলবেন। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন।

একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখি দাঁড়ে বসে তবে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

এটা আপনারা আমার থেকে অনেক ভাল জানবেন। সংসারে যে কি দাবানল লেগে আছে, আপনারা আমার থেকে ভাল জানবেন। কদাচিৎ আমি কারুর বাড়ি গেছে, যেতে গেলে আতঙ্ক লাগে। হয় বিষয়-কথা বলবে, আর নয়তো বলবে, মহারাজ, দুটো ঠাকুরের কথা বলুন। আমি যেন আধ্যাত্মিক বিনোদনের সাপ্লায়ার। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মহারাজরা যাঁরা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনেও বিরাট। সকালবেলা চা খেতে গেলে সবার সাথে দেখা হয়। রোজ আমাদের হাসিঠাট্টা হয়। হাসিটাট্টাও যেটা সেটাও শাস্ত্রেরই কোন একটা জিনিসকে নিয়ে। এটা যে কোন প্ল্যান করে হয় তা না, স্বাভাবিক। সব রকমেরই কথা হয়, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা; ঘাড় থেকে কখন নিচে নামবে না। আজ সকালেই আমি খুব নামকরা পদার্থবিদ পলি আর ওয়াইগনার, উনিও নামকরা পদার্থবিদ ছিলেন, ওনাদের একটা জোক শোনাচ্ছিলাম, মহারাজরাও হো হো করে হাসছেন। এই স্তরে আমাদের কথাবার্তা চলে। সংসার দাবানল, সেখানে কদাচিৎ ভুল করে একটা ঈশ্বরীয় কথা যদি বলে দেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক বলবে, সকাল থেকে তোমার জ্ঞান দেওয়া শুরু হয়ে গেল!

টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ির একটি লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে। গরিবেরা তেল খরচ করতে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

ঠাকুর সেই কবেকার কথা বলছেন। লোকেদের তখন পয়সাকড়ি ছিল না। দেহটাও তো বাড়ি, পুরো শহর একটা। আপনি কি কাঙালী, আর টাকা-পয়সা থাকলে খরচ করার কি দম আছে? কিভাবে বোঝা যাবে? সন্ধ্যে হল, সমস্ত ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিল। আপনার সমস্ত অঙ্গে যেন সব সময় ঈশ্বরের ভক্তির প্রকাশ পায়, যতটা হয়। তাহলে বোঝা যাবে যে আপনারা আধ্যাত্মিক কাঙাল।

জ্ঞানদীপ জ্বলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।

সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর –সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। এখানে এক্সক্লুসিভ বলে কেউ নেই। বেদের সময় যখন যজ্ঞের প্রাধান্য ছিল, শুধু ব্রাহ্মণরাই যজ্ঞে করতে পারতেন। ব্রাহ্মণদেরই অধিকার ছিল স্বর্গে যাওয়ার, যদিও স্বর্গে যাওয়া নিয়ে কখনই ওনারা বলতেন না যে, শুধু ব্রাহ্মণরাই স্বর্গে যাবে; অন্যান্য ধর্মে যেমন বলে তারাই স্বর্গে যাবে বাকিরা নরকে যাবে। আমাদের কাছে হল –পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। স্বামীজীর খুব নামকরা –Each soul is potentially divine। Potentially divine, এর অর্থই হল, তুমি নিজেকে পরমাত্মার সাথে যোগ করতে পার।

গ্যাসের নল সব বাড়িতে খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে –ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে। (সকলের হাস্য) এটা সত্যিকারের ঘটনা। আমি ১৯৮৭ কি ১৯৮৮ সালে এন্টালির অদ্বৈত আশ্রমে অনেক বছর ছিলাম। আমাদের আশ্রমে গ্যাসের কানেকশান ছিল, কিন্তু গ্যাস পাওয়া যেত না। গ্যাস কোম্পানির

অফিস শিয়ালদহে, যেটা ঠাকুর বলছেন, কিন্তু গ্যাসের সাপ্লাই আসত ডানকুনি থেকে। তখনকার মহারাজরা নিয়মিত গ্যাসের অফিসে আরজি জানিয়ে বসে থাকতেন। যাই হোক কি কি করে আমাদের গ্যাস সাপ্লাই নিয়মিত হতে শুরু করে। এই ঘটনাটা যখনই পড়ি, তখন আমার হাসি পায় যে, বাস্তবিক আমাদের সঙ্গে এটা হয়েছে। ঠাকুর এই জিনিসটাকে এত সুন্দর পরিবেশন করলেন; এই হচ্ছেন একটা বিষয়ের যিনি মাস্টার, কিভাবে বিষয়টাকে হাতের তালুতে নিয়ে খেলছেন।

জীবাত্মা পরমাত্মার প্রসঙ্গ হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থেকে এসে যাচ্ছে গ্যাস কোম্পানি, গ্যাস কোম্পনি থেকে এসে যাচ্ছে –শিয়ালদহে অফিস আছে। যাঁদের কাছে কথামৃত আছে, খুলে দেখুন –এক নং বাক্য –পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। দু নং বাক্য –গ্যাসের নল সব বাড়িতেই আছে আর তিন নং বাক্যে এসে বলছেন –শিয়ালদহে আপিস আছে। একটা বিষয়ের যিনি মাস্টার হন, বিষয় তাঁর হাতের মুঠোয় এভাবে খেলা করে। লাগ ভেল্কি লাগ, ছয় বললে ছয়, এক বললে এক। ওস্তাদ খেলোয়াড় যে দান চান, দান ফেললে ওই দানই আসবে। এগুলো শুনেও যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি না জন্মায়, এর থেকে অভাগা জাতি আর হয় না। ঠাকুরের কি কি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছেড়ে দিন, শুধু বিষয়টাকে নিয়ে কিভাবে নাচাচ্ছেন দেখুন। ওস্তাদ ক্রিকেট প্লেয়ার, চার চাই বাউণ্ডারি মেরে দেবে, ছয় চাই, ওভার বাউণ্ডারি মেরে দেবে।

কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী –সব তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ির একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা। পর পর কয়েকটা গান করলেন –হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি, তারপর, নবনীদবরণ কিসে গণ্য শ্যামাচাঁদ রূপ হেরে এবং শ্যামাপদ-আকাশেতে মন ঘুড়িখানি উড়তেছিল। গান শেষ হওয়ার পর ঠাকুর আবার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –বাঘ যেমন কপকপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ওই অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।

এই বিষয়টা বারবার আসে। কাম-ক্রোধ যায় না, থাকবে, যতই চেষ্টা করুন যেতে চায় না। তবে অনুরাগ যখন আসে, অনুরাগ মনকে এত বেশি ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায় যে, কাম-ক্রোধ এক পাশে পড়ে থাকে। ঈশোপনিষদে একটা খুব সুন্দর মন্ত্র আছে, *তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*, আত্মা যখন দৌড়াতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রিয়গুলিও দৌড়াতে শুরু করল, মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পড়ে; মনও দৌড়াতে শুরু করল। আত্মা দৌড়ে এত এগিয়ে গেছেন যে, এরা আত্মাকে আর খুঁজেই পাচ্ছে না। কেন? আপনি যদি চন্দ্রমার কল্পনা করেন, কল্পনায় আপনি চাঁদে যাবেন; আগে আপনার আমিত্ব সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে আপনার মন পৌঁছায়। আগে আমিত্ব, তারপরে আসে মন; এরপর ইন্দ্রিয়গুলির কথা ছেড়েই দিন। কাম, ক্রোধ এগুলো দেহের, ইন্দ্রিয়ের; কি করে এরা আত্মার সঙ্গে টেক্কা দেবে? মনের সঙ্গেই টেক্কা দিতে পারে না, টেক্কা দেবে আত্মার সাথে! আচ্ছা ধরে নিলাম, সূক্ষ্মভাবে মনের ভিতর কাম, ক্রোধ আছে, তাহলেও আত্মার সঙ্গে কি করে সে টেক্কা দেবে! অনুরাগ বাঘ, যখন আপনি আমিত্বকে ঝাঁকা দিলেন, আপনি যখন আত্মাকে জাগিয়ে দিলেন; আত্মা এবার

দৌড়াতে শুরু করল, মন কি করে তার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে দৌড়াবে! প্রশ্নই নেই। কাম, ক্রোধ কোথায় কত পিছনে পড়ে থাকবে, আত্মার কাছে যেতেই পারবে না।

এই যে অনুরাগ বাঘের কথা বলা হচ্ছে, এটাও ঠিক আগের মত, যেখানে আগে কর্তা ও অকর্তার ভাব বললেন। এগুলো ভাব, এই ভাব একদিনে হয় না। এই ভাব একবার যখন আসবে, তখনও কিন্তু আপনার সব কিছুই থাকবে। যেমন দুর্বাসা মুনি, তাঁর রাগের শেষ নেই। বিশ্বামিত্র এমন একজন ঋষি, যাঁকে কোন কাঠামোতে বাঁধা যায় না। তপস্যা করলেন, তপস্যার ফল পেলেন, সেই ফল নিয়ে তিনি বললেন, বশিষ্ঠের সন্তানের প্রাণ নাশ করে দাও। তারপর আরও তপস্যা করতে চলে গেলেন, তপস্যাটা ছাড়ছেন না। ত্রিশঙ্কু রাজাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন। যখন স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল, তখন বিশ্বামিত্র বললেন, থেমে যাক, আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ থেকে পতন ওখানেই আটকে থাকল। সেখান বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য আলাদা একটা স্বর্গই বানিয়ে দিলেন। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর এবার পড়ে গেলেন একটা মেয়ের পাল্লায়। ভেবে দেখুন এত তপস্যা, এত কিছু করা পরেও এক নারীর প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন; কামিনী-কাঞ্চন অত সহজ জিনিস না।

বিশ্বামিত্র তপস্যা ছাড়লেন না। মেনকার পর রম্ভাকে পাঠানো হল। রম্ভার দিকে এমনে তেড়ফুড়ে তাকালেন যে রম্ভা দেখছে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিতেই আমি ভস্ম হয়ে যাব, ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে আবার স্বর্গে ফিরে এল। এই হচ্ছে লেগে থাকা। সবই থাকবে, কাম থাকবে, ক্রোধ থাকবে, হিংসা থাকবে। কিন্তু একবার যদি অনুরাগ এসে যায়; ঠাকুর বলছেন, যো সো করে একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করে নাও। আমরা ওই স্তরে বলছি না, অনুরাগ পর্যন্ত যদি এসে যায়, ছেলে যদি একবার বলে, মা খিদে পেয়েছে, মা যত অসুস্থই থাকুক, ওই অবস্থাতেও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ছেলের খাবার ব্যবস্থা করে। সন্তানের সব সময় মায়ের উপর অধিকার। সন্তানের প্রতি মায়ের এই ভালবাসা যখন ঈশ্বরের প্রতি হয়, তখন সব রিপুগুলো এক ধারে পড়ে থাকে।

আবার আছে 'অনুরাগ অঞ্জন'। শ্রীমতী বলছেন, 'সখি, চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখছি'! তারা বলে 'সখি, অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ওইরূপ দেখছ'। এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে।

যারা কেবল কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে আছে –ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? যেমন কাকে ঠোকরানো আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ। এই টপিকটা আগেও অনেকবার আলোচনা হয়েছিল। এদের দিয়ে কি করে মহৎ কাজ হবে? এখন যিনি বড় বৈজ্ঞানিক, তিনিও কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, কাজ করতে পারে না।

রিচার্ড ফাইনম্যানের গল্প বলেছিলাম, একবার ওনার মনে হল ইউনিভার্সিটি থেকে তাঁকে কম টাকা মাইনে দেওয়া হয়। তারপর কিভাবে কিভাবে অন্য ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলে তাঁরা জানিয়ে দিল ওনারা তাঁকে দুশো ডলার বেশি দেবে। ফাইনম্যান নিজের ইউনিভার্সিটিক জানালেন। ওর বলে দিল, তোমাকে চারশ ডলার বেশি দেব, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। দু-পক্ষ থেকেই বেতন বাড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ ফাইনম্যানের মনে হল, বেশি টাকা হলে কি হবে? বাড়িতে আমি একজন মিস্ট্রেস রাখব, সারাদিন মিস্ট্রেসকে নিয়ে ভাবতে থাকব, মাঝখান থেকে আমার ফিজিক্সের গবেষণার কাজ দফারফা হয়ে যাবে। বলে দিলেন আমার টাকা লাগবে না। পরিশ্রম করে উপার্জিত আপনার যে অর্থ, সেটাকে নিয়েও কত চিন্তা; ব্যাঙ্কে হিসাব মিলল কিনা, সুদ ঠিক মত দিল কিনা, ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া হল কিনা; কত চিন্তা। এসব চিন্তা মাথায় ঘুরলে উচ্চ চিন্তন কখনই হবে না। বিশেষ করে টাকা-পয়সা যদি বেশি থাকে; মেয়ে মানুষ সঙ্গে যদি থাকে, একেবারেই তা সম্ভব না। যেমন কাকে ঠোকরানো আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ; ঠাকুরের এই কথাগুলো শুনলে আমাদের কটূ কথা বলে মনে হবে। তবে আপনি যেখানে উচ্চ আদর্শের কথা বলছেন, আপনি

বলছেন, অলিম্পিকে আমি মেডেল পাব আর এখানে বলছেন, স্কুলের মাঠেও দৌড়াব না, তাতে কি আদর্শ ধরে রাখা যায়? কোথাও আপনাকে একটা শুরু তো করতে হবে।

বদ্ধজীব –সংসারী জীব, এরা যেমন গুটিপোকা। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু। ঠাকুর দুটো ভাবকেই একসাথে দেখাচ্ছেন। একদিকে উচ্চতম আদর্শ দেখাচ্ছেন, অন্য দিকে বাস্তব স্থিতি, আমরা কোথায় আছি, সেটাকেও দেখাচ্ছেন। মৃত্যু বলতে এখানে, সংসারে ডুবে থাকা, সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা, এটাই মৃত্যু। বদ্ধজীবের কথা বলার পরেই মুক্তজীবের কথা বলছেন।

যারা মুক্তজীব, তারা কামিনী-কাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটিপোকা অত যত্নের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু-একটা। বেরিয়ে আসা একেবারেই সম্ভব না, ও হয় না। অবতার এই জন্যই আসেন; কঠিন রোগ হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে ডাকতে হয়। বাংলাদেশে খুব প্রচলিত –কঠিন রোগ হয়ে গেলে একবার ভেলোর যাবে। ভেলোর গিয়েছিলাম বলার অর্থটা হল, একজন স্পেশালিস্টকে দেখানো। ঘোর কলিযুগে এই যে ভবরোগ, এরজন্যই তো অবতারকে আসতে হল।

মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। দু-একজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার ভেলকিতে ভোলে না; কামিনী-কাঞ্চনের বশ হয় না। আঁতুড়ঘরের ধুলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্ ড্যাম্ শব্দের ভেলকি লাগে না। বাজিকর কি করছে সে ঠিক দেখতে পায়। এখানে বলছেন, যাঁদের জ্ঞান হয়, তাঁরা মায়াতে ভোলে না, এই জিনিসটাই পরে যে জায়গায় আসবে সেখানে আলোচনা করব। আঁতুরঘরের ধুলহাঁড়ি, এই জিনিসটা গ্রামদেশের কোন প্রচলিত রীতি ছিল; আঁতুরঘরের ধুলহাঁড়ির ব্যাপারটা আমার ভাল জানা নেই, অন্যান্য রেফারেন্সে কোথাও এর উল্লেখ পাইনি। এর অর্থ হল, মায়াতে আবদ্ধ না হওয়ার উপায় আছে।

সাধনসিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ। এর উপরেও আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি। **কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আনতে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হল না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট করে জল আনতে হল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট করে সাধন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু-এক জন**। একজন হলেন সাধনসিদ্ধ আরেকজন কৃপাসিদ্ধ। কৃপাসিদ্ধ যিনি তাঁর আগে আগে সাধন করা হয়ে গেছে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন; ঈশ্বর যখন চান তিনি নিজের দূত পাঠিয়ে দেন। আর ঈশ্বর যখন আসেন তখন তিনি কার সঙ্গে কথা বলবেন? অবতারের কথা বলার লোক পাওয়া মুশকিল, তিনি তখন তাই এনাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আর তার সঙ্গে থাকে নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ হলেন স্বামীজী, রাখাল এনারা; কৃপাসিদ্ধ হলেন এনারা ছাড়া ঠাকুরের আশপাশে বাকি আরও যাঁরা ছিলেন। কৃপাসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধের থেকে একটু নিচে।

আর নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। সাধনসিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ তবুও ঠিক আছে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভাবলেই কেমন অবাক লাগে। স্বামীজী বিদেশে গিয়ে লেকচার দিতে শুরু করলেন, তারপর চিঠিতে তিনি নিজেকে নিয়েই লিখছেন, ওরে মোদো তোর ভিতরে এত ছিল, জানা ছিল না। স্বামীজী এত এত লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, শ্রোতারা অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন, নিজেই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর বুঝে ছিলেন, নরেন যেন ফোয়ারা, যে ফোয়ারাটা এখন বুজে আছে।

বড়লোকের পুরনো বাড়ি, সেখানে কোথায় জলের ফোয়ারা লাগানো আছে কেউ জানে না। **মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফরফর করে জল বেরুতে লাগল**। খুব সুন্দর উদাহরণ, ফোয়ারা আগে থেকেই করা আছে, কিন্তু জানে না এতে কি আছে। কিন্তু যে মিস্ত্রী সে ঠিক জানে এখানে এটা কি। নরেনকে দেখে ঠাকুর চিনে ফেলেছিলেন, এই সেই ফোয়ারা, শুধু কলটা খুলে

দিতে হবে। ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন, ফরফর করে জল বেরুতে লাগল। **নিত্যসিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক্ হয়। বলে এত ভক্তি-বৈরাগ্য-প্রেম কোথায় ছিল?** নরেন্দ্রনাথের স্কুল, কলেজের জীবন; সেখান থেকে যখন ঠাকুরের কাছে এলেন, তাঁর অনুরাগ দেখে সবাই অবাক। অবতার আসেন, তখন অবাক লাগে না। কিন্তু নিত্যসিদ্ধের যে কথা বলছেন, এনাদের দেখে অবাক লাগে। ভাগবতের যে রাসলীলার বর্ণনা, সেখানে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি কি অনুরাগ, কি ভালবাসা; নিত্যসিদ্ধ না হলে কি এই অনুরাগ, এই প্রেম-ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি হয়?

ঠাকুর অনুরাগের কথা বলিতেছেন। গোপীদের অনুরাগের কথা। আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন –

নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার।। ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –আহা কি গান! "তুমি সর্বস্ব আমার"। গোপীরা অক্রুর আসবার পর শ্রীমতিকে বললে, রাধে! তোর সর্বস্ব ধন হরে নিতে এসেছে। এই ভালবাসা। ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা। ভাগবতে অবশ্য রাধার কথা নেই, রাধার কথা, ধরো না ধরো না রথচক্র, এই ভাবগুলি পরবর্তিকালের ভক্তিশাস্ত্রে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু গোপী, অক্রুর, রথ এগুলো ভাগবতে আছে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিন্ধুমধ্যে মগ্ন হইলেন। এই কথাগুলো যদি একটু শান্ত মন নিয়ে শোনেন, তাতেই দেখবেন মনটা কেমন স্থির, শান্ত হয়ে গেছে। আর ঠাকুরের মন হল শুকনো দেশলাই। **ভক্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। আর সাড়াশব্দ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ। হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটোগ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোন দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে**।

একবার একজন মহারাজ অন্য একজন সিনিয়র মহারাজের সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন। যে মহারাজ বর্ণনা করছিলেন, সেই মহারাজ বিদেশ থেকে এসেছিলেন। তিনি একদিন এই সিনিয়র মহারাজের সাথে দেখা করতে তাঁর ঘরে গেছেন। আস্তে করে দরজা খুললেন; আমাদের এখানে নিয়ম হল কারুর ঘরে ঢুকতে হলে খুব হাল্কা করে দরজা খুলতে হবে, দেখছেন মহারাজ কথামৃত পড়ছেন, চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, বুঝলেন মহারাজ ভাবে ডুবে আছেন। তিনি দেখা না করেই আস্তে করে দরজাটা আবার বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন।

অনেকক্ষণ পর ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির মধ্যে যাঁকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি-আধটি কেবল ভক্তদের কানে পৌঁছিতেছে। ঠাকুর আপনা-আপনি বলিতেছেন, "তুমিই আমি আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি আমি খাও!...বেশ কিন্তু কচ্ছ"। মাস্টারমশাইর এটা একটা অনবদ্য বর্ণনা। সমাধিতে ঠাকুর যাঁর দর্শন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই কথা বলছেন। গোপী, অক্রুর, রথচক্র এসব নিয়ে যেভাবে বর্ণনা চলছে, তাতে স্পষ্টই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণরই দর্শন করছিলেন।

ঠাকুরের জীবনী দেখলে আমরা দেখি, ভগবান এবার ভক্ত হয়ে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতারে তিনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম নিলেন, সেখান থেকে রাজা হলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি একসাথে অনেক ধরণের ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে তিনি একজন ভক্ত হয়ে এসেছেন। শৈশবকাল থেকে শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কয়েকজন যে বিশেষ ভক্ত ছাড়া সবারই সামনে তিনি সেই তাঁর একই রূপ, ঈশ্বরের ভক্ত রূপটাই দেখিয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই গেছেন সব জায়গায় তিনি একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার রূপেই গেছেন। যার জন্য বাল্মীকি রামায়ণে কোন নাটকীয়তা নেই; রাম এই দুষ্টুমি

করল, এসব কিছু নেই; তিনি একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, এর বেশি কিছু না। শ্রীকৃষ্ণ এক পূর্ণ ব্যক্তিত্ব রূপ নিয়ে অনেক কিছু করে যাচ্ছেন। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল মুনি জ্ঞানী। বাচ্চা বয়সেই তিনি মাকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন।

প্রথমের দিকে ঠাকুরের যে সমাধি হত, সেটা কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি ছিল না। কিন্তু যিনি ভক্ত তিনিও যে জ্ঞানী হতে পারেন, যিনি ভক্ত তিনিও যে নির্বিকল্প সমাধিতে যেতে পারেন; ঠাকুর এটা নিজে দেখিয়ে দিলেন, কারণ সাধারণত এটা হয় না। ধর্মের ইতিহাস, বিশেষ করে ভারতের ধর্মের ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি, তাতে এতটুকু জানি যে, ধর্মের ইতিহাসে জ্ঞান আর ভক্তির পথকে পুরো আলাদা দেখানো হয়েছে, যদিও আলাদা কিছু নয়। আমি যে জিনিসটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তার বাইরে আমি কেন যাব? একজন মা নিজের সন্তানকে প্রচণ্ড ভালবাসে, সেই মা কেন অপরের ছেলেকে বাড়িতে এনে ভালবাসতে চাইবে? প্রশ্নই নেই।

যিনি ভক্ত, তিনি ভগবানকে পেয়ে গেছেন, তাঁর আর কিসের সমাধি, কিসের তাঁর জ্ঞান, প্রশ্নই উঠছে না। ভক্তি আর জ্ঞান, এই দুটোকে আলাদা দেখিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা জিনিসটাকেই বোঝেন না। ঠিকই, জ্ঞানপথ পুরো আলাদা পথ, ভক্তিপথ পুরো আলাদা পথ। কিন্তু যেটা তত্ত্ব, সেটা কিন্তু আলাদা কিছু না। ঠাকুরের এটা খুব unusual, যেটা সাধারণ ভাবে আমরা সচরাচর কোথাও পাই না –সেটা হল ভক্তির যে শেষ, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, তার সঙ্গে সাযুজ্য; যদিও সাযুজ্যকে নিয়ে অনেক সংশয় আছে। সাযুজ্য কি নির্বিকল্প সমাধি? কিন্তু সাধারণ ভাবে যেটা বলা হয়, যাঁরা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা সমাধি চান না। ঠাকুরও চাননি। তোতাপুরী যখন অদ্বৈত সাধনার কথা বলছেন, তখন ঠাকুর বলছেন, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। অনেকে বলেন, জ্ঞানী শেষে ভক্ত হয়ে যান; আমি জানি না কোন জ্ঞানী শেষে ভক্ত হয়েছেন কিনা। কিন্তু ভক্ত শেষে জ্ঞানী হন, ঠাকুর ছাড়া অন্য কাউকে আমরা জানি না, ইতিহাসে আমরা পাই না। একমাত্র ঠাকুরকেই দেখি যেখানে তিনি একজন পুরো ভক্ত।

আপনারা বলবেন, কেন স্বামীজী? ঠাকুর স্বামীজীকে দিয়ে যে সাধনা করিয়েছিলেন, তিনি ধাপে ধাপে করিয়েছিলেন। কারণ ঠাকুর জানতেন, স্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য হবেন। যাঁরা আচার্য হন, তাঁরা অন্য ক্যাটাগরির, আচার্যের সঙ্গে সাধকের তুলনা করতে যাবেন না। চৈতন্য, উনি আচার্য, ওনার সঙ্গে আমার আপনার তুলনা করতে যাবেন না। জ্ঞানী, ভক্ত, এগুলো সাধককে নিয়ে বলা হয়। কিন্তু ঠাকুর ভক্ত রূপে এসেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুও ভক্ত রূপেই এসেছিলেন। কিন্তু এই যে, 'তুমিই আমি আমিই তুমি' এটা আমার আপনার ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম, ঠাকুর যেখানে বলছিলেন, হে ঈশ্বর তুমি কর্তা, আমি অকর্তা; এরই নাম জ্ঞান। প্রসঙ্গটা যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম, সেখানেও একই কথা বলা হচ্ছে –তুমিই আমি আমিই তুমি। এই জায়গাতে ঠাকুর এখনও সমাধি অবস্থায় আছেন। কিন্তু সমাধি থেকে বাস্তব জীবনে নেমে এসে 'তুমিই আমি আমিই তুমি' এই অবস্থায় থাকা, খুব উচ্চমানের যাঁরা এটা তাঁদেরই হয়; সাধারণ অবস্থায় এটা হতে পারে না। এই কথা বললে লোকে পাগল বলবে।

এ কি ন্যাবা লেগেছে। চারিদিকেই তোমাকে দেখছি!

কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!

প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইলেন। ঘর নিস্তব্ধ। ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে –অতৃপ্ত নয়নে বারবার দেখিতেছেন। এই যে মহাভাবময় ঠাকুর, এটা একটা পুরো আলাদা বিষয়।

কথামৃতকার খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, 'মহাভাবময় ঠাকুর'। ভাব যে শুধু ভক্তি পথেই হয় তা না, ভাব অন্য পথেও হতে পারে; মন যেখানে ডুবে যায়। আমরা যে বর্ণনাগুলি পাই, তাতে একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুকে পাই, যেখানে এত মুহুর্মুহু, এত ঘনঘন ভাব হত। অন্যান্য যে অবতাররা ছিলেন বা আচার্যরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই জিনিস পাই না। তাঁদেরও এই রকম ঘনঘন ভাব হত কিনা আমরা জানি না। কিন্তু ঠাকুরের এই ভাব এত বেশি, কথায় কথায় ঈশ্বরে ডুবে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে, এত রকমের ভাব, কল্পনাই করা যায় না। স্বামীজী তাই বলছেন, অবতারবরিষ্ঠ। এই যে মহাভাবময় ঠাকুর, শুধু এইজন্যই ঠাকুর অবতারবরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি ভগবান –এই দুটোর মাঝখানে যে দেওয়াল, সেটা এত পাতলা যে একটুতেই এপার-ওপার হয়ে যাওয়া যায়। 'মহাভাবময়', মাস্টারমশায়ের শব্দ চয়ন এত সুন্দর। তিনি কবি ছিলেন না, তিনি মৌলিক কিছু রচনা করছেন তাও না; তাতেও কি সুন্দর ভাষার ব্যবহার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ, তাঁহার মুখে ঈশ্বরের বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও সমাধিতে। **ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভক্তের চতুর্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত অধর সেন কয়টি বন্ধুসঙ্গে আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন**। অধরের বন্ধু সারদাচরণের পুত্রশোক হয়েছে। করোনাকালে আমরা দেখেছি চারিদিকে শুধু শোকের ছায়া। আপনাদের কারুর না কারুর শোক হয়েছে। আমাদের যাঁরা আপনজন, বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁদের অনেকেই করোনার কারণে শোক পেয়েছেন। বলছেন যে, বড়ছেলে মারা গেছে, কিছুতেই সান্ত্বনালাভ করতে পারছেন না। কি করে পারবে! আমাদের সমস্ত ভালবাসা একটা জায়গায় বন্ধকের মত রেখে দেওয়া আছে, তারপর সেই জায়গাটা চলে গেল, শোক সামলানো খুব কঠিন। মহাভারতে কৌরব-পাণ্ডবদের জুয়া খেলার কথা ভাবুন –একটি দানের উপর সব কিছু নির্ভর করছে; জীবনে কক্ষণ এটা করতে নেই।

ইংলিশে খুব সুন্দর একটি কথা আছে –Don't keep all your eggs in same busket। যদি সমস্ত ডিম একটি টুকরিতে রাখতে হয়, তাহলে সেই টুকরি যেন ভগবান হন। এক টুকরিতে সমস্ত ডিম কখনই রাখতে নেই। যদিও বা রাখেন, ওই টুকরিটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কান্নাকাটি করবেন না; বলবেন, It was my choice। মানুষ যত শিক্ষাই পাক না কেন, কাজের সময় এলে সেই পাখিদের মত বলতে শুরু করবে –শিকারী আয়েগা, জাল বিছায়গা; এই গল্প অনেকবার বলেছি। শিকারী জাল ছড়াচ্ছে, তার উপর দানা দিতে শুরু করতেই সব পাখিগুলো ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীবনকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি, সেখান থেকে আমি একটি শিক্ষা পেয়েছি, তা হল, একটির উপর নিজের সমস্ত সম্পদ লাগিয়ে দেবেন না।

আপনার জীবনের মূলধন হল মন, মন ছাড়া আপনার কিছু নেই। মনটাকে কখন ডানদিক বামদিক হতে দেবেন না। এমন কোন কিছু করবেন না, যাতে মন ডানদিক বামদিক চলে যেতে পারে। মদ খাওয়া, গাঁজা খাওয়া, ড্রাগস নেওয়া এগুলোতে মনের শক্তির অপচয় হয়। ইমোশানস্ যার প্রতিই হোক, বাবা হোক, মা হোক, স্বামী হোক স্ত্রী হোক, সন্তান হোক, বন্ধু হোক, প্রেমিক হোক, প্রেমিকা হোক; যদি রেখেছেন জানবেন আপনার মূলধন হারাতে চলেছেন। যাঁরাই বলেন মন লাগে না, যাঁরাই বলেন কাজ করতে পারি না, পড়াশোনা পারি না, বুঝবেন অনেক জন্মজন্মান্তর ধরে তাঁরা নিজের মনকে নষ্ট করেছেন। মূলধনকে আমি জন্মজন্মান্তর ধরে নষ্ট করছেন আর এখন এসে বলছেন, মন লাগছে না, মন চঞ্চল। এখন আপনার সময় হয়েছে, শাস্ত্র শুনছেন, এবার মনকে সামাল দিন। এত সহজ ভাবে শাস্ত্র কোনদিন পাওয়া যায়নি। টেকনলজির উন্নতির জন্য আজকে ঘরে বসে হিন্দুদের যেটা শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র, তার আলোচনা শুনতে পারছেন। নিজের মূলধনটা নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না। কিন্তু মানুষ পুরো মূলধনটা

একজনের উপর গিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। এই জিনিস অন্ততঃ আপনারা করবেন না; যদি করেন কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যাবেন। যদি কোথাও মূলধন কাজ লাগাতে হয়, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কোথাও লাগানো যাবে না।

সমাধি ভঙ্গ হইল; ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একঘর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।

ঠাকুর এবার অমৃতবাণী পরিবেশন করতে শুরু করেছেন। মাস্টারমশায় বলছেন, **ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন?**

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়। এক-একবার দীপ শিখার ন্যায়। না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায়। দীপশিখা অনেকক্ষণ থাকে, কিন্তু সেটাও না, সূর্যের কিরণ। কি রকম? **ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা –অনুরাগ নাই**।

ঠাকুর হলেন উত্তম গুরু, উত্তম আচার্য; কোন ঢাকাঢাকি, চাপাচুপি নেই। স্বামীজীরও ছিল না, প্রথমের দিকে আমেরিকায় গিয়ে সামান্য একটু চাপাচুপি করেছিলেন, খুবই সামান্য। কিন্তু তারপর? যেন খাপখোলা তলোয়ার। খ্রীশ্চানদের মুখের উপর বলতে শুরু করলেন –তোমরা খ্রীশ্চানরা আমাদের উপর যা করেছ, পুরো প্রশান্ত মহাসাগরের সব কাদা তোমাদের মুখের উপর ছুড়ে মারলেও কিছুই করা হবে না। আজকেও হিন্দুদের সেই দুরবস্থা। অন্যান্য ধর্ম, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু পড়াশোনা করা লোক হিন্দু ধর্মের পিছনে পড়ে আছে, দিনরাত হিন্দুদের, হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দিয়েই যাচ্ছে। একজন খুব দুঃখ করে বলল, আমরা তো বাচ্চা বয়সে খুব শিখেছিলাম – ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম। কিন্তু আজকে এমন পরিস্থিত করে দিলে যে, আমাদের আলাদ করে বলতে হছে 'জয় শ্রীরাম'। কেন এতো কাদা ছোড়াছুড়ি? ঠাকুরের এখানে ঢাকাঢাকির কিছু নেই, পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন। বলছেন, বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা –অনুরাগ নাই।

অনেক আগেকার কথা, আমাদের তখন ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমরা শুনেছি, মহারাজ সব সময় জপ করতে থাকেন। একটু ফাঁকা পেলেই ওনার কাছে যেতাম, কিছু মনে করতেন না। উনি সেই সময় ইংরাজীতে এই কথাটি বলেছিলেন -We believe that we believe God। প্রথম ওনার কাছে এই কথাটা শুনেছিলাম বলে আমার খুব ভাল লেগেছিল –আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। তখন আমি ইয়ং ব্রহ্মচারী, যে কথাটাই শুনছি সেটাই আমার কাছে নূতন শুনছি বলে মনে হত। ঈশ্বরের নাম শুনে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে, ভোগের ব্যাপার যখন আসে, সেখানেও তখন তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে শুরু করে দিই।

ঠাকুর এটাই বলছেন, **বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা –অনুরাগ নাই। বালক যেমন, বলে তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে 'পরমেশ্বরের দিব্যি' শিখেছে**। একটু যদি বিচার করেন। এমন কিছু না, খুব সহজ। গত সাতদিন পিছিয়ে গিয়ে দেখুন, আপনার জীবনের শুধু সাতদিন দেখুন কি কি কাজ করে, কি কি কথা শুনে, কার কার সঙ্গে দেখা হয়ে আপনার ভাল লেগেছে, আনন্দ পেয়েছেন। আপনি দশটি জিনিস পেয়ে যাবেন, তার মধ্যে ঈশ্বরও আছেন। আমাদের ক্লাশ শুনে আপনার ভাল লাগছে কোন সন্দেহ নেই, কোন মহারাজের সঙ্গ হয়েছে, কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা হয়েছে, ঠাকুরের কোন স্বপ্ন দেখেছেন, ভাল লাগারই কথা। কিন্তু দেখবেন এর সাথে আরও দশটা অন্য কিছুও হয়েছে। অনুরাগ যখন হবে তখন এগুলো পুরো বন্ধ হয়ে যাবে। অনুরাগ মানেই যেখানে ঈশ্বর বই আর কিছু নেই।

বাইবেলে যীশু খুব সুন্দর বলছেন, সব কিছুতে ‘ইয়ে ইয়ে নে নে’ করে যাবে; আমাদের ভাষায় ‘বাঃ বাঃ বেশ বেশ’। বর্তমান ভাইস প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজীকে কবে থেকে দেখছি, ওনাকে কোন কিছু কথা বা ঘটনা বললেই বলবেন –ও তাই নাকি! শুধু সুরটা পাল্টাতে থাকে। কেউ মারা গেছেন, বলা হল –ওহো তাই নাকি। ভাল কিছু বলা হল –ও তাই নাকি। এর বাইরে কোন কিছু নেই। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে খবর দিই, মহারাজ, ‘ইউটিউবে আমাদের এখন এক হাজার ভিডিও হয়েছে’। শুনেই সেই এক কথা –ও তাই নাকি, বাঃ বাঃ। এইভাবে সব কিছুকে কাটিয়ে যেতে হয়; এটাই হল জীবন চালানোর পদ্ধতি। যাকে দেখবেন –ও তাই নাকি; একটাতে প্রশ্নবোধক, আর অন্যটাতে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। এর বেশি যদি হয়, তাহলে বুঝবেন ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ এখনও আসেনি।

বিষয়ী লোকদের রোখ নাই। হল হল; না হল না হল। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুল, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর-এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেইখানেই খুঁড়বে তবে তো জল পাবে।

সব ভাষাতেই প্রেমের কবিতা আছে। প্রেমের গানে বলে, তোমাকে আমি সব দিলাম, আমি তোমার হলাম। তারপর আর-একজন ভাল কাউকে পেয়ে যায়, তখন সেখানে সংলাপ একই থাকে, মানুষটা পাল্টে যায়। আজকে একে বলছে, তোমার জন্য সব ছাড়লাম, কাল আর-এক জনকে বলছে তোমার জন্য সব ছাড়লাম। কিন্তু জীবনে হয়তো একজনকে নিয়েই সে এই কথা বলেছে, কিন্তু কথা রাখতে পারেনি, সেটা অন্য ব্যাপার; কিন্তু তাঁর ইচ্ছাটা অবশ্যই ছিল যে একেই সে সব দেবে। এই ভাবটা ঠাকুরের উপর দিতে হবে। হে ঠাকুর, আমার সব কিছু তোমাকে সমর্পণ করলাম, আমি তোমাকেই চাই, তোমার বাইরে আমি আর কিছু চাই না।

আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল, ধর্মে মুসলমান, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, খুব দুঃখ পেল, অনেক কান্নাকাটি করল। পরে সে বিরাট লোক হয়ে গেল, দিল্লিতে থাকত। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে খুব খাতির করত, সম্মান করত। ২০১০ সালে মারা গেল, অনেক দিন হয়ে গেল। ওর স্ত্রী বিদেশীনি, কিন্তু এখনও পুরো আপনজনের মত সম্পর্ক। দুটি মেয়ে, এখন বড় হয়ে গেছে, বেলজিয়ামে থাকে। এখনও মেয়ে দুটির সাথে আমার যোগাযোগ, রোজই হোয়টসাপে সকালে গুডমর্নিং পাঠাই। ওখানে কলেজে পড়ে। ছুটি পেলে ভারতে আসে, এবার জন্মাষ্টমীর দিনে ভারতে এসেছে। জন্মাষ্টমীর দিন এত সুন্দর একটা মেসেজ পাঠিয়েছে; মুসলমান, বিদেশীনি, ভাবতেই পারিনি জন্মাষ্টমীর উপর একটা চমৎকার মেসেজ পাঠাবে। আমি শুধু ‘শুভ জন্মাষ্টমী’ পাঠিয়েছিলাম।

লিখছে, কৃষ্ণের বাঁশির মত আমাদের জীবনটাও ফাঁপা হয়ে যাক। বাঁশির ছিদ্রগুলি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুর যেমন বেরোতে থাকে, আমাদের জীবনেও যেন ভগবানের সুর বেরোতে থাকে। এর অর্থ হল, আমার আমিত্ব যেন না থাকে, ভগবান যা করবার তিনি তাই যেন করান।

পড়ার পর আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে মেসেজ করলাম, তুমি এই ভাব কোথায় পেলে? লিখল যে, ও আর ওর এক বন্ধুর সাথে জন্মাষ্টমী নিয়ে কথা হচ্ছিল, সেখানে একটার পর একটা বলতে বলতে এই জায়গাটায় পৌঁছে ছিলাম। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু বলা যায় ঠিকই, কিন্তু এখানে কৃষ্ণের বাঁশিকে অবলম্বন করে বলছে, আমার জীবন যেন কৃষ্ণের বাঁশির মত ফাঁপা হয়ে যায় আর ছিদ্র দিয়ে যেন কৃষ্ণের বাঁশির সুরের লহরী যেন খেলা করতে পারে। কলেজের একজন ছাত্রী এত উচ্চমানের কথা বলবে, ভাবাই যায় না, অবাক হয়ে যেতে হয়। এই যে ভাব, এই ভাবকেই যখন জীবনে নামানো হয়, এটাকে বলে রোখ। ঠাকুর পরে আমমোক্তারি দেওয়ার কথা বলবেন।

জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে –
দোষ কারু নয়গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

প্রথমে ঠাকুর বলছেন, বিষয়ীদের রোখ নাই; এটা হল প্রথম পয়েন্ট। সেখান থেকে দু নম্বরে এসে বলছেন, জীব যেমন কর্ম করে। শুক্রবার দিন আমাদের রামায়ণের ক্লাশ হয়, সেখানে রাম, সুগ্রীব, বালীবধের কথা বলা হয়। শনিবার মাণ্ডুক্যকারিকা, তাতে বলছেন সৃষ্টি নেই। রবিবার গীতা, সেখানে বলছেন, সব তিনটে গুণের খেলা। তারপর বেদের ক্লাশ, সেখানে বলছেন, হে প্রভু! টাকা দাও। সব কটা কথাই কিন্তু এক, কোন তফাৎ নেই। যেদিন এটা বুঝতে পারবেন, বুঝবেন এবার আপনি হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে শুরু করেছেন।

যদি আমাকে বলেন, এক কথায় আমাকে পরিষ্কার করে বলুন কি সেই একটি কথা? তাহলে আমাকে বলতে হবে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তোমার জন্য না। এখন তুমি আমের ভেপু নিয়ে বাজাতে থাক – পিইইইই, ওই একটি সুর তোমার জন্য। অন্যান্য ধর্মও তাই, ওই একটা পিইইইই সুরকে ধরে আছে। হিন্দু ধর্ম হল সেই ধর্ম, যেখানে সাত সুরের খেলা চলে, এখানেই রাগরাগীনির খেলা হয়। রামায়ণে বালীবধ, মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, মাণ্ডুক্যকারিকার সৃষ্টি বলে কিছু নেই; সবাই একই কথা বলছেন। ঠাকুরও কেমন সাত সুরের খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, শুরু হল 'রোখ নেই' দিয়ে; সেখান থেকে এক ধাপ সরে এসে বলছেন, জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়, তারপর দোষ কারু নয়গো মা, বলতে না বলতে অজ্ঞান কি, তাতে নেমে যাচ্ছেন।

আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি আমি করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়।

আমরা যাকে আমি মনে করছি, আসলে আত্মা ছাড়া কেউ নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাণ্ডুক্যকারিকা শুরুই করছে জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর সুষুপ্তির অবস্থার কথা দিয়ে। তিনটে অবস্থাই আলাদা আলাদা, কিন্তু আমি এই তিনটে অবস্থাতে এক ভাবে আছে। জাগ্রত অবস্থায় আমি জানি, স্বপ্নাবস্থায় আমি এই দেখছিলাম, সুষুপ্তি অবস্থায় গভীর নিদ্রায় ছিলাম, আমার কিছু মনে নেই –আমি এক ভাবে থাকছে। এটাই জ্ঞানযোগ। জ্ঞান বলুন, ভক্তি বলুন, কর্ম বলুন; এগুলো আলাদা কিছু না। কিছু তো তফাৎ আছে, অল্প একটু তফাৎ আছে বলেই এগুলোর পথ আলাদা। কিন্তু মূল জিনিসটা পালটায় না।

আমাদের সমস্যা হল; আমেরিকা এখন ফাস্ট ফুড নিয়ে এসেছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ফাস্ট ফুড আমরা অনেক আগেই বার করে দিয়েছি। একবার হরেকৃষ্ণ বলে হরিনাম কর, এতেই সব হয়ে যাবে, এরপর তিনি দেখবেন। হরিবোল গাঠরি খোল, আবার আছে, কেশব কেশব, গোপাল গোপাল, হরি হরি, হর হর। এগুলো সব চালাকি। কারণ ফাস্ট ফুড হলে শরীরটাও সেই রকমই হবে। ধর্ম এভাবে হয় না। কবীর দাস বলছেন, নিজের মুণ্ডু কেটে মাটিতে রাখবে, তখন প্রেমের ঘরে প্রবেশ পাবে, তার আগে হয় না। ঠাকুর বলছেন, যাকে আমি আমি বলছ, দেখবে আত্মা বই কেউ নয়।

বিচার কর –তুমি শরীর না মাংস না, না আর কিছু। তখন দেখবে তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গুণও নাই। পাপও নাই, পূণ্যও নাই।

মজার ব্যাপার এখানে, একটি বাক্য বললেন – জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। পরের বাক্যে এসে যাচ্ছে, তুমি যে আমি আমি করছ, এটা সবই আত্মা। তখন দেখে আমার দোষও নাই, গুণও নাই, কিছু নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শুধু কৃষ্ণকথা দেখা যায়, বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণ এটা করছেন,

সেটা করছেন, সেখান থেকে চীরহরণ, সেখান থেকে রাসলীলা; তখন বোঝা যায় এই ধরণের কত রকম লীলা ভগবান করেন; অথচ শ্রীকৃষ্ণ সেই শুদ্ধ নির্লিপ্ত আত্মা। আমি আপনিও কিন্তু তাই। আমরা লীলা করছি না, কারণ ওটা করার জন্য আগে খাটতে হয়। প্রচুর খাটাখাটনি করে ঈশ্বরের প্রতি যখন পূর্ণ সমর্পণ ভাব আসবে, আর নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু যখন অনেক করা হয়ে যাবে, তখন সেই অবস্থায় যাবে।

প্রথমে তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে কাটিয়ে, রজোগুণকে সত্ত্বগুণ দিয়ে কেটে সত্ত্বগুণের পারে যেতে হবে, তখন এই ভাবগুলো আসে –নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। ঠাকুর এখানে যে বলছেন, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নন, এটাকে আপনারা মাথায় বসিয়ে রাখবেন। কত উচ্চমানের কথা, তুমি সেই আত্মা। থিয়োরেটিক্যাল কিছু এখানে বলছেন না, বলছেন, তুমি বিচার করে দেখ। মায়েরা যাঁরা রান্না করেন, সেই মায়েরা যখন ছোট্ট শিশু ছিলেন, তখন তাঁরা মা-বাবার কোলে কত খেলা করেছেন, তখনও তাঁরা সেই আত্মা ছিলেন, আমি আমি করতেন। তাঁদের বিবাহ হল, আমার স্বামী, আমার পরিবার বলতে লাগলেন; তার মানে বিয়ের পরেও তাঁরা সেই আত্মাই ছিলেন। তারপর একদিন মা হলেন, তখনও তাঁরা সেই আত্মা, আমার সন্তান, আমি মা, আমিটা থেকে যাচ্ছে। আর আজ যাঁরা দিদিমা, ঠাকুরমা হয়ে থাকেন, তাতেও তাঁরা সেই আত্মাই আছেন, এখনও আমি আমি করে যাচ্ছেন। এই আমি জিনিসটা সব সময় থেকে যাচ্ছে; এই আমির উপর, এই আমিকে কেন্দ্র করে যে কত কিছু, কত রকমের জিনিস খেলা করে যাচ্ছে, এগুলো বিচার করতে হয়।

স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের খুব নামকরা বই 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন' ইংরাজীতে Meditation and Spiritual Life, সেখানে তিনি খুব সুন্দর কথা বলছেন –মানুষ মরে যাবে, তবুও গভীর চিন্তা করবে না। অত চিন্তা করত পারছি না, একটু সহজ করে বলে দিন না মহারাজ। শেক্সপিয়ারকে কি আপনি বাংলায় পড়বেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়তে গেলে তামিল ভাষার অনুবাদ পড়তে হবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়তে হলে আপনাকে বাংলায় পড়তে হবে। শেক্সপিয়ারকে পড়তে হলে আপনাকে ইংরাজীতে পড়তে হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেখা যে –আমার দোষও নেই, গুণও নেই, পাপও নেই, পূণ্যও নাই।

এটা সোনা, এটা পেতল –এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা –এর নাম জ্ঞান। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এটাই –আত্মা ছাড়া কিছু নেই।

ঈশ্বরদর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। বিচার করে করে যেখানে পৌঁছাবেন সেখানে দেখবেন, এই যে আমি, এটাই আত্মা। যখন জেনে গেলেন আপনি সেই আত্মা, এরপর আর কিসের বিচার। হাওড়া স্টেশন সব সময় ব্যস্ত স্টেশন, আপনি সেখানে গেছেন আপনার বন্ধুকে রিসিভ করতে। আপনি চারিদিকে চোখ রাখছেন বন্ধু কোথায়। বন্ধুকে একবার পেয়ে যাওয়ার পর আর কি ওই জনসমুদ্র আপনার জন্য থাকবে! কে আসছে কে যাচ্ছে তাতে আমার কি আর আসে যায়, আপনি এখন বন্ধুকে নিয়ে ব্যস্ত। আর কিসের জন্য আপনি এদিক ওদিক তাকাতে যাবেন। কত লোকজন আসছে, যাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, কোন দিকে আপনার আর নজর নেই। **ঈশ্বরলাভ করেছে, অথচ বিচার করছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নামগুণগান করছে**। যেমন আচার্য শঙ্কর, এনাদের মত আচার্যরা লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর, জীব, জগৎ এগুলোকে নিয়ে বিচার করেন। যেমন দেবর্ষি নারদ সর্বদা বীণা বাজিয়ে প্রভুর নামগুণগান করে যাচ্ছেন, লোকশিক্ষার জন্য।

ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তারপরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে। ঠাকুর এই জিনিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতেন। ধর্ম আর আমাদের জীবন আলাদা কিছু না। ধর্মে যা কিছু আছে, তার সব কিছু উপমা আমাদের জীবনেই পেয়ে যাব।

তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব –হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় –সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্তমান। এগুলো পড়ে অনেক ভক্ত মনে করেন, আমাকেও বাচ্চার মত হতে হবে, তারপরেই ছেলেমানুষী করতে শুরু করে দেন, ঢং ঢাং করতে থাকেন। তা না, মূল হল –শিশুর মত সহজ সরল হওয়া, শুদ্ধ জলের মত মনটা নির্মল হওয়া। এগুলো অন্যান্য শাস্ত্রেও আছে, গীতাতেও এর উপর আলোচনা রয়েছে। আগে ঠাকুরও বর্ণনা করেছেন, পরেও আবার করবেন – কোন কিছুতে তাদের আঁট থাকে না; মাকে ছাড়া জগতের আর কিছুর প্রতি তার দৃষ্টি নেই, কেবল মার প্রতি আঁট, ইত্যাদি। ঠাকুর আপন মনে বলে যাচ্ছেন।

ঠাকুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্রশোকের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান গাহিতেছেন।

এই দেখুন, এতক্ষণ এত কিছু বলছিলেন, আমি, আত্মা, কর্ম; কিন্তু যিনি শোকসন্তপ্ত, তাঁকে উদ্দেশ্য করে গান গাইছেন –'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে'। কাল একবার প্রবেশ করলে সব শেষ, কেউ বাঁচাতে পারবে না। রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। কেউ আটকাতে পারবে না। তারজন্য কি করতে হবে, তুমি রণবেশে আসছ, ঠিক আছে, আমিও সমরে সম্মুখীন হওয়ার জন্য সাজ পরে তৈরী। এই কালের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই আমাদের সমস্যা, আমরা আগে থেকে প্রস্তুতি নিই না। আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। আগামীকাল যখন কাল আসবে, তখন সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে হবে। শুধু নিজের জন্য প্রস্তুতি নিলে হবে না, আপনার আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদেরকেও প্রস্তুতি করিয়ে দিতে হবে। তবে প্রত্যেক মানুষকে নিজের পথ নিজেকেই বার করে নিতে হয়, উপদেশ দিয়ে কেউ পথ বার করে দিতে পারে না। যেটা করার কথা, সেই জিনিসটা আপনাকে করতে হবে। আপনার মৃত্যু আসবে, আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদের মৃত্যু আসবে, প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।

কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে। দু-বছর ধরে আমরা করোনারূপী কালের তাণ্ডবনৃত্য প্রত্যক্ষ করলাম। **তাঁর নামরূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা**। যুদ্ধ করলে কি মৃত্যু খালি হাতে ফিরে যাবে? তার কাজই হল মারা, যখন আসবে সে মেরে রেখে তবে যাবে। আমার এক বন্ধু বিহারের খুব সুন্দর বর্ণনা করেন। কোন গাড়ি আপনাকে ধাক্কা মারল। আপনি গাড়ির মালিকের দিকে যদি তেড়ে যান তখন বলবে, 'ধাক্কাই না লাগা, শরীরের কোন অঙ্গ তো ভেঙে যায়নি'। যদি ভেঙেও যায়, তখন বলবে, 'তো কেয়া হুয়া, হসপিটাল তো নেই জানা পরা'। যদি হাসপাতাল যাওয়ার দরকার হয়, তখন বলবে, 'তো কেয়া হুয়া, মরা তো নেই গিয়া না'। যদি মরেও যায়, 'তো কেয়া হুয়া, নরক তো জানা নেই পরা'। নরকে যদি যেতে হয়, সেটা তোমার দোষে যাচ্ছ। আমি তো আর তোমাকে নরকে পাঠাইনি। খুব মজা করে বলতেন; কোন কিছুতে নিজের উপর দোষটা নেবে না। বাংলায় ঠিক উল্টোটা হয়।

কিভাবে থাকবে? গ্রামদেশে কারুর বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, সে বসে বসে কাঁদে। বাকিরা সমস্ত উৎসাহ নিয়ে আগুনটাকে নেভানোর চেষ্টা করে। কারণ নিজের বাড়িতে তো আগুন লাগেনি। উপায় কি? নিজের বাড়িতে আগুন লাগতে দেবেন না। মানে, ঠাকুরকে মনে রাখবেন; ঠাকুরই হলেন নিজের বাড়ি। ঠাকুর তো আর মরবেন না। তিনি আর যাই করুন নিজের বাড়িতে আগুন লাগতে দেবেন না। সন্তান মরে যাচ্ছে, সন্তান কিন্তু আপনার আসল বাড়ি নয়। স্বামী মরে যাচ্ছে, সেও আপনার বাড়ি না। আপনার আসল বাড়িতো ঠাকুর। নিজের বাড়িতে আগুন লাগতে দেবেন না। নিজের বাড়িতে যদি আগুন লাগার ভয় থাকে, তাহলে কি আর করা যাবে, সবারই যা হয় আপনারও তাই হবে। নিজের বাড়িতে থাকুন, এটাই সহজ পথ।

আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। ঠাকুরের যে ঘর, ঠাকুরের যে সংসার শুধু ঈশ্বরই আছেন, আর কোন কিছু নেই।

তাঁকে আমমোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন। আমার বন্ধুর যে মেয়েটির কথা বললাম, যে বাঁশি সেখান থেকে শুধু কৃষ্ণের সঙ্গীত বেরোচ্ছে। আমমোক্তারি দেওয়া মানে, ঠাকুরই আছেন, আমার কিছু বলার নেই, তিনি যেমনটি করবেন, যেমনটি দেবেন; তেমনটিই হবে, এখানে আমার আর কি বলার আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী যাঁরা খুব মনযোগ দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন; হঠাৎ করে কেউ মারা যাওয়ার খবর শুনেই মা বলে উঠতেন, হে ঠাকুর! ওকেও তুমি নিয়ে নিলে? তাছাড়া তো আর কিছু বলার নেই, করার নেই, তিনি তো শুনবেন না। কাকে নিয়ে যাবেন, কেন নিয়ে যাবেন; আমরা প্রশ্ন করতে পারিনা। তাঁর জিনিস তিনি নিয়েছেন। আমমোক্তার জিনিসটা আমরা গিরিশ ঘোষের জীবনে ভাল পাই। আমমোক্তারি সবারই জীবনে একবার করে দেখতে হয়। শুধু তিনটি মাস করে দেখুন। থিয়োরেটিক্যালি প্র্যাক্টিস করুন –ভালমন্দ যেটাই হবে, সবই ঠাকুরের ইচ্ছাতে হচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, দায়ীত্ব ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিই আর আমাদের বদমাইসি, দুষ্টুমি এগুলোকে আমরা ধরে রাখি। এখান থেকে ঠাকুর আবার সাধারণ বিষয়ে চলে যাচ্ছেন।

তা শোক হবে না গা? আত্মজ। রাবণ বধ হল; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই –যেখানে ছিদ্র নাই। লক্ষ্মণ এসে রামচন্দ্রকে বলছেন, রাম তোমার বাণের কি মহিমা। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, **ভাই হাড়ের ভিতর যে-সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে। ওই ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে**। তাহলে কি বসে বসে কাঁদব? সঙ্গে সঙ্গে তখন ঠাকুর বলছেন –

তবে এ-সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দুদিনের জন্য। তালগাছই সত্য। দু-একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দুঃখ কি? এই হলেন আচার্য। আপনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে বলছেন, হ্যাঁ এই রকমই হয়। পর মুহূর্তেই টেনে উপরে নিয়ে চলে গেলেন।

ঈশ্বর শব্দ আসে ঈশ্ ধাতু থেকে, যার অর্থ নিয়ন্তা, যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই ঈশ্বরের কি কাজ? **ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন –সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজগুলি বার করবেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতা-কাঁতার হাঁড়ি থাকে। (সকলের হাস্য) তাতে শশাবিচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি ছোট ছোট পুঁটলিতে বাঁধা থাকে**। গ্রামদেশে আগেকার দিনে গিন্নীদের কাছে ওই রকম হাঁড়ি থাকত, তাতে এগুলো রাখা থাকত। আমরাও ছোটবেলায় গ্রামদেশের বাড়িতে দেখেছি।

দেখছেন একজন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে এসেছেন। ঠাকুর প্রথমে গান করলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তার সঙ্গে বলছেন, সব অনিত্য। তার সাথে বলছেন, তাঁকে আমমোক্তারি দাও। কষ্ট তো তাও হয়; হোক, শোক যতটা কম করতে পারেন ভাল। আমাদের ক্লাশে এক ভদ্রমহিলা আসতেন। একদিন এসেছেন, দেখছি চেহারাটা কেমন যেন শ্রীহীন। উনি বললেন, ওনার স্বামী গত হয়েছেন, সবে তিন-চার মাস হয়েছে। শুনে আমি চমকে উঠলাম। বলছেন, 'মহারাজ, শুধু আপনাদের ক্লাশ শুনে শুনে নিজেকে ধরে রেখেছি'। শুনে ভাল লাগল। ওনার কি আমার কথা শুনে ভাল লাগছে? শাস্ত্র কথা, শাস্ত্রের কথা সমর্পণানন্দ বলছেন, কি অন্য কোন আনন্দ বলছেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সবটাই সেই ঠাকুরেরই

কথা। সেই আকাশের জল হাতির মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। আমাদের কথাতে কি শক্তি হবে? ঈশ্বরীয় কথাতেই শক্তি হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অধরের প্রতি উপদেশ –সম্মুখে কাল

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) –তুমি ডিপুটি (অধর সেন তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। **এ–পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের একপথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য**।

সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়তাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে দায়ীত্বগুলি কমে যায়। সংসার কর্মভূমি, এটাকে আপনাদের মাথায় বসিয়ে নিতে হবে। সারাটা দিন, সারাটা জীবন, একে তিনটে রূপ দিয়ে দিতে হবে। প্রথম, ঠাকুরের যে অনন্ত রূপ, ঠাকুরের যে অখণ্ড রূপ; এটাকে নিজের ভিতরে সব সময় জাগিয়ে রাখার চেষ্টা। জপধ্যানের সময় না, জপধ্যান হল পার্টটাইম বিজনেস; অখণ্ড রূপ ফুলটাইম বিজনেস। ঠাকুরের অখণ্ড রূপকে মনের মধ্যে বসিয়ে রাখা, এটাই আপনার জীবনধারা। দ্বিতীয় হল, যে মানুষজনদের সাথে আপনি আছেন; ভাল লোক, দুষ্ট লোক, কাজের লোক, যাদের সঙ্গে কাজ করতে হয়; এনাদেরকে মাথায় রাখা যে, এনারা হলেন ঠাকুরের মূর্তরূপ। ঠাকুর সশরীরে এই রূপে আপনার কাছে এসেছেন। ঝগড়া করবেন, ভালোও বাসবেন; কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এনারা সবাই ঠাকুরের মূর্তরূপ। তৃতীয় হল, যে কাজগুলো করছেন, তা যে কোন কাজই হোক না কেন, সব কাজকে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করা, এটাই হবে আপনার জীবনধারা।

সারাটা দিন স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ঠাকুরময় হয়ে যাবে। আমি যে কথামৃত বিস্তারে বর্ণনা করছি, এটা ঠাকুরের বাণীরূপ। গানে আছে, বাণীরূপে রহিয়াছ। ঠাকুরের শব্দরূপ, বাণীরূপ, সেটাকে ধরে আছি। যাঁদের সঙ্গে ঘর করছি, মহারাজরা হন, বা মঠের কর্মচারীরা হন, সবাই ঠাকুরের মূর্তরূপ। উদ্দেশ্য হল, এই দুটি যখন আছে তখন এইভাবে ঠাকুরকে ধরা। এই দুটি যখন নেই, তখন ঠাকুরকে অখণ্ড রূপে ধরে রাখা। এখানে একটা হল মূর্তরূপ আর যজ্ঞরূপ। যে কাজগুলো করছেন, রান্নাবান্না করছেন, ডাক্তারি করছেন, কম্প্যুটারে কাজ করছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করছে, সবটাই সেই মহাযজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করছি। আসলে উদ্দেশ্যটা হল, সমুদ্র হল সেই ঠাকুর আর এই কর্মগুলো হল ঢেউ, মানুষগুলো ঢেউ, এই যজ্ঞটাও ঠাকুরেরই রূপ; এটাকে সব সময় মাথায় রাখা।

স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা চোঙ দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে। ঠাকুরের এই একটা ছিল, সব কিছু সারা হয়ে গেলে বলবে, তামাক সাজ।

খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমাদের কথারই দাম থাকে না, সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। সংসার যতই শক্ত হোক, ঈশ্বরের নাম যদি করা হয় ওই নাম সংসারকে ভেদ করে দেয়।

কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে।

ঠিক ঠিক ত্যাগী। যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মতো কেবল ফুলে বসে মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কখন কামিনী-কাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের ট্রেনিং দেওয়া হয় –মৌমাছির মত হবে, মাছির মত না। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ সংসারেই আছে। কিন্তু এই যে তিনটে বলা হল –ঠাকুরের অখণ্ড রূপ, ঠাকুরের মূর্তরূপ আর ঠাকুরের যজ্ঞরূপ; সংসারীরা যদি এই তিনটেকে জীবনধারা করে নিতে পারেন, তখন আর সন্দেশ, পচা ঘা, বিষ্ঠা বলে কিছু মনে হবে না।

ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেনশন ভোগ করবে। এই যে তিনটে প্র্যাক্টিসের কথা বলা হল, এটা প্রথম তিন মাস করে দেখুন। তারপ ছয় মাস, তারপর এক বছর, দিনে নিয়ম করে দশ হাজার করে জপ করুন, তারপর দেখবেন অত খাটতে হয় না। প্রথমের দিকে একটু উঠে পড়ে খাটতে হয়। খাটার ব্যাপারেই লোকেরা পিছিয়ে যায়।

ঠাকুরের এই কথা দিয়ে মাস্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানছেন এবং আমরাও দশম পর্বও এখানে এসে শেষ করছি।